

সুন্দরী

নারায়ণ সান্যাল









নারায়ণ সাহাল

বাক্-সাহিত্য

৩৩ কলকাতা টো, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ—চৈত্র ১৩৬৭

প্রকাশক :

শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়

বাক-সাহিত্য

৩৩, কলেজ রো,

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :

রজনকুমার দাস

শানিরজন প্রেস

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড

কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদপট

কানাই পাল

পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.

৭৩৯২  
STATE CENTRAL LIBRARY  
WEST BENGAL  
CALCUTTA  
১১.৭.৩৩



প্রীতিনিবন্ধে,

চিত্রজগতে তোমার আবির্ভাব এবং  
বাক্-সাহিত্যে আমার এষ্ট নতুন  
পদক্ষেপ সমসাময়িক। আমাদের  
জীবনের এ দুটি ঘটনাকে একসূত্রে  
বেঁধে দিতে চাই

। শ্রীশোভন লাহিড়ী ॥



রচনাকাল : শারদীয়া ১৯৫৯

অন্তর্লীনার অগ্রজ :

বকুলতলা পি. এল কাম্প ( ২য় মুদ্রণ )

বল্মৌক

ব্রাত্য

মনামী

বাস্তুবিজ্ঞান ( ২য় সংস্করণ )

অন্তর্লীনার অনূজ

নৈমিষারণ্য

দণ্ডক শবরী (১ম ও ২য় পর্ব) ( ২য় মুদ্রণ )



হাতে আজ আর কোন কাজ ছিল না। যুনিভার্সিটি বন্ধ, এক যাওয়া যায় নাশনাল লাইব্রেরীতে। কিন্তু কেন জানি ইচ্ছে করছে না আজ কোথাও যেতে। মেসের আর কটি ছাত্র গ্রীষ্মের ছুটি হতে যে যার বাড়ি চলে গেছে। একলা পড়ে গেছে কুশানু। বন্ধিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট যেখানে এসে থমকে থেমে গেছে ট্রাম-রাস্তার কোলাহল দেখে, সেখানেই ওদের দু-কামরার মেসবাড়ি। এক-তলায় একমাত্র দোকান—কাগজের আড়ত, ফটো-বাঁধাইওলা, আর একটা রেস্টোরঁ। ঐ আপ্যায়ন-কেবিনের পাশের পলেন্ডার-খোলা পানের পিক-রঞ্জিত সরু একটা প্যাসেজ হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে ভিতরের ছোট্ট উঠানে পৌঁছে। এক চিলতে একটু উঠান, কোণে একটা চৌবাচ্চা, অত্যন্ত পিচ্ছিল তার চারপাশ। পাশে কল—আধফাঁলা একটা বাঁশের চোঙা লাগানো। ডান দিক দিয়ে উঠে গেছে নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি—ভাঙা-শিক ফোগলা দাঁতের মত তার চেহারা। সিঁড়িটা শেষ হয়েছে দো-তলায়। পাশাপাশি দুখানি ঘর দ্বিতলে। মোট চারজন মেসবার। সবাই মফস্বলের ছেলে। ন-কলেজের সূত্রত দাস ছিল মেসের ম্যানেজার। কুশানুর রুমমেট। সুদর্শন বলিষ্ঠ চেহারা, মেসের চারটি প্রাণীর দায়িত্ব গ্রহণ করবার মত অন্ততঃ চওড়া ওর কাঁধটা—একেবারে বৃষস্কন্ধ না হলেও। পাশের ঘরে থাকে সমর আর সুখেন্দু। একজনের বি-কম, অপরজন ওরই সঙ্গে পড়ে।

এখন সব কলেজই ছুটি। যে যার দেশে চলে গেছে—মফস্বলের ছেলেরা যেমন যায়। কুশানুর ও বালাই নেই; অর্থাৎ দেশ তারও একটা আছে কিন্তু দেশে যাবার তাগিদ নেই—তাই পড়ে আছে মেস কামড়ে। আর আছে ওদের কন্বাইণ্ড-হাও রামনন্দন কাহার।

নিষ্কাজ সকালে মুখ হাত ধুয়ে কুশানু গিয়ে বসেছে জানলার ধারে। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় একমুঠো নীল আকাশ, আর গলির ফাঁক দিয়ে চুরি-করা একচিলতে হারিসন রোড। দু পাশের বাড়ির খাড়া



দেওয়ালের ক্রেমে বাঁধানো রাস্তার একটা খণ্ডাংশ। দূর আকাশে ভাসছে দু-একটা চিল। চক্রাকারে পাক খেয়ে ঢুকছে ঐ একটিলতে আকাশের রঙ্গমঞ্চে, আবার পাক খেতে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে খাড়া দেওয়ালের উইংসের আড়ালে।

এক পেয়াল ধূমায়িত চায়ের কাপ আর খবরের কাগজটা নামিয়ে রাখে রামনন্দন। আর নামিয়ে রাখে খানকতক চিঠি। এই এক বাড়তি কাজ হয়েছে কুশানুর, চিঠিগুলি আসে ওর বন্ধুদের নামে। ঠিকানা কেটে সেগুলি পুননির্দেশিত করতে হয়।

রামনন্দন চলে যাচ্ছিল—তাকে ফিরে ডাকে কুশানু, তোর চিঠি আছে একখানা।

চিঠিখানা হাতে নিয়েও রামনন্দন চলে যায় না। কুশানু ততক্ষণে খুলে ফেলেছে খবরের কাগজের প্রথম পাতাটা। আড়চোখে ওকে একবার দেখে নিয়ে ফের বলে,—কিছু বলবি?

জবাব দেয় না রামনন্দন। নীরবে বাড়িয়ে দেয় পোস্টকার্ডখানা। কুশানু একটু অবাক হয়। মনিঅর্ডার লিখিয়ে নিতে রামনন্দন মাঝে মাঝে আসে বটে কিন্তু চিঠি পড়াতে কখনও বিরক্ত করেনি। ওর এক দেশওয়ালি ভাই এতদিন এ কাজটা করত। পোস্টকার্ডখানা হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করে বুঝতে পারে কেন বেচারি ওর দ্বারস্থ হয়েছে। এবার হিন্দি হরফের বদলে বাংলায় লেখা চিঠি এসেছে রামনন্দনের দেশ থেকে। একটু অবাক হল কুশানু। রামনন্দনের ঘর-সংসারের কথা মোটামুটি জানা ছিল তার। লোকটা কী চোখে ওকে দেখেছে বলা শক্ত—কিন্তু কুশানুর প্রতি যে তার একটা পক্ষপাতিত্ব আছে এটা স্বীকার না করে উপায় নেই। সমর আর স্নেহ দু'প্রায়ই এ নিয়ে ঠাট্টা করে, বলে, রামনন্দন কুশানুর প্রেমে পড়ে গেছে! ঝোলের যে মাছখানা আকারের বড়, অথবা মুড়োটা প্রায়ই নামত কুশানুর পাতে। তবে নাকি নিম্নমধ্যবিত্ত ছাত্রদের এ মেসে মাছ আসে সপ্তাহে দুদিন, আর এলেও প্রতি গ্রামে মুড়ো খাওয়ার আকারে মাছ আসে, তাই সেটা রোজ টের পাওয়া যায় না। কিন্তুবাবুর তদবিরে কখনও ক্রটি হত না রামনন্দনের তরফে। অনেক কর্মহীন সাক্ষ্য অবকাশে সে এসে বসত কিন্তুবাবুর কাছে, গাঁয়ের গল্প করতে। পাটনার কাছে কি এক ফুলওয়ানি গাঁয়ে ওর বাস। ঘরে আছে ওর পঁচিশ বছরের বউ ফুলেশ্বরী, একটি ছেলে



আর গরু। এক বুকা গিসিয়াও ওর আশ্রিত। এসব গরু সে কলকাতায় এসে  
তুলিয়েছিল একমাত্র তার কিশুবাবুকেই।

রামনন্দনের এবস্থিধ পক্ষপাতিত্বের একটা কারণও আছে অবশ্য।  
সেই কারণটার সন্ধান করতে হলে ওর চাকরি-জীবনের আদি ইতিহাস  
শোনাতে হয়। রামনন্দন বয়সে ওর চেয়ে বছর ছয়-সাতের বড়ই হবে।  
সে ছিল ভাগচাষী। জাতে ওরা কাহার। পর পর কবছর অজন্মায়  
ঋণগ্রস্ত হয়ে ভাগ্যান্বেষণে শেষ পর্যন্ত বেচারি চলে আসে কলকাতায়। বেকার  
অবস্থায় পথে পথে ঘুরছিল চাকরির সন্ধানে। তারপর একদিন সুপ্রভাতে  
এসে হাজির হল ওদের মেসে। প্রথমে এ লোকটিকে আশ্রয় দিতে রাজী  
হয়নি কেউ; কিন্তু আগের চাকরটা পূর্বরাত্রেই মাইনে হাতে পেয়ে কেটে  
পড়েছে। সকালবেলা ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। সমর উনানটা  
ধরাবার চেষ্টায় সকাল থেকে যে পরিমাণ হাওয়া করেছে তাতে শালগাছ  
উপড়ে পড়ার কথা, সুখেন্দু থলিটা নিয়ে বাজারে বেরিয়ে গেছে—আর  
ম্যানেজার সূত্রত দাশ কলতলায় দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ছে,—কাল রাত্রে কে  
কোন্ খালায় থেয়েছ হে, এসে ধুয়ে দিয়ে যাও।

সবাই বুঝতে পেরেছে আজ পাসে'ন্টেজ রাখার নিগ'লিতার্থ হচ্ছে  
পেটে কিল মেরে বেরিয়ে পড়া—ঠিক এমনই শুভলগ্নে এসে হাজির হল  
রামনন্দন কাহার, তার বিশাল বপুখানি বিনয়াবনম্র করে। লোকটি একটা  
কাজ চায়।

সূত্রতবাবু আপত্তি করেছিলেন, সমরও 'অজ্ঞাতকুলশীলশ্রু' বলে কি  
যেন এক চাণক্য শ্লোকও আউড়ে গেল, কিন্তু কুশানু ওসবে কান দেয়নি।  
তারই আগ্রহে আর উৎসাহে শেষ পর্যন্ত বহাল করা হল ওকে। লোকটি  
বাজও সে কথা ভোলেনি নিশ্চয়, সেই খাতিরেই এই শূন্যপ্রায় মেসেও  
কি কিশুবাবুর জন্তেই সে দেশে যাবার নাম করেনি।

হাত বাড়িয়ে পোস্টকার্ডখানা নিয়ে কুশানু পড়ে শোনাল—“শ্রীচরণ-  
কমলেশু, তোমার মনিঅর্ডার পেলাম। এবার টাকা পাঠাতে বেশ দেরি  
করেছ তুমি। চিঠি দিতে এত দেরি কর কেন? প্রতি সপ্তাহে আমাকে  
একটা করে চিঠি দেবে। কলকাতা শহরকে আমার বড় ভয়। তোমার  
চিঠি না পেলে মন বড় চঞ্চল হয়। মাসান্তের ওই মনিঅর্ডার-কুপনের এক-  
চিলতে চিঠিতে কি আমার মন ভরে? মুলির আর একটা বাচ্চা হয়েছে।

রামাওতার এখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। পণ্ডিতজী বলছিলেন ওকে তাঁর পাঠশালায় ভর্তি করে দিতে—মাসে আট আনা করে লাগবে। আমাদের জীবনে যে অসুবিধা হয়েছে ও বেচারী কেন তা ভোগ করে? তবু আমার একার ইচ্ছাই তো সব নয়, তোমার মতামত জানিও।

“মুংলি রোজ সাত-সাদে সাত সের দুধ দিচ্ছে। দুধটা বিক্রি করেও কিছু পাচ্ছি। তুমি এ মাস থেকে আরও পাঁচ টাকা কম করে পাঠিও। যতদিন মুংলির দুধ হবে ততদিন আর কোন অসুবিধা নেই। তুমি বরং ওই টাকার কিছু কিনে খেও। মেসের খাওয়াতে নিশ্চয়ই তোমার পেট ভরে না। আমার মনে হয় তুমি বোধহয় আরও রোগা হয়ে গেছ। শরীরের ষত্ব নিও। আমরা সবাই ভালো আছি। রামাওতার আর তার ঠাকুরমা ভালো। আমিও। সহেলির বর কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। ওর মায়ের অসুখ হয়েছিল বলে। এখন সহেলির মা ভালো আছে—ওর বর দু-একদিনের মধ্যেই ফিরে যাবে। আমার প্রণাম নিও—ইতি তোমার ফুলেশ্বরী।”

চিঠিখানা রামনন্দনের হাতে ফেরত দিয়ে কুশান্ত বলে, কি রে, তোকে আমরা ভালো করে খেতে দিই না?

রামনন্দন লজ্জা পেয়ে বলে, ওকরাশে বাৎ ছোড় দিহ। পাগলি হ!

রামনন্দন চলে যায়।

খবরের কাগজে আর মন বসে না। ভাবুক প্রকৃতির মানুষ সে। শুয়ে শুয়ে ফুলওয়ারি গাঁয়ের একটি গৃহস্থালীর চিত্র আঁকতে থাকে। ফুটো-চাল এক কামরা একখানা ঘর। বারান্দার একটা পাশ গত বর্ষা থেকেই কাত হয়ে আছে। মাথা নীচু করে উঠতে হয় ঘুঁটের দাগে ভরা দাওয়ায়। প্রায়াক্ষকার খুপরিটায় ঢুকলে কয়েক মিনিট সময় লাগে চোখের ধাঁধাটানু কাটাতে। তারপর নজরে পড়ে দড়ির চারপাইটা। গোটানো বিছানহ! ওপাশে খানকয় পিতলের বাসন আর দড়িতে টাঙানো পিরাণ-শাড়ির দাওয়ায় বসে একনাগাড়ে কাশছে রামনন্দনের বুড়ি পিসিমা। আংটো ছেলেটানু খেলা করছে উঠানে আপন মনে। গোয়ালে শিং নেড়ে নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে মুংলি; তার গলায় বাঁধা ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে আসছে ঠুনঠুন। ফুলেশ্বরী এইবার দুধ বেচতে বের হবে। ফেনায়িত দুধের বালতিটা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে সে ঘরে ঢোকে। কানে বড় বড় গোলাকৃতি মাকড়ি, হাতে রূপার মোটা বাজু। গলায় লাল পলার একছড়া মালা। মনে করা যাক ওটা রামনন্দনই



কিনে এনেছিল মজিলপুরের হাট থেকে । শহরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেয় সে । ছিন্ন বসনখানি ছেড়ে শহরে যাবার উপযুক্ত একটি মাত্র শাড়ি এবার জড়িয়ে নেবে গায়ে ।

হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়ায় কৃশানু—যেন এইমাত্র কিছুতে কামড়েছে তাকে । মুখটা হয়ে ওঠে বেদনার্ত । অশাস্তভাবে কিছুটা পায়চারি করে ছোট ঘরটিতেই । ইচ্ছে করছে নিজের গালেই টেনে এক চড় মারে ! না, আর সাহস হচ্ছে না ফুলওয়ারি গাঁয়ের অসমাপ্ত ছবিটা আঁকতে । পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে অকারণেই বেরিয়ে পড়ে রাস্তায় ।

কৃশানুর জন্মে আমার দুঃখ হয় । আপনাদেরও হত, যদি জানা থাকত ওর বিচিত্র ইতিহাস । তা হলে ওর এই বিকৃত চিন্তাধারার জন্মে, অশাস্ত মনের অন্তর্দাহে ওর এই মর্মপীড়ার জন্মে শুধু ঘণার বদলে হয়তো একটু সহানুভূতিও জাগত আপনাদের ।

অতি শৈশবেই কৃশানু মাতৃহীন । বিমাতা ওকে মানুষ করেনি—সে বড় হয়ে উঠেছিল মতির মায়ের হাতে । বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী রাগী মানুষ । ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন তিনি । প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকতেই প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ করেছিলেন—কৃশানুর মাকে । আগের পক্ষের দুটি ছেলেও ছিল । কৃশানুর মাকে বিয়ে করে তিনি বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন একটু—প্রথম পক্ষের সঙ্গে জীবনটাকে কি করে খাপ খাওয়াবেন বুঝতে পারেননি । সৌভাগ্যক্রমে বিড়ম্বনার হাত থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়ে গেল নববধূ প্রথম সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়েই । ওর জীবনের এই দুটি বছরের চিত্তচাকল্যের ইতিহাসকে একেবারে অস্বীকার করতে পারলেই হয়তো প্রথম পক্ষের সঙ্গে পুনর্মিলনটা হত নিঃশেষে নিদাগ—কিন্তু উপায় ছিল না । একফোঁটা একটা বাচ্চা সারাদিন ট্যা ট্যা করে মনে করিয়ে দিত তাঁকে প্রৌঢ় বয়সে তাঁর চিত্তচাকল্যের লজ্জাকর ইতিবৃত্ত । মতির মা তাই সারাদিনই ওকে আগলে রাখত সবার দৃষ্টির আড়ালে ।

এ সব কথা কেউ ওকে বলেনি । ও নিজেই আন্দাজ করেছে । পড়াশুনায় কিন্তু খুব ভালো ছেলে ছিল কৃশানু । বরাবর ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পেয়েছে । বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কাছে সেটা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ । বিমাতার ইচ্ছা ছিল বেশী লেখাপড়া না শিখে যা হোক কাজকর্মের

মধ্যে ও ঢুকে পড়ুক, কিন্তু ওদের স্থলের হেডমাস্টারমশাই ততদিনে চিনে ফেলেছেন ছেলেটিকে। নিঃসন্তান এবং বিপত্নীক ভদ্রলোক। জোর করে ওকে নিয়ে এসে রাখলেন তাঁর কাছে। তাঁরই প্রচেষ্টায় একদিন স্থলারশীপ নিয়ে প্রবেশিকা পাস করল কুশানু।

তারপর কলকাতায় এসে এই ছটা বছর উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে। সংসারের সঙ্গেই শুধু নয়, গ্রামের সঙ্গেও সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েছে ক্রমে। শেষ বন্ধন ছিলেন হেডমাস্টারমশাই—তিনিও গত হয়েছেন বছর-খানেক। ছুনিয়ায় ভাই ওর কোন বন্ধন নেই। সকালে আর সন্ধ্যায় একগুঁড়া পড়ুয়ার কাছে বাঁধা রাখতে হয়েছে নিঃশ্বাস ফেলার শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত। সিক্কথ ইয়ারে উঠে ওর ভাগ্য সম্প্রতি ফিরেছে একটু। ভালো একটি ছাত্রী পেয়েছে! অর্থাৎ ছাত্রী তাকে আশ্রয় করেনি, করেছেন তার বাবা, আরও সঠিক ভাবে তাঁর নিজে থেকেই অফার করা বেতনের অঙ্কটা। চলতি বাজারদর অনুপাতে যথেষ্ট বেশী। হয়তো বি. এ.তে ওর রেজাল্ট দেখেই এত বেশী মাইনে দিতে রাজী হয়েছিলেন ভবতারণ ঘোষাল। অর্থক্লুতাটা অনেক কমে এসেছে। ক্লাস থেকে চলে যায় আশনাল লাইব্রেরীতে। সেখান থেকে হেঁটেই চলে যায় ঘোষাল সাহেবের হাজরা রোডের বাড়িতে। যদিও চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়, তবু সাক্ষ্য চা-জলখাবারটা সেখানেই সারে! প্রথম প্রথম একটু বাধা বাধা লাগত—তারপর সেটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। ইলা পড়ে গোথলে; তার কাছেই শুনেছিল ভবতারণ ঘোষাল বিপত্নীক। ইলারা তিন বোন, ভাই নেই ওদের। বড় বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, মেজ বোন এখানে থাকে না। প্রথম দিন খাবারের থালাটা যখন এলো তখন কুশানু ভেবেছিল এটা পাঠালো কে! গৃহিণীহীন বাড়িতে এটা আশা করা একটু বিচিত্র নয়? মিস্টার ভবতারণ ঘোষাল বেঙ্গল পুলিশের একজন অত্যন্ত উঁচু মহলের অফিসার। হাজরা রোডে বেশ বড় বাড়ি ইঁাকিয়েছেন রিটারার না করেই। সন্তান সংসার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংবাদ তিনি রাখতেন না। অথচ গৃহশিক্ষকের নিত্য আপ্যায়নের এ ব্যবস্থায় তাঁর সাংসারিক জ্ঞান আর বদান্যতার কৃতজ্ঞ হয়েছিল সে। অর্থক্লুতাটাও অধুনা কমেছে। মন দিয়ে পড়াশুনা করার সময় পাচ্ছে একটু। ফার্স্ট ক্লাসটা আশা করা অন্ময় হবে না তা হলে। এটুকু আত্মবিশ্বাস ওর আছে।

কিন্তু সমস্যা তো সেখানে নয়। সমস্যাটা ওর মনের গহনকোণে।



সেখানে ও নাগাল পায় না। কোথা থেকে কেমন করে এসব উদ্ভট চিন্তা  
ওর মনে জাগে তা ও জানে না, কিন্তু জাগ্রত মনকে সে সর্বদা সজাগ রাখে  
ঐ সব অশান্ত অশ্লীল চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে।

কুশানু মাঝে মাঝে ভাবে—আচ্ছা, সকলেরই কি এমন হয়? ফুলস্পীড়ে  
ছুটন্ত মনের টাই-রড কি সকলেরই এভাবে কেটে যায়? স্টিয়ারিং হঠাৎ হয়ে  
পড়ে অকেজো? টলমল করে বেতলা ছুটতে থাকে বাধনহীন মনটা কোন  
গাছের গুঁড়িতে গিয়ে ধাক্কা খেতে? সে কথা কাউকে ও জিজ্ঞাসা করতে  
পারেনি। বন্ধু বলতে যা বোঝায় তা নেই কুশানুর।

তার একটা কারণ আছে অবশ্য। কুশানু রীতিমত আত্মকেন্দ্রিক।  
জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সে আশপাশের মানুষকে এড়িয়ে চলতে শিখেছে,  
বাবাকে, মাকে, বৈমাত্রেয় ভাই দুটিকে। শৈশব থেকেই একা থাকতে ও  
অভ্যস্ত। স্কুলে ভর্তি হয়েও সে সঙ্গী পায়নি। ওর স্বভাবলাজুকতা আর  
আত্মকেন্দ্রিকতা সত্ত্বেও হয়তো ছেলেরা ওকে টেনে নিত যদি না দুর্ভাগ্যবশতঃ  
ক্লাসে ও ফাস্ট হত। ওরা মনে করল এটা স্বভাবলাজুকতা নয়, দান্তিকতা।  
ক্রমে একাকীত্বই ওর কাছে স্বাভাবিক জীবন বলে মনে হল। ছেলেবেলা  
থেকেই সহজাত একটা প্রতিভা ছিল ওর ছবি আঁকায়। সঙ্গীহীন অবকাশে  
সেদিকেই ঝাঁক পড়ল ক্রমে। পড়াশুনার অবসর সময়ে এখনও মাঝে মাঝে  
স্কেচ আঁকতে বসে। প্রাকৃতিক দৃশ্যে ওর ঝাঁক নেই, মোহ নেই স্টিল-  
লাইফে; ওকে আকৃষ্ট করে হিউম্যান-ফিগার, পোর্ট্রেট! ওর স্কেচের  
খাতায় শুধু মানুষের ছবি—ঝাঁকাওয়ালা মুটে, ফুটপাথের ধারে নিদ্রালস  
ভিখারী, ফেরিওয়ালা, মুচি, পথ-চলতি মানুষ।

সুখেন্দু বলত, তুই আর্ট কলেজে ভর্তি হ কুশানু।

যোগেন বলত, হলেও লাভ নেই, অমন কানা আর্টিস্টের কোনো দাম  
নেই।

কানা আর্টিস্ট মানে?—জিজ্ঞাসু সুখেন্দুর প্রশ্ন।

মানে ও একচোখ দিয়ে দুনিয়ার ‘ওয়ার্ম-হাফটা’কেই দেখে। সত্যি  
কিনা ওই বলুক।

কুশানু শুধু হাসত। জবাব দিত না।

ভবতারণ ঘোষাল বাংলা পুলিশের একজন উচ্চরের অফিসার। ব্যক্তিগত

নৈতিক জীবন তাঁর খুব নিম্নলব্ধ ছিল না;—অন্ততঃ যৌবনে রীতিমত উচ্ছ্বল ছিলেন তিনি। তবু অফিসার হিসাবে তিনি সুনামই কিনেছেন। স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে বহুদিন—দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নি। বড় মেয়ে ইভার বিয়ে দিয়েছেন শ্রীরামপুরের এক বনেদী জমিদারের ঘরে। সে বিয়ে সুখের হয় নি। জামাই ধনবান বাপের একমাত্র সন্তান, অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। লেখাপড়াও শিখেছে সে, কিন্তু ব্যাস-বশিষ্ঠের চেয়ে শবুরের সঙ্গেই তার নৈতিক চরিত্রের সাদৃশ্য ছিল। ইভার শবুর জীবনানন্দ-বাবুর অবশ্য চেষ্টার ক্রটি ছিল না, কিন্তু একমাত্র পুত্র সুকান্তকে তিনি বাঁধতে পারেননি। খেলাধুলায় সে চৌকস, অভিনয়ে তার প্রতিভার বিকাশ, শিকারে সে অব্যর্থ সন্ধানী—কিন্তু সংসারের ভিতরে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি। বাপের মত স্ত্রীর সঙ্গেও তার বনিবনাও হয়নি। মদ্যপানটাকে হয়তো সহ্য করতে পারত ইভা, কিন্তু তার অসামাজিক ব্যবহারে সে লজ্জিত বিরক্ত, ক্রমে মর্মান্বিত হয়ে উঠল। মতান্তর হল মনান্তর। কাদামাটির বদলে রক্তমাংসই আছে ইভার শরীরে। সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে ইভা ফিরে এসেছে বাপের আশ্রয়ে। ঘোষাল সাহেব অবশ্য এখনও আশা রাখেন—এ শ্রাবণের মেঘ একদিন সরে যাবেই। কিন্তু ইভার ধারণা অন্য রকম। বাধাবন্ধনহীন সুকান্ত আরও অধঃপাতে যাবার সুযোগ পেয়েছে—সে নাকি তার বাপের সঙ্গেও সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে এতদিনে।

মেজ মেয়ে আইভিকে দার্জিলিঙে একটা কনভেন্টে রেখে পড়াচ্ছেন। সিনিয়র কেমিস্ট্রি। ছোট মেয়ে ইলা থাকে বাপের কাছে। ইচ্ছা ছিল ইলাকেও তার মেজদার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবেন, কিন্তু সম্প্রতি মধ্যমা কন্য়ার নামে কিছু জনশ্রুতি কানে আসায় তিনি মতটা বদলেছেন, স্থির করেছেন এবার বরং আইভিকেও কনভেন্ট থেকে ছাড়িয়ে নিজের কাছে এনে রাখবেন।

ভবতারণবাবু অবশ্য সবকিছুর জগ্গে নিজেকেই দায়ী করেন। বড় মেয়ের সঙ্গে জামাইয়ের যে মতবিরোধ তাও যেন তাঁরই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যৌবনে তিনি ছিলেন উচ্ছ্বল প্রকৃতির মানুষ। থিয়েটার অথবা শিকারে অবশ্য ঝোঁক ছিল না—ছিল মদে আর আনুষ্ঙ্গিক আর একটা কিছুতে। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁরও বনিবনাও হয়নি। ইভার মত সরমা অবশ্য স্বামী ত্যাগ করে তার আচারনিষ্ঠ বাপের কাছে ফিরে যাননি। কিন্তু যুগটা পালটে গেছে,



ভাবেন ভবতারণ। ওঁরা যে যুগের মানুষ তখন তিল তিল করে এ অত্যাচার সহ্য না করে হয়তো উপায় ছিল না সরমার মত হতভাগিনীদের। এখন মেয়েরা অপেক্ষাকৃত আত্মনির্ভর। পতিদেবতার অবহেলা, আর অন্ত্যায় অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যাওয়ার লক্ষহীরার যুগ এ নয়। তাই ইভাকে চলে আসতে হয়েছে স্বামীর ঘর ছেড়ে। বিবাহবন্ধন ছিন্ন করা চলে হয়তো, কিংবা হয়তো চলে না। ইভা ঠিক জানে না। কিন্তু এসব কেস কোর্টে উঠলে বড় বিড়ম্বনা। স্বামী কি তোমার গায়ে হাত তোলে? সে কি তোমার সঙ্গে শোয়? আদর করে? মারে? না, দরকার নেই বাপু। কিন্তু ওর স্নান আত্মগত রূপ দেখে স্থির থাকতে পারেন না ভবতারণ—প্রতিনিয়তই মনে হয় এ বুঝি তাঁরই পাপের প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন।

ইভা বাপের উচ্ছৃঙ্খলতা পায়নি, পেয়েছে মায়ের স্নিগ্ধ-শাস্ত মনের ছোঁওয়া। মনকে সে বাঁধতে জানে। সমস্ত সংসারের দায়িত্ব সে তুলে নিয়েছে অনায়াসে নিজের স্কন্ধে। বাপকে বলেছে ভুলে যেতে যে তার কোনদিন বিয়ে হয়েছিল। সময়মত বাড়ির ইলেকট্রিক বিল, বাপের জীবনবীমার প্রিমিয়াম দেওয়া থেকে শুরু করে লণ্ডুর হিসাব পর্যন্ত রাখে সে। এদিক থেকে ভবতারণ নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন। এসব খবর কৃশান্ত্র ক্রমে জানতে পেরেছিল, তার নিত্য বৈকালী ভোগের উৎস সন্ধানের সূত্র ধরে।

আইভি কিন্তু একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মেয়ে। ইভার সঙ্গে তার পার্থক্যটাকে শুধু আকাশ-পাতাল বললেও যেন যথেষ্ট হয় না—বলতে ইচ্ছে করে আশমান্ জমিন্! আকৃতি এবং প্রকৃতিতে ওরা যেন ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। ইভা যেন প্রবাল দ্বীপের অ্যাটল—গাঢ় নীল অচঞ্চল জলে মুখ দেখে এক আকাশ তারা, সার দিয়ে দাঁড়ানো স্থির নারকেলের গাছের সারি। সবার ছায়াই পড়ে ওর কাকচক্ষু জলে—কিন্তু অ্যাটল তাদের ধরে রাখে না। প্রতিবিম্ব শুধু ছায়া, কায়া নয়। রাতের অন্ধকারে মুছে যায় সেসব ছায়া নিস্তরঙ্গ অ্যাটলের বুক থেকে। ইভার মনেও তাই কেউ স্থায়ী আসন পাতে না। লবণাক্ত উদ্দাম সমুদ্রের আবেষ্টনীতে কেমন করে প্রবাল দ্বীপের এই কাকচক্ষু হৃদ বাঁচিয়ে রেখেছে তার স্বাদু জলের শুচিতা, তার স্বাতন্ত্র্য, তার পবিত্রতা—সে প্রশ্নের কেউ জবাব দিতে পারে না। পারলে হয়তো জবাব দিতে পারত কালো কার্বন স্তূপের মধ্যে খনিগহ্বরের একান্তবাসী হীরের ছোট টুকরোটা।

আর আইভি যেন প্রবাল দ্বীপ বেষ্টনকারী উদ্দাম উচ্ছল সমুদ্র! বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উৎক্লিষ্ট ছ-বাহু আকাশে তুলে বারে বারে আছড়ে পড়তে চায় তটভূমিতে। কী সে চায়, তা সে নিজেই জানে না। হয়তো বিশ-ত্রিশ হাজার লীগ অতলের গোপন কন্দরে তারও লুকনো আছে অমূল্য রত্নরাজী—রত্নাকর সে, কিন্তু দুনিয়া তার সন্ধান পায় না। লোকে দেখে শুধু তার নিয়ত উচ্ছ্বাস, তার লবণাক্ত কটু স্বাদ, তার অশান্ত তরঙ্গভঙ্গ। তার রক্তের মধ্যে চঞ্চলতার নিকণ কান পেতে শুনেছেন ভবতারণ। চিনতে ভুল হয় নি তাঁর—দেখেছেন ওর রক্তে পৈতৃক ঝোড়ো হাওয়ার খেপামি। আইভি ক্ষণিকবাদিনী। সমগ্র জীবনের সত্য সে বোঝে না—তৌল করে প্রতি মুহূর্তটির বাস্তবতা। ওর গাঢ় মদিরার মত লাল রক্তে অন্তর্গত বহুংপাতের যে গোপন সঙ্কেত শোনা যায়—ভবতারণবাবু জানেন—তার প্রথম শিখা জ্বলেছেন তিনিই। যৌবনে যে অশান্ত কামনার বীজ মাথা চাড়া দেওয়ায় সরমা সরে গিয়েছিল নেপথ্যে, যে অশ্বখের চারাগাছটিকে নিমূল করেছিলেন একদিন স্ত্রী-বিয়োগের মর্মান্তিক আঘাতে—আজ লক্ষ্য হয় ক্রমোন্নতির কোন ফাটল দিয়ে আবার মাথা চাড়া দিয়েছে সেই শিশু মহীকুহ আইভির মাধ্যমে। তাই আইভির নামে কোন কথা কানে এলে তিনি ওকে শাসন করতে পারেন না—অতীত যুগের ভবতারণ এসে দাঁড়ান ওঁর সামনে নতমস্তকে অপরাধ স্বীকার করে; ভবতারণ বিচলিত হন শুধু। দুটি মেয়ের দুর্ভাগ্যের তিনিই যেন ‘প্রাইম মুভার’। দুটি মেয়ের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; চিন্তাধারা, জীবনদর্শন সবই পৃথক—তবু ওরা দুজনেই যেন প্রায়শ্চিত্ত করছে তাঁর পাপের। ইভা আর আইভি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মেয়ে। ইভা যেন পঙ্কিল পরিবেশে ফোটা নিষ্কলুষ কমলমণি—যদিও ‘শেষের কবিতা’র লাবণ্যের সঙ্গেই তার চরিত্রের কিছুটা মিল। তেমনি আইভি দামোদরের লকগেট-ভাঙা ছুরন্ত বগা—যদিও ‘শেষ প্রশ্নে’র কমলমণির সঙ্গেই তার প্রকৃতির সাদৃশ্য।

ছোট মেয়েটির মন এখনও কাঁচা—ইলা যে কোন্‌ ছাঁচে গড়ে উঠবে বলা যায় না এখনও। দাদামশায়ের আচারনিষ্ঠা, মায়ের সর্বসহা শান্ত সহ্যগুণ, বাপের যৌবনের উচ্ছ্বলতা অথবা প্রৌঢ়ত্বের ফ্রাঙ্ক্‌স্মান—কোনটি যে তার উপর প্রভাব বিস্তার করবে তা বলা যায় না এখনও। কিন্তু চোখের আড়াল করবেন না আর তাকে। আইভিকেও বরং নিয়ে এসে রাখতে হবে ওঁর কাছে!



হাজরা রোডের পিতলের নেম-প্লেট-আঁটা গেটটা পার হয়েই একটা ছোট বাগান। ক্যান্টিলিভার একটা পোর্টিকো। ঢুকেই ডানহাতি বড় বৈঠকখানা। বাহ্যাবর্জিত তার আসবাবপত্রের আয়োজন। তার পাশেই একখানা ঘরকে বলা হয় লাইব্রেরী। পাশাপাশি বই-ঠাসা আবলুম কাঠের আলমারি। জানলার ‘সিলে’ মানি-প্ল্যাণ্টের টব, পাশে ছোট টেবিলের উপর একটা জাপানী সেজনাতি। দু পাশে দুখানা খুরে-রবারের-নাল-লাগানো খাড়া-পিঠ চেয়ার। কুশানু এখানে বসেই পড়ায় তার ছাত্রীকে। ঘরের সামনের কার্পেট-মোড়া করিডোরটা শেষ হয়েছে ডবল চাতালওয়ালা তিনমুখ-ফেরা ‘ওপন-নিউয়েল-স্টেয়ার কেসে’। কার্পেট মোড়া বারান্দার ও-প্রান্তে কোনদিন যায়নি কুশানু—দ্বিতলেও নয়; কিন্তু ও-প্রান্তবাসিনী একজন প্রায়ই আসেন লাইব্রেরী-ঘরে—বই নিতে। আইভিকে কুশানু কখনও দেখেনি। সে থাকে দার্জিলিঙে। ছুটিছাটায় নিশ্চয়ই আসে বাড়িতে, কিন্তু ছুটি হলে কুশানুও বেরিয়ে পড়ে যদিকে দু চোখ যায়। তাই ঘোষাল সাহেবের মধ্যমা কণ্ঠকে চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য হয়নি আজও। দেখেছে ইতাকে। অনায়াস গতিভঙ্গে সে প্রায়ই আসে লাইব্রেরীতে—চাবি খুলে বই নেয়, বই রাখে, ধীরপদে চলেও যায়।

কুশানুর একটা চরিত্রগত দোষ মেয়েদের মুখের দিকে সে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। তাই ইলাকে পড়াবার অবকাশে যদিও ইভা বহুবার এসেছে এ ঘরে তবু তাকে ভালো করে দেখে নি কোনদিন। মনে আছে, ইভাই প্রথম উপষাচক হয়ে আলাপ করতে এসেছিল। প্রতিদিনের মত চাবি খুলে আলমারি থেকে বই নিয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গিতেই চলে যেতে যেতে হঠাৎ দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ইভা। অসতর্ক মুহূর্তে চমকে চোখ তুলেই দৃষ্টি নত করেছিল কুশানু। ঐ এক ঝলকের দৃষ্টিতেই সে দেখতে পেয়েছিল মেয়েটিকে। শ্যামলা রঙ, জোড়া ভুরু, গভীর কালো দুটি চোখের দৃষ্টি—আর কিছু তার নজরে পড়েনি। চোখাচোখি হতেই কান দুটো লাল হয়ে উঠেছিল লাজুক কুশানুর। মুখ না তুলেও বুঝতে পারে ইভা দেবী চলে যাননি ঘর থেকে।

নীরবতা ভেঙে ইলাই প্রথমে কথা বলে, বড়দি, আমায় কিছু বলবে?

একটু হেসে ইভা বলে, বলবই তো। কেমন কাটসি শিখছ তুমি

মাস্টারমশায়ের কাছে ? আমি প্রায়ই আসি লাইব্রেরীতে, অথচ এতদিনেও জোমার মাস্টারমশায়ের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে না।

ইলা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাতের তালু দুটো উল্টে ফর্মাল ইন্ট্রোডাকশন করতে যাচ্ছিল বোধ হয়—তাকে থামিয়ে দিয়ে ইভা কুশানুর দিকে ফিরে বলে, আপনার সঙ্গে যেচে ভাব করতে এলাম একটা বিশেষ গরজে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল কুশানু : বলুন, বলুন।

প্রতিনমস্কার করেনি। কারণ চোখ তুলে সে দেখেইনি যে ইভার হাত দুটি বৃকের কাছে নমস্কারের ভঙ্গিতে জড়ো করা। সে শুধু দেখেছিল হাতানা-ঘাসের চটিপরা একজোড়া শ্যামল চরণের অলঙ্কৃত রাগ, আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে নেল-পলিশের জমাট কাল্চে-লাল রঙ। উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর দুটি প্রসাধনচিহ্ন যুগল-প্রণাম করেছে ওর পদপ্রান্তে !

: এই টেবিল-ক্লেথে একটা নকশা এঁকে দিতে হবে।

টেবিলের উপর চতুষ্কোণ একখণ্ড আদির কাপড় রাখে ইভা। কুশানু এবার দেখে মকরমুখো গত শতকের কলিপরা একখানা নিটোল হাত—চোখা করে আধুনিক চঙে কাটা আঙ্গুলের রক্তিম নখ, আর সর্বকালের দ্যুতিময় একটা সাদা পোথরাজের আংটি।

দৃষ্টি না তুলতে পারলেও জড়ভরত নয় কুশানু, বলে, আমি আঁকতে জানি, তা জানলেন কেমন করে ?

ইভা প্রতিপ্রশ্ন করেছিল, জহরীরা জহর চেনে কেমন করে ?

এবারকার প্রত্যাশাটাও ব্যর্থ হল ইভার। মনে হল, বৈকালিক প্রসাধনটার সত্যিই কোন প্রয়োজন ছিল না বুঝি। নতনেত্র কুশানুকে আবার বলে : ইলার বন্ধুর জন্মদিনে যে ছবিখানা সে উপহার দিয়েছে, তার কথা বাড়ির সবাই জানে। বাবা পুলিশ-অফিসার হলে কি হয়—একজন চিত্রদরদী মানুষ তিনি। উনি তো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন। সত্যি হিংসে হয় আপনাকে।

কুশানু জবাব দেয় নি।

এবার বোধ হয় একটু আহত হয়েই ইভা বলে, আপনাকে অসুবিধার ভিতর ফেলছি না তো ?

না না—সে কি ?—কাপড়ের টুকরোটা তুলে নেয় কুশানু।

করে বাপের বাড়িতে, তার প্রতি সহানুভূতি জাগাই স্বাভাবিক। কুশানু এও লক্ষ্য করেছিল—বড় একটা বাড়ির বাইরে যেত না ইভা। এটা ওদের সমাজের পক্ষে দৃষ্টিকটু, অস্বাভাবিক। সম্ভবতঃ কোতুহলী সোসাইটি গালদৈর প্রশ্নবানের হাত এড়াতেই ইভা বেছে নিয়েছিল এই স্বৈচ্ছাবন্দী অস্ত্রবাসীর জীবন। হয়তো ইভার সেই অসহায়তার জন্মেই কুশানু সহ্য করত ওর বিদ্রূপের শ্লেষ। প্রায় প্রতিদিনই ইলাকে পড়াতে পড়াতে লক্ষ্য করত, ইভা স্বথারীতি এসে আলমারি খুলে বই রাখছে, বই নিচ্ছে। মাঝে মাঝে ইভাই আলাপ শুরু করত কোন একটা সূত্র ধরে—সেদিন বই নিয়ে ফিরে যেতে দেয়ি হত তার। যেদিন করেনি সেদিন নীরবেই চলে যেতে হত তাকে। কুশানু সাহস করে ওকে ডেকে কোন কথা বলেনি কখনও।

একদিন, মনে আছে কুশানুর, সন্ধ্যাবেলা গিয়ে শুনেছিল ইলা বাড়ি নেই, কোন মাসির বাড়ি গেছে বুঝি। চাকরের মুখে এই খবরটা শুনেই ফিরে যাচ্ছিল সে। পোর্টিকো পার হয়ে লাল কাকরের পথটায় নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল তাকে। চাকরটা নেমে এসে খবর দিল, বড়দিদিমনি আপনাকে ডাকছেন।

ও, আচ্ছা। চল।

ফিরে এসে দেখে লাইব্রেরী ঘরে দাঁড়িয়ে আছে ইভা। তার এক হাতে স্টেনলেস স্টীলের রেকাবিতে সাজানো কিছু লুচি ও মিষ্টি, অন্য হাতে একটা গ্লাসে জল। ওর দিকে আজ না তাকিয়ে পারে নি কুশানু। জোড়া জ্বর মাঝখানে একটা কুমকুমের ছোট্ট টিপ—তু' পাশে দুটি অতল গভীর কালো চোখের তারা নির্নিমেষে চেয়ে আছে ওর দিকে। বিজয়িনীর দৃষ্টি!

হালকা চাঁপা রঙের একখানা সিল্কের শাড়ি পড়েছে ইভা, আগুন রঙের আঁটো ব্লাউস চেপে বসেছে গায়ে! নিটোল দুটি হাতে দুগাছা মোটা মোটা কুলি, গলায় সরু একটা মফচেন—আগ্নেয়গিরি বেষ্টন করে নেমে আসা যুগল লাবান্ত্রোতের মতো মফচেনের দ্বিধারা এসে মিলিত হয়েছে যেখানে সেখানে ওর মনের কামনা যেন জমাটবাঁধা রক্তের মত ফুটে উঠেছে একথাও চোঁকো দার্জিলিঙ পাথরে!

এই প্রথম পূর্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখল কুশানু।

ইভা বিজয়িনীর হাসি হেসে বললে, ছাত্রী পালিয়েছে দেখে এত রাগ কেন বাবুর?



এই সুরে কথা কটা উচ্চারণ করে, তাতে যেন অতি পরিচয়ের ছোঁওয়া লেগে আছে। অতি নিকট-আত্মীয়কে ঐ সুরে কথা বলে মেয়েরা। ইভার দৃষ্টিতেও ফুটে উঠেছিল আত্মপ্রত্যয়ের হাসি—বিশ্ববিজয়িনীর। কিন্তু সে হাসি স্থায়ী হয়নি। ওর কাজলকালো চোখের পর্দায় অতিক্রান্ত কতকগুলো ভাবের অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে পর পর। ‘মণ্টাজ-এফেক্টে’র অসংলগ্ন চিত্র যেন, যার আপাত অর্থ দুর্বোধ্য কিন্তু সবটা মিলিয়ে যার একটা মানে হয়। ইভার হাসি মিলিয়ে যাবার আগেই সুপার ইম্পোস হল একটা বিশ্বয়ের অভিব্যক্তি আর সেই বিশ্বয়ের ব্যঙ্গনাটা ভালো করে না মেলাতেই প্রক্ষিপ্ত হল একটা আতঙ্কের আভাস! তাডাতাড়ি খাবার আর জলটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ইভা বলে, আপনি বহুদূর আমি এখুনি আসছি।

চলে যায় ইভা।

কুশানু বসে পড়ে একটা চেয়ারে। একটা ছিছিকারে তার অন্তঃকরণ পূর্ণ হয়ে গেছে ততক্ষণে। একটা বোবা কান্না যেন উঠে আসছে ওর কণ্ঠনালী বেয়ে। কী অসহায় সে! মনে মনে একটা অদৃশ্য শত্রুর মুখে ঘুষির পরে ঘুষি চালায় কুশানু।

মিনিট পাঁচেক পরে ইভা যখন ফিরে এল ঘরে তখন বাঁ কাঁধের আঁচলটাই শুধু ঘুরে আসে নি ডান কাঁধের উপর দিয়ে, হঠাৎ বাতাসটা ঠাণ্ডা বোধ হওয়ার জন্যই বোধ হয় একটা কান্নারী হাফ আলোয়ান জড়িয়ে এসেছে গায়ে। বৈশাখের সেটা আঠারো তারিখ।

প্রয়োজন ছিল না। কারণ টেবিলের উপর তেমনিই পড়ে আছে খাবারের থালাটা। অতিথি চলে গেছে নীরবে।

পরের দিন দুই অসুস্থতার অজুহাতে পড়াতে আসেনি কুশানু। কলেজ থেকেই টেলিফোন করে দিয়েছিল। অজুহাত কথাটা ঠিক নয় অবশ্য, সত্যিই অসুস্থ ছিল সে। মানুষের সুস্থতা কি শুধু ধার্মোমিটারের পারা আর ব্লাড-প্রেসারের যন্ত্রই ধরতে পারে? পুরো দুটি দিন তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে অসুস্থ মনের সঙ্গে। অনেক দিন পরে এবার আক্রমণ হয়েছে তার। ওর মনের কোন গভীর কন্দরে আত্মগোপন করেছে শত্রুটা। তার সন্ধান সে পায় না, পাবেও না বোধ হয় কোন দিন। মাঝে মাঝে মনের গুপ্ত গুহা থেকে

বাণ মারে সেই ওরীন—ওর চোখে বুলিয়ে দেয় বাহুকাঠির স্পর্শ। বহুদূর থেকে  
মত প্রত্যক্ষকে হঠাৎ পার করে ও দেখতে পায়।

সেদিনও হয়েছিল সেই আক্রমণ। হঠাৎ ইভাদেবীর চাপারঙের সিকের  
শাড়িটাকে মনে হয়েছিল কাচের, ব্লাউজটা কর্পূরের মত উপে গিয়েছিল—  
অস্তবাস আর অধোবাস দুটিকে মনে হয়েছিল সেলোফেনের তৈরি। গণী  
অথবা টিশিয়ানের মডেলের মত নিরাবরণ শ্রামলারঙের একটি নারীমূর্তি  
সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল ওর দৃষ্টির সম্মুখে।

এই ওর রোগ। ক্রনিক মানসিক ব্যাধি।

কাউকে এ কথা বলা যায় না। নিজে নিজেই লাইব্রেরী থেকে  
মনোবিজ্ঞানের বই এনেছে, পড়েছে। নিজেই রোগনির্ণয়ের চেষ্টা করেছে।  
বুঝেছে ওর নিজস্ব মনে নিশ্চয় গোপন আছে এমন কোন কামনা যার বহিঃ-  
প্রকাশ হয় এইভাবে! পুরো দুটি দিন তারসঙ্গে লড়াই করে খানিকটা  
মানসিক স্থৈর্য ফিরে পাওয়ার পর তৃতীয় দিনে সে এসেছিল আবার ছাত্রীকে  
পড়াতে।

ইলা সলজ্জে ক্ষমা চেয়েছিল। ছুটি না নিয়ে মাসীর বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার  
অপরাধে। ওর মাসিমা থাকেন পশ্চিমে—হঠাৎ দুদিনের জন্ত এসেছেন,  
টেলিফোন করে ইলাকে ডেকে পাঠান। মাস্টারমশায়ের কাছে ছুটি নেওয়া  
নেই বলে প্রথমে ও যেতে রাজি হয়নি; কিন্তু বড়দিই একরকম জোর করে  
ওকে পাঠায়। বড়দি ওকে আশ্বাস দিয়েছিল মাস্টারমশাইকে ব্যাপারটা  
সেই বুঝিয়ে বলবে।

কুশাহু হেসে বলে, আরে, না না। আমি রাগ করিনি। মাসিমা ডাকলে  
যেতে তো হবেই।

কিন্তু ছুটি নেওয়া ছিল না যে আমার?

তাতে কি হয়েছে?—ঘরের নেভী রু পর্দার নীচে ঘাসের চটিপরা ছুটি  
পা আগেই নজরে পড়েছে কুশাহুর, তাই হালকা করে বলে, জান ইলা, ছুটি  
দুরকমের। একটা হল আর্নড-লীভ; তুমি যদি খুব ভালো পড়া বলতে পার  
তাহলে আমি তোমাকে দু' একদিনের ছুটি দিতে পারি। সেটা হবে তোমার  
আর্নড-লীভ। আর হঠাৎ কোন কারণে যদি না পড়তে বসতে পার তাকে  
বলব ক্যাজুয়াল-লীভ—গত মঙ্গলবার যা তোমার হয়েছিল।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে ইভা। বলে, মাস্টারমশাই তোমাকে সবটা

বলেম মি ইলু। দুটি আললে তিন রকমের, তৃতীয় রকমের দুটি নেয় মাহুখে শুধু ফাঁকি দেওয়ার আনন্দে, তাকে বলে ফ্রেঞ্চ লীভ। তার উদাহরণও আমি দেখাতে পারি।

ইভা সে কথায় কান দেয় না। মাস্টারমশাই যে রাগ করে নেই এটাই তার কাছে বড় কথা। বলে, প্রথম যখন কেউ বলল মাস্টারমশাই না খেয়েই চলে গেছেন, তখন সত্যিই ভীষণ ভয় হয়েছিল। তারপর বড়দির কাছে শুনলাম যে কেউ ভুল বলেছে, আপনি রাগ করেননি, খাবারও খেয়েছেন, তখন প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

কুশাহু চমকে ওঠে! সে দিন খাবার খেয়েছে সে? এই কথা বলেছে ইভা? কেন? অপরিণীত কৌতূহলে এবার সে ইভা দেবীর দিকে চোখ তুলে তাকায়।

আর তাকিয়েই তার হৃদয় আনন্দে যেন হাততালি দিয়ে ওঠে। না, তার দৃষ্টি বিশ্বাসঘাতকতা করছে না, আর পাঁচজন যা দেখত সেও তাই দেখছে। তার চোখেব রেটিনাতে যে ছবি পড়ছে ঠিক তাই দেখছে সে, প্রত্যক্ষ-পার-করা রণজেন রশ্মির দৃষ্টি কোন মোহাবেশ সৃষ্টি করছে না।

সে স্পষ্ট দেখছিল চাঁপা রঙের শাড়ি-পরা ইভা খাবারের থালা হাতে এসে দাঁড়িয়ে আছে অনতিদূরে। ডীপকাট আগুনরঙের জ্যাকেটটা চেপে বসেছে ওর পুরস্কৃত গায়ে। নিটোল দুটি হাতে দুটি মোটা ক্রলি, গলায় সরু একটা মফচেন। প্রতিমার যুগল-চরণেব মাঝখানে যেমন আটকে থাকে রাঙাজবা তেমনি হুলছে বুকের উপত্যকায় সোনা-বাঁধানো টকটকে লাল একটা দার্জিলিঙ-পাখব।

পূর্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়েও কোন চিন্তাঞ্চল্য বোধ করল না কুশাহু। এভারেস্ট চূড়ায় দাঁড়িয়েও এতটা উৎফুল্ল হয়নি তেনজিং। স্বাভাবিক, আর পাঁচটা ভদ্রলোকের মতই স্বাভাবিক কণ্ঠে ইভার চোখের উপর দৃষ্টি রেখে কুশাহু বললে, কিন্তু বোজ রোজ আমাদের এখানে জলখাবার খেয়ে যেতে হবে, এটাই বা কি কথা?

ইভা হেসে বলে, রোজ রোজ তো নয়, কাল খাননি, পরশুও খাননি—

তরুণ?

তরুণ অবশ্য খেয়েছিলেন।



খেয়েছিলাম ?

ইভা একটু বিব্রত হয়ে বলে, পারি না আপনার সঙ্গে নাগাড়ে তর্ক করতে ।  
আমার বইটা এনেছেন ?

ইভাকে গ্রামিনাল লাইব্রেরীর সভ্য করে দিয়েছে কুশানু । ওর বাবার আলমারীর যে সব বই ওর বুদ্ধির আর রুচির উপযুক্ত, প্রায় সবগুলিই পড়ে ফেলেছে ইভা । আজকাল তাই কুশানু লাইব্রেরী থেকে ওর জন্যে বই নিয়ে আসে । ইভারই নির্দেশে ।

চাওয়া শেষ হতেই ইভা বলে, এক গ্রাস জল নিয়ে এস তো ইলু ।

ইলা জল আনতে চলে যেতেই কুশানু বলে, ওকে কেন মিথ্যা বললেন ?

ইভা নতনেত্রে বলে, সেদিনকার আচরণের জন্য আমি লজ্জিত, আপনি আমায় মাপ করবেন ।

কুশানুর কথা ফোটে না । মাপ যদি কাউকে চাইতেই হয়, তাহলে তারই চাওয়া উচিত । নির্জন ঘরে সে যে দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল একটি অনাত্মীয়া মহিলার দিকে সে দৃষ্টি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক নয়—না হলে অনেক ক্লাব-পার্টির অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ইভা অমন ছুটে পালিয়ে যাবে কেন ? কি একটা কথা বলবার উপক্রম করতেই ইভা বলে, থাক । ও প্রসঙ্গটা আমরা তুলব না । ধরে নেওয়া যাক সেদিন সন্ধ্যায় কোন ঘটনাই ঘটেনি ।

কুশানু পূর্ণচ্ছেদ টেনেছিল এ প্রসঙ্গে, ধরে নিলাম ।

দিন পনের বাদে রামনন্দন কুশানুর হাতে তুলে দিল আবার একখানা চিঠি । এবার আর পোস্টকার্ড নয়, ইনল্যাণ্ড থাম । প্রথমটা খেয়াল হয়নি, তারপরেই মনে পড়ল ওর । দিনকতক আগে রামনন্দনের একটা চিঠির জবাব লিখে দিতে হয়েছিল তাকে । এখানা তারই জবাব ।

‘শ্রীচরণকমলেশু, তোমার পোস্টকার্ড পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম । এবার খুব লক্ষ্মী হয়েছ দেখছি, চিঠি পেয়েই জবাব দিয়েছ । কলকাতা শহরকে ভয় পাই বলাতে অত ঠাট্টা কিসের ? পার্টনাও বড় শহর, সে জন্যে বলিনি । তবে শুনেছি কলকাতায় নাকি অনেক মায়াবী আছে । তারা নাকি মানুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখে । তাই ভয় পেয়েছিলাম মাত্র ।

হুধের কথাটা জোয়ার না লিখলেও চলত । ভুলে যেও না, তুমি যেমন রামাওতারের বাপ আমিও ডেমনি তার মা । ওই হুধের বাছাকে বঞ্চিত

করে সমস্ত দুধটা আমি বিক্রি করছি, এ কথা ভাবতে পারলে কি করে তুমি ?  
কিন্তু রামাওতার কি সাত সের দুধ খেতে পারে ?

বাংলা হরফে চিঠি পেয়ে অবাক হয়েছ, লিখেছ। কিন্তু অবাক হবার  
কি আছে ? বাঙালী কোথায় নেই ? নাগরি হরফের চিঠি পড়াতে তোমার  
অসুবিধা হতে পারে মনে হওয়ায় বাংলা জানা একজনের কাছে গিয়েছিলাম।  
তার সম্বন্ধে অত কৌতূহল কেন ?

মেসের খাওয়া নিয়েও খোঁচাটা না দিলেই পারতে। আমি তো বলিনি  
যে মেসের বাবুরা তোমাকে খেতে দেন না। তুমি হয়তো মেসের কোন  
বাবুকে দিয়েই চিঠিখানা পড়িয়েছ, আর জবাব লিখিয়েছ, তাই হাটের মাঝে  
পড়া কথাটা তার গায়ে বেজেছে। না হলে কোন বক্রোক্তিই করিনি  
আমি।

আমাদের এখানে এখনও বর্ষা নামে নি। লু বন্ধ হয় নি আজও।  
কবে যে বর্ষা নামবে তাই ভাবছি। তোমার কথামত রামকে  
পাঠশালায় ভতি করে দিলাম। যদুনন্দন, তেওয়ারীজী, সহেলী, পীতম,  
ভগলু সবাই ভালো আছে। ভগলু বলছিল এবার সে বউ আনতে  
যাবে। কিন্তু তার ইচ্ছা তুমি এলে 'বরাতে'র ব্যবস্থা করা। ভগলু জানতে  
চেয়েছে তোমার পক্ষে শীঘ্র আসা কি সম্ভব হবে ? এখন তো গ্রীষ্মের ছুটি  
চলছে কলকাতার জুল কলেজে। তোমাদের মেসের মুখপোড়া বাবুদের কি  
ঘরদোর বলে কিছু নেই, ছুটিতে বাড়ি গেলেই তো পারে তারা। আমার  
প্রণাম নিও, ইতি তোমার ফুলেশ্বরী।'

চিঠিখানা পড়ে মনে মনে খুব হেসেছিল কুশাহু। কে এই 'স্বরসিক  
লিপিকার ? ফুলওয়ারি গাঁয়ে কোথা থেকে আবিষ্কার করল তাকে  
রামনন্দনের প্রোষিতভর্তৃকা ? ভাল করে লক্ষ্য করে সে চিঠিখানা।  
গোটা গোটা মেয়েলি হাতের লেখা। রামনন্দনকে প্রশ্ন করে জানা গেল,  
না, ওর গাঁয়ের ত্রিসীমানায় কোন বাঙালী নেই। কাকে দিয়ে লেখায় তা  
রামনন্দন কি করে জানবে ?

কল্পনাবিলাসী কুশাহু কৌতুক বোধ করে, কৌতূহলও হয় তার।  
নিঃসন্দেহে চিঠির লিপিকার একজন বাঙালী মেয়ে। বাঙালী,—না হলে এমন  
সুন্দর বাংলা লেখা সম্ভব নয়। কোন অবাঙালীনার পক্ষে মুখপোড়া গালের এমন  
মধুর প্রয়োগ কল্পনাতীত। মেয়ে নিশ্চয়, না হলে ফুলেশ্বরী কেমন করে বরের

চিঠি পড়াতে যাবে? কিন্তু কে এই মেয়েটি, অথবা মহিলাটি? কেমন করে হাজির হল সে ঐ ফুলওয়ারি গাঁয়ে?

পরের দিন রামনন্দন একটি সাদা পোস্টকার্ড হাতে করে এসে দাঁড়ায়। কুশান্ন লিখতে থাকে রামনন্দনের নির্দেশমত। লেখা শেষ হলে রামনন্দন হাত বাড়ায়। কুশান্ন বলে, থাক, ঠিকানা লিখে আমিই দিয়ে দেব ডাকবাঞ্চে।

তারপর রামনন্দন নিশ্চিত হয়ে চলে গেলে পোস্টকার্ডটা সে ছিঁড়ে ফেলে। একটা চিঠির কাগজে সে আবার লেখে রামনন্দনের বক্তব্য, তারপর আরও লেখে—‘মায়াবী কি শুধু কলকাতাতেই আছে ফুলেশ্বরী, মেয়েমানুষ জাতটাই মায়াবীর জাত। দেখছ না সাড়ে তিনশো মাইল দূর থেকেও কেমন বীতংগ ক্ষেপন করে লক্ষ্য করে জালে পড়া মাছের ছটফটানি?...তুমি ঠিক আন্দাজ করেছিলে, আমাদের মেসের বাবুকে দিয়েই লিখিয়েছিলাম চিঠিখানা। বাবুর ভারী গর্ব জ্বরদস্ত চিঠি লিখিয়ে তিনি। এতদিনে টের পেয়েছেন তাঁরও জুড়ি আছে।...তা সে যাই হোক এ হতভাগ্য বাবুর গোটা মুখটা না হলেও কপালটা সত্যিই পোড়া। তিনকূলে কেউ নেই যেখানে গিয়ে গ্রীষ্মের ছুটিটা কাটিয়ে আসতে পারে। সেই দঙ্কললাটবাবুর জন্তেই পড়ে আছি মেন কামড়ে। না হলে এই ছুটিতেই ছুটে যেতাম যেখানে আমার বিরহিণী ভগলুর ‘বরাতে’র ছল খুঁজছে।...তাই বলছি ফুলেশ্বরী, যেতে আমি পারি, কিন্তু ভগলুর পুনর্জন্ম উৎসবেই শুধু যোগ দিতে নয়। যদি তুমি সত্যি কথাটা স্বীকার কর আগামী ডাকে। আসলে তোমারই মন কেমন করছে আমার জন্ত, তাই নয়? পরের ডাকে এই সত্যি কথাটা স্বীকার করলে আমি আমার মেসের বাবুকে গিয়ে ধরে পড়ব। বিশ্বাস আছে বাবু ছুটি দেবেন; কারণ বাবু জানেন কলকাতার মেসের বাবুরা দঙ্কানন হলেও ফুলওয়ারি গাঁয়ের যাবতীয় জীবনের মুখপঙ্কজ অনিন্দ্য!

একটা কথা। অনেক আজ্ঞে বাঞ্চে কথা লিখি চিঠিতে। পদাধিকার-বলে যিনি তোমার লিপিকার তাঁর পদটা কি ট্রান্সফারেবল? সেটা জেনে রাখা ভাল, না হলে নূতন লিপিকার এ চিঠির মর্মোদ্ধার করতে তো পারবেনই না, উপরন্তু একটা প্রহসনের সৃষ্টি হবে মাত্র।

আমাদের এখানে কিন্তু বর্ষা নেমেছে। এতদিনে তোমাদের ওখানেও



নারী বোধ হয়, তাই নয় ? প্রথম বর্ষের অল্পবয়সী এ বছর কেমন লাগল জানিও ।’

কুশানুর মনটা কী পাগলামী শুরু করেছে । মনটা পড়ে আছে কখন আসবে ফুলওয়ারি গায়ের ফুলেশ্বরীর প্রেমপত্র । বিশেষ একটা কারণে বেশী খুশী হয়েছে সে । তার এই চব্বিশ বছরের জীবনে যে কটি মুষ্টিমেয় মেয়ের সান্নিধ্যে ওকে আসতে হয়েছে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে-নি লাজুকস্বভাব কুশানু । তাদের কেউ কেউ ওর পা টেনেছে । ও কখনও ছুতসই একটা প্রতি-আঘাত করতে পারে নি । পারে নি ওর স্বভাবের দোষে । এই একটি ক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত আক্রোশের প্রতিশোধ নিতে সে উদ্যত ।

ফুলওয়ারি গায়ের এই অপরিচিতা মেয়েটিকে সে চেনে না, এখানে চক্ষুজ্জার বালাই নেই । তাকে প্রত্যক্ষ দেখার সম্ভাবনাও নেই তিলমাত্র । দৃষ্টিবিভ্রমে ওর সম্মুখে কোনদিন বিডম্বিত হতে হবে না তাকে । তাই সে একেবারে বেপরোয়া । তাই বেশ সহজ স্বে ফুলেশ্বরীর নলচের আড়ালে ঐ অপরিচিতার অনুরী-নেশায় মৌজ করছে অনায়াসে ।

জবাব এল চিঠির , এবার পাঁচ দিনের মাথায় । খামেব চিঠি । রীতিমত ভারী খাম । মেসে কুশানু আর রামনন্দন ছাড়া আর কেউ নেই । চিঠি-পত্র যা পড়ে দেওয়ালে আটকানো কাঠের বাক্সটায়, সেগুলি রামনন্দন এনে হাজির করে ওর কাছে । কুশানুর নিজের চিঠি আসে না একখানাও, বন্ধুদের চিঠির ঠিকানা কেটে আবার রামনন্দনের হাতেই ফেরত দেয়—রাস্তার মোড়ের ডাকবাক্সে ফেলে দিতে । রামনন্দন এনে দিল খামটা । তার উপরে গোটা গোটা হরফে রামনন্দন কাহারের নাম লেখা । চিঠিখানা হাতে পেয়ে কুশানু তাড়াতাড়ি খুলে পড়তে থাকে ।

রামনন্দন একটু অবাক হয়, কিন্তু বাবুর নামে চিঠি আসতে সে দেখে নি কখনও ইতিপূর্বে, বলে, আপ ই কা হ ?

ঈশ্বর কুশানুকে মার্জনা করুন । একটা ঢোক গিলে অমানবদনে জলজ্যান্ত মিথ্যা কথাটা বলে ফেলে সে, হ্যাঁ, এক পেয়লা চা ।

এক কাপ চা নিয়ে, সিগারেটটা ধরিয়ে মোতাত করে চিঠি পড়তে বসে । রামনন্দন কাহারকে লেখা ফুলওয়ারি গায়ের বিরহতাপিতা ফুলেশ্বরী কাহারনির প্রেম-পত্র । দীর্ঘ চার পৃষ্ঠা ।

তাতে আছে রামাওতারের কুশল সংবাদ, ভগলু-পীতলের খবর, তেওয়ারী-জীর সর্দিজর এবং গত বৃহস্পতিবারের রাতে শিউনন্দনজীর কনকের আম গাছটার উপড়ে পড়ার মর্মবিদারক ছঃসংবাদ। কিন্তু সে তো মাত্র এক পৃষ্ঠায় একটি কোণে ঠাসবুনোট হয়ে আশ্রয় নিয়েছে। বাকি সাড়ে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী লিপিকুশলতার পরিচয়। প্রথম বর্ষাগমের খানিকটা বর্ণনা, কিছুটা রবীন্দ্রনাথ, কিছুটা কালিদাসের স্পর্শ আছে সে বর্ণনায়। নিঃসংশয়ে লিপিকার উচ্চ-শিক্ষিত। বিদ্যাপতির অতি-পরিচিত একটা গোড়া চরণ যেন ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে সে বর্ণনায়, ঘোর যামিনীর চিত্রায়নে, অধির বিজুরিয়ার চকিত চমকে। ফুলওয়ারি গাঁয়ের বিরহিণী বধু ফুলেশ্বরী কাহারনির অন্তরের গুমরানিই যেন শোনা যাচ্ছে সে মেঘগর্জনে।

মন কেমন করার প্রসঙ্গে লিখেছে, তুমি স্বীকার করতে বলেছ যে তোমার জন্তেই আমার মন কেমন করছে। কিন্তু সে কথা কি কাগজের উপর কালির আঁচড় কেটে না লিখলে তোমাদের নজরে পড়ে না? পুরুষ জাতটাই অমনি! মেয়েমানুষকে তারা শুধু মায়াবী বলেই চিনতে শিখেছে—এটুকু জানে না যে ও-জাতের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না! লজ্জা কি অতই সহজে ভাঙে? যার ভাঙে তার ভাঙে, আমার বাপু ভীষণ লজ্জা করে! ধরতে গেলে তোমাকে আমি ভাল করে চিনিই না। তুমি বলবে, সে কি? সাত বছর ঘর করলে এক সঙ্গে, কিন্তু সময়ের গজকাঠি দিয়ে কি মনকে মাপা যায়? যায় না। তা যদি যেত তাহলে কখনই সংশয় থাকত না তোমার মনে কেন ভগলুব পুনযাত্রা উৎসবটা আটকে রয়েছে তোমার অভাবে।

আরও শেষের দিকে ফুলেশ্বরী লিখেছে, চিঠি কাকে দিয়ে লেখাই সে কথা জানবার জন্তে তোমার অদম্য কৌতূহল দেখছি! কিন্তু কেন বল তো? কোন কম্পোজিটার অক্ষরগুলো সাজিয়েছে না জেনে বুঝি কোন সাহিত্য-পুস্তকের সমালোচনা কর না তুমি? কথাগুলো যে আমারই এটা বিশ্বাস কর না কেন? যাই হোক তোমার অদম্য কৌতূহল চরিতার্থ করতে সত্য কথাটা জানালাম এবার। পাটনার এক বাবুকে আমি রোজ দুধ ষোগান দিই। বাবু পাটনা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তোমার মত দিব্যি পুরুষ্টু একজোড়া নধর গৌর আছে। সেই বাবুই লিখে দেন চিঠি। এবার হল তো?

যেন এক অদ্ভুত নেশার ভূত চেপেছে কুশাহুর ঘাড়ে। ফুলেশ্বরী আর রামনন্দনের প্রেমকুজনের আড়ালে সে নেমে পড়েছে নেশা ধরা এক মজার

খেলায়। ওর সবচেয়ে মজা লাগত এই কথাটা ভাবতে, যে ওই লিপিকারে সজে তার পরিচয় নেই, হবেও না কোনদিন। ও জানে না সে দেখতে কেমন, কি করে, কি ভাবে। মনে মনে কুশাহু মেয়েটির পোর্ট্রেট আঁকত নিত্য নতুন রঙে। ভাবত, সেও উদ্গ্রীব হয়ে থাকে, কবে আসবে ফুলেশ্বরী আঁচলের তলায় চিঠির পসরা লুকিয়ে নিয়ে। নিশ্চয়ই স্কুলে-পড়া দোলায়িত বেণী-কিশোরী সে নয়, তার ভাষার গুরুত্বই সে সিদ্ধান্তের স্বাক্ষর। হাতের লেখাটা গোটা গোটা, মুক্তোর মত ঝরঝরে। একটু যেন বামাগতি আছে তাতে, অর্থাৎ বাঁয়ে হেলানো হরফগুলো। নিঃসন্দেহে ওর মন পরিণতি লাভ করেছে, শুধু রবীন্দ্রনাথের শ্রামগন্তীর সরসাই নয়, মেঘদূতের পুষ্পর বংশের কুলতিলক বলেও বর্ণনা করা হয়েছে কালবৈশাখীর মেঘকে। একগাদা বইখাতা ইন্সট্রুমেন্ট-বক্স বুকে চেপে যে মেয়ে দশটা বেলায় দোরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে কখন আসবে স্কুলের বাস, তার কলম অন্ততঃ এখনও বলতে শেখে নি, মেয়েদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না।

কিন্তু তাই বলে কৈশোর অতি-অতীত নয় ওর। বয়ঃসন্ধির উচ্ছলতাকে একেবারে অতিক্রম করে ও যদি পরিপূর্ণ পরিণতমনা হত তাহলে কখনই লিখতে পারত না পাটনা মেডিকেল কলেজের এক গুন্ফগৌরবদীপ্ত দুগ্ধপোষ্য বাবুকে দিয়ে ফুলেশ্বরী তার ববকে চিঠি লেখায়! এটুকু কৌতুক করবার, এটুকু লিখে মজা দেখবাব মত ছেলেমানুষী তার আজও ঘোচে নি।

মেয়েটি কি বিবাহিত! সে কি কুশাহুকে নিয়ে খেলাচ্ছে? ওর চিঠি নিয়ে সত্তাবিবাহিত একটি বাঙালী বববধু কি হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে! কান দুটো গবম হয়ে উঠেছিল বেচারীর। কুশাহুর কি আরও সংঘত হওয়া উচিত?

কিন্তু সংঘত ও হতে পারেনি। কেমন যেন নেশা ধরে গিয়েছিল। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বোধ কবত অপরিচিতার অজ্ঞাত পরিচয়ের জগ্ৰেই। যার সঙ্গে ওর লিপিবন্ধু হতে চলেছে তাকে সে চেনে না, সেও ওকে চেনে না। এই অপরিচয়ের আকর্ষণই ওকে সবচেয়ে বেশী করে টানত। ছেলেবেলায় মতির মায়ের মুখে শোনা ভূতের গল্পগুলো যেমন নেশা ধবাত এও যেন অনেকটা তাই। রাক্ষসগুলোকে সে দুচক্ষে দেখতে পারত না, তবু রাজপুত্র-রাজকন্যার নিরামিষ গল্পগুলো জমত না। ষতক্ষণ না হাঁউ-মাউ-খাঁউ রাক্ষসটা এসে হাজির হত মতির মা বর্ণিত তার সমস্ত ভয়াবহতা নিয়ে।



কেমন যেন নেশা ধরে যেত। হাড়ের মধ্যে সিরসির করত ভয়ে ; সে সিরসিরানির মধ্যে অদ্ভুত রকমের একটা স্থথাস্থুতিও মেশানো ছিল যেন। এই অজানিতার সঙ্গে নলচে-আড়াল-দেওয়া প্রেম-পত্রের আদান-প্রদান ছিল তেমনি একটা সিরসিরানির নেশা।

আরও একটা কথা। আর সেটাই সবচেয়ে বড় কথা! এই মেয়েটির নগ্নমূর্তি একবারের জন্তেও ফুটে ওঠেনি ওর মনের ক্যানভাসে। অকাজের অবসরে ও মনে মনে অসংখ্য চিত্র এঁকেছে মেয়েটির নানান পোশে। একটাও স্ল্যুড-স্টাডি নয়। চোখ বুজে যে মেয়েটিকে দেখতে পেত, সে যেন রক্তমাংসে গড়া নয়, সে যেন একটা আইডিয়া, একটি তন্ত্রী-তরুণীর দেহের আভাস নিয়ে রূপায়িত হয়েছে। সে যেন পুরোপুরি একটা নারীদেহের স্থলতার মধ্যে আবদ্ধ নয়। তার যেন ‘শেপ’ আছে, কিন্তু ‘ম্যাম’ নেই! সূর্যোদয়ের আগে যে ঠাণ্ডা মিঠে-মিঠে একটা হাওয়া বয়, তেমনি হাওয়া দিয়ে যেন সে তৈরি—পাখীর পালকের মত হালকা, স্বচ্ছতোয়া নদীর মত নির্মল। টেবিলের উপর চিঠির প্যাড টেনে নিয়ে যখন সে ফুলেশ্বরীর বকলমে মন উজাড় করে দেয় তখন ওর স্তন্যমাত দু-একগোছা চুল ঝাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মেয়ে দেখে, সে কি লিখেছে। ধূপছায়া রঙের একখানি ঢাকাই শাড়ি পরেছে সে, কপালে স্নানের পর দিয়েছে সিঁদুরের টিপ!

যতবাব চোখ বুজে কল্পনা করেছে, ততবারই ওর অদেখা মানসী এই একই সাজে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। ওই ধূপছায়া রঙের শাড়ি, পায়ে আলতা, কপালে কুমকুমেব নয়, সিঁদুরের টিপ। গৃহস্থালীর নানান কাজে ব্যস্ত মেয়েটিকে সে দেখেছে মনে মনে, আর আশ্চর্য, কুশানুর নিজ্ঞানলোকের সেই গোপনচারী দুঃশাসন দেখায়নি একবারও ওর আঁচল ছোঁওয়ার দুঃসাহস।

কুশানু জবাবে শেষদিকে লিখল, ‘ফুলেশ্বরী, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। কালির আঁচড়ে কাগজের উপর না লিখলে তোমার হৃদয়-নিওড়ানো কথাটা বুঝতে পারব না একথা ভাবলে কেন? আমি কি জানি না—কত ভালোবাস তুমি আমাকে! তবু ওইখানেই তো। প্রেমের রহস্য। জানা কথা আবার শোনবার জন্যই প্রেমিকেব প্রাণে নিত্য আকুলি। ওই একটি কথাই মানুষ যুগে যুগে বলেছে, কালে কালে শুনেছে। আমি তো বিরহ-জর্জরিত সামান্য রামনন্দন, নীলিমাহীন আকাশে ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব

নিম্নে<sup>১</sup> একদিন কবিরাজীম্বরঃ বিধাতাকেও হয়তো প্রলয়লঙ্কার বলতে হবে  
‘ওই কথা দুটি, বলবেন, বল তুমি স্কলর; বলবেন, বল আমি ভালোবাসি।

তোমাকে পুরোপুরি পাইনি। নাইবা পেলেম। একটু ছোঁওয়া নিয়েই  
যাক না আমার অলসবেলা কেটে। আজ শুধু অহুভব লাগছে তোমার  
কাপড়ের রঙের আভাস, পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার হাওয়া, চেয়ে দেখার  
বাণী, ভালোবাসার ছন্দ—

অচেনার লজ্জা? অত সহজে কি এড়িয়ে যেতে দেব তোমায়? অচেনা  
বলেই তো আমার জোর বেশী, দাবি অমোঘ। সাত বছর ঘর করেও আমি  
তোমার কাছে অচেনা—কিন্তু তিনটি চিঠির আদানপ্রদানেই তোমার উপর  
জন্মেছে আমার অপবিচয়ের দুরতিক্রম্য দাবি। সেই দাবির জোরেই  
বলব—‘রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে, যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?’

ধরা তুমি পড়ে গেছ ফুলেশ্বরী! এ মুষ্টির কবল থেকে তোমার আর  
উদ্ধার নেই। স্বীকার না করে পালাবে কি করে? ‘ঘোর যামিনী’, আর  
অধির বিজুলিয়ার চমক বলেই সরমে সংঘত করেছ কলমকে কিন্তু আমি  
তো জানি ওর পরের চরণটাই বর্ষাব দ্রিমি দ্রিমি বোলে সেদিন সারারাত  
তোমার অন্তরে অহুরণিত হয়েছিল।

বড বাজে কথা লিখছি, নয়? কিন্তু আমার তো সঙ্কোচের কোন  
কারণ নেই। আমার হৃদয়ের এই অহৈতুকী উচ্ছ্বাস তো বিহারী বিরহিণী  
কোন সূচরিতাকে শুচিস্মিতা করে তুলবে না, আমার এ চিঠি পাঠ করবেন  
শুকগৌরবদীপ্ত পাটনা মেডিকেল কলেজের অনৈক দুঃখপোষ ছাত্র। তাই  
আমার তরফে আর লজ্জা কি?

পত্রশেষে গাইতে ইচ্ছে ববছে, এবাব অবগুণ্ঠন খোল!’

চিঠিখানা ডাকবাংলো ফেলে পর্যন্ত কুশাহুর মন এক রীতিমত পাগলামির  
নেশায় মেতে আছে। কোন কাজে মন বসে না। যুনিভার্সিটি অবশ্য বন্ধ,  
কিন্তু স্টাশনাল লাইব্রেরী খোলা আছে। ছুটিতে একটু পড়াশুনা করবে  
বলে মনে করেছিল, ভাল লাগে না। ক্রাইম নভেল পড়ার ঝোঁক ছিল  
ওর। অপরাধ বিজ্ঞানের উত্তেজক বইগুলোও বাঁধতে পারে না ওর মনকে।  
লঙ্ঘ্যাবেলা ঘণ্টাখানেক পড়িয়ে আসে ইলাকে, কিন্তু মনটা পড়ে থাকে  
মেসের দেওয়ালে আটকানো কাঠের বাক্সটার। দৈনিক ডাকপিয়নের

মাফা গেলেই হুড়ুি খেয়ে পড়ে। রামনন্দনের নজর এড়িয়ে চিঠিখানা প্রথমেই তাকে হস্তগত করতে হবে।

অবশেষে এল জবাব। নীল রঙের হৃদয় লম্বাটে থাম। উপরে গোটা গোটা হরফে রামনন্দন কাহারের নাম লেখা। থামটা খুলে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল যে চিঠিখানি তাতে এবার আর 'শ্রীচরণকমলেশু' পাঠ নেই। লেখা ছিল—

‘অপরিচিতেশু, আপনার নাম ঠিকানা জানা না থাকায় বাধ্য হয়ে থামের উপরে রামনন্দনের নাম লিখতে হল। এ চিঠি রামনন্দনকে লিখছে না ফুলেশ্বরী, লিখছি আপনাকে আমি। আপনি আমাকে রীতিমত বিপদে ফেলছেন। রামনন্দনকে আপনি কি ভাবে ঠাণ্ডা করছেন জানি না, কিন্তু আমার অবস্থা শোচনীয়। আপনার ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী চিঠিখানি আচলের তলায় লুকিয়ে ফুলেশ্বরী এসে যখন বসল আমার ঘরের চৌকাঠের উপর তখনও বিপদের গুরুত্বটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। বুঝলাম একটু পরে। যখন চিঠির নির্গলিতার্থ বুঝিয়ে দিতে আমার আধমিনিটও সময় লাগল না। থামতেই বলে, আউর ক্যা লিখা? সঙ্গত প্রশ্ন! যে চিঠি পড়তে দশ মিনিট লাগে, যে চিঠির বক্তব্য ছয় পৃষ্ঠার বিশাল পরিসরেও শেষ না হয়ে উপচে পড়ে মার্জিনে, সে চিঠির বক্তব্য কি অত শীঘ্র শেষ হতে পারে?

আপনাদের ছাত্রাবাস সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। জানি না কী পরিবেশে রামনন্দন পড়ে আছে। তবু কলকাতার ছাত্রাবাসে একজন ভৃত্যের জীবনযাত্রা আমাকে কল্পনা করতে হয়। মনে মনে বুনে চলি কাহিনীর জাল—বলে গেলাম মুখে মুখে।

...সকালে উঠে বাবুদের চা করতে হয়, দোকান থেকে এনে দিতে হয় ডিম-টোস্ট-বিস্কিট। তারপর বাজার যাওয়া। সাড়ে নটার মধ্যেই রান্না শেষ। ডাইনিং হলে ঘণ্টা পড়ে। ছড়মুড় করে সবাই ছুটে যায় সেখানে। সারি সারি টেবিল পাতা! ব্রান্ধ পানচক পরিবেশন করে যায়। রামনন্দন ষোগান দেয়, জল, হুন, লেবু। তারপর দশটা বাজে কি না বাজে ঘরে ঘরে তাল পড়ে যায়। ছাত্রের দল উর্ধ্বাধাসে ছোট্ট পার্সেন্টেজ রাখতে। দু-একটি ঘরের রুদ্ধদ্বারে অবশ্য তখন বসে তেতাশের আড্ডা। পার্সেন্টেজ রাখবার জন্য তাদের পরিশ্রম করতে হয় না, প্রক্লির বকলম ব্যবস্থা আছে। রামনন্দন এই সব বাপের সুপুত্রদের খিদমৎ করতে লেগে যায় তখন। বারে বারে



ডবল-হাফ চা আন, সিগারেট আন, টাকার ভাঙানি এনে দাও। তারপর বেলা গড়িয়ে আসে। বাঁকা হয়ে ঘরে ঢোকে রদুয়। এক এক করে ফিরে আসে কর্মক্লাস্ত ছেলের দল। ঘরে ঘরে ডবল-লক তাল খোলার আওয়াজ শোনা যায়। একটি দুটি করে বাতি জলে ওঠে ঘরে। আবার আসে সাদ্য চা-খাবার। রামনন্দন তখন পাচক ব্রাহ্মণকে রান্নাঘরে যোগান দিতে ব্যস্ত। গুনগুন করে শব্দ ওঠে পড়ুয়া ছেলেদের ঘর থেকে। খাওয়াদাওয়া মিটতে সেই যার নাম রাত এগাবটা। তখন ফুলেশ্বরীর নয়নের মণি নখন দুটি মুদ্রবার অবসর পায় (যদি না নাইট-শোর আকর্ষণে পড়া কোন বাবুর বাকি থাকে খাওয়া। তা থাকলে, তাকে জেগে থাকতে হয়। সুপারিন্টেন্ডেন্টের চোখ এড়িয়ে মধ্যরাতে তাকে খুলে দিতে হবে ছোট উইকেট গেটের তাল। একটি অতন্দ্র নিরঙ্কর ভৃত্যের সামনে মাথা নীচু করে উইকেট গেটের ফাঁক দিয়ে ভিতরে আসনে রাত্রিচর বাবু।)

জানি না, আপনাদের ছাত্রাবাসে রামনন্দনের জীবনযাত্রার ছবিটা ঠিকমত আঁকতে পেরেছি কিনা। আপনাদের ছাত্রাবাসের সঙ্গে না মিললেও আমি জানি আমার বর্ণনা সত্য, মহর্ষি নারদের উপদেশ অনুযায়ী রামনন্দনের এ কর্মস্থল অযোধ্যার চেয়েও সত্যি। এতেই কাজ হয়েছিল, আমার শ্রোতার সূর্য-আঁকা কালো-কাজল চোখ দুটিতে ভরে উঠেছিল স্বাতির মুক্তাবিন্দু! দুধের ঘটিটা তুলে নিয়ে চোখে আঁচল দিয়ে ফুলেশ্বরী খুশী হয়েই ফিরে গিয়েছিল ফুলওয়ানি গাঁয়ে।

রামনন্দনের একটা প্রশ্নের জবাব। ফুলওয়ানি গাঁয়েব ত্রিসীমানায় কোন বাঙালী মহিলা নেই যাব কাছে গিয়ে চিঠি লেখাতে পারে ফুলেশ্বরী। বরং কলকাতার মেসে অনেক ছাত্র আছে যার শরণাপন্ন হওয়াব সম্ভাবনা আছে রামনন্দনের। খামের উপর ভবিষ্যতে রামনন্দনের নাম না লিখতে হলে শুধু নিশ্চিন্ত নয়, খুশী হতাম। হাত—’

চিঠিখানা শেষ করে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল কুশানু। দুঃস্বপ্ন কোতূহল হয়েছিল জানতে, কে এই নারী। ওদের দু-কামবার নোনাধরা মেসবাড়ির সঙ্গে তার বর্ণিত ছাত্রাবাসের তিলমাত্র মিল নেই। রামনন্দনের কল্পিত জীবনযাত্রা আগাগোড়াই ভুল। লিপিকাবেব ধারণা এটা একটা প্রকাণ্ড ছাত্রাবাস। ধনীপুত্রদের একটা জ্বরদস্ত আস্তানা। কিন্তু কী নিখুঁত ছবি সে এঁকেছে এমন একটি ছাত্রাবাসের। কোন জ্বীলোকের কলমে কেমন

করে সম্ভব হয় একটি হস্টেলের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রায়ন ? সে ছাত্রাবাসের ছেলেরা কলেজ থেকে ফিরে ঘরের যে তালা খোলে সেগুলি টু-সীটেড ঘরের ডবল-লক্‌ নিয়মে আটকানো। সেখানে যে ছাত্র নাইট-শোর আকর্ষণে পড়ে তাকে ঢুকতে হয় উইকেট-গেটের ভিতর দিয়ে, মাথা নীচু করে। সেখানে রুদ্ধদ্বার কক্ষে যখন ক্লাস-পালানো ছেলের দল বসে তেতাশের আড্ডায় তখন ভৃত্যকে সরবরাহ করতে হয়, শুধু চা নয়, ডবল-হাফ চা! আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, চা-সিগ্রেটেই শেষ হয়নি ও অধ্যায়। বলা হয়েছে—ডাক পড়ে ভৃত্যব, টাকার ভাঙানি সরবরাহ করতে। মাঝে মাঝে রেজগির অভাবে তেতাশের আড্ডায় যে বিডম্বনার সৃষ্টি হয় একথা কোন জ্বীলোকের বর্ণনায় আসে কি করে ? অথচ জ্বীলোক না হলে ফুলেশ্বরীই বা কেমন করে লেখাতে যাবে চিঠি ?

তবে কি ওর অনুমানই সত্য ? ভদ্রমহিলা বিবাহিত ? স্বামী-স্ত্রী মিলে যুক্তি করে লেখে চিঠি—কৌতুক করতে ? হস্তাক্ষরটা মহিলার, কিন্তু তার পিছনে কি রয়েছে তাঁর স্বামীর ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা।

অ্যানালিটিক্যাল মন কুশানুর। ছেলেবয়সে গোয়েন্দা হওয়াই ছিল ওর জীবনের স্বপ্ন। সব জিনিস ও খুঁটিয়ে দেখে বিচার করে। মারু আর্থার কোনান ডয়েলের কম্বিট-ওয়াকস্-গেলা কুশানুর চিঠিখানা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসল। দীর্ঘ সমীক্ষণান্তে সিগাবেটটায় শেষ টান দিয়ে ও আপন মনেই বলল, মেয়েটি কুমারী, ধনীর ছললী, সম্ভবত ব্রাহ্মণ-কন্যা।

আপনি-আমি উপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতাম, কি করে বুঝলে ?

নির্জন ঘবে এই সঙ্গত প্রশ্নটা কেউ ওকে কবল না।

তবু সন্দেহবাতিক মনের পূর্বপক্ষকে জবাবদিহি করতে বসল কুশানুর। ব্যাখ্যা করে দেখাল ওর সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি।

কুশানুর লক্ষ্য করেছে গত চিঠিতে সে একটু অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়ে পড়েছিল। শেষের কবিতা আর শ্রামলী থেকে অনেক কিছু তুলে ধরেছিল। স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল অপরিচিতার প্রতি একটা অন্ধ অনুরাগের। এই চিঠিখানায় সে কথার কোন জবাব নেই। অচেনা প্রসঙ্গে ও এবার অদ্ভুতভাবে নীরব। কেন ? যদি ওরা স্বামী-স্ত্রী মিলে ওকে উত্তেজিত করে একটা মজা দেখার লোভেই এটা করত তাহলে ওর উচ্ছ্বাসের অগ্নিতে এই স্মরণে নিশ্চয়ই নতুন

সমিধা নিক্ষেপ করত ওয়া। তা কিন্তু করা হয়নি। সিপিকার ও বিষয়ে একেবারে নিশ্চুপ। বরং এর আগের চিঠিখানায় 'কैसे গোড়ায়বি হরি বিনে দিম রাতিয়া'র পূর্ববর্তী চরণটির আমেজ ছিল। যেন ওই চরণটিই সে লিখতে চায়, কিন্তু সরমে বাধে বলে পূর্বচরণের 'অধির বিজুলিয়া' আর 'ঘোর ঘামিনী'র বর্ণনায় মনের ইঙ্গিত জানিয়েই লজ্জাজড়িতচরণে থেমে গিয়েছিল ওর লেখনি। অথচ এবার ও পথের ত্রিসীমানায় সে যায় নি।

কুশানুর মনে হল তার একমাত্র কারণ এবার নলচের আডাল নেই। এবার ফুলেশ্বরীর বকলমে নয়, অপরিচিতা সরাসরি তাকেই সম্বোধন করেছে। তাই কিছুমাত্র প্রগল্ভতা করাও অসম্ভব হয়েছে তার পক্ষে। যদি ওরা ঘামী-দ্বী মিলে কোতুকের উদ্দেশ্যে লিখত তাহলে এ সঙ্কোচের কারণ থাকত না। বরং কুশানুর উচ্ছ্বাসপ্রবণতার সম্পূর্ণ সদ্যবহার করে হয়তো আরও এক ধাপ এগিয়ে যেত।

এ থেকেই বোঝা যায় এ চিঠি লেখা হয়েছে কোন কুমাবী হাতের কম্পনে। আর কি বলেছে সে? ধনীর ছলানী!

পোস্টাপিসে যে খাম পাওয়া যায়, সে খামে ও চিঠি লেখেনি। নীলচে লম্বাটে খামে পৃথক টিকিট এঁটেছে। চিঠির কাগজটাও দামী। ওর জীবন-যাত্রার মান কাজেই যথেষ্ট উন্নত। এ ছাড়াও ছাত্রাবাসের যে চিত্রটি সে এঁকেছে তাতে সর্বত্রই আর্থিক স্বচ্ছলতার আমেজ। ছাত্রজীবন নাইট-শো সিনেমা দেখা, ফ্লাস-খেলা, ডিম-টোস্ট-বিস্কিটের শ্রাদ্ধ করা ছাড়া অন্য রকমও যে হতে পারে এটা ওর ধারণা নেই। দিনে চারটে টিউশানি করে, কলের জলে নাস্তা সেরেও যে ছেলের দল সারস্বত উপাসনা করে তা ও জানে না। ও ধনীই কত।

শেষ কথা, ও বামুনের মেয়ে।

না, কুশানু নিজে ব্রাহ্মণ-সন্তান বলে এ কোন উইসফুল থিঙ্কিং নয়। এ অসুমানের পিছনেও যুক্তি আছে তার। রামনন্দনের জীবনযাত্রার বর্ণনায় তাকে সমস্তে হৈসেলের বাইরে রাখা হয়েছে। সে রান্নার যোগান দেয়, চম-টোস্ট সরবরাহ করে মাত্র। বডজোর জল, সুন লেবুর পরিবেশন-তার দেওয়া চলে তাকে। হৈসেলের বাকি কাজের দায়িত্ব সে গুস্ত করেছে পাচক ব্রাহ্মণের উপর।

এ থেকেই মনে হয় সে ব্রাহ্মণশীল ব্রাহ্মণ-পরিবারের মেয়ে।



সবটা মিলিয়ে তাহলে দাঁড়াল, ও হচ্ছে রক্ষণশীল ধর্মবান ব্রাহ্মণ-পরিবারের উচ্চশিক্ষিতা একটি অনুচা যুবতী !

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে কুশাহু। শূন্য ঘরে আপনমনেই টেঁচিয়ে ওঠে, ছুঁতোর, নিকুচি করেছে।

একথাও কাগজে বড় বড় করে লেখে—‘ফুলেশ্বরী, কে তোমার চিঠি লিখে দেন তাঁর পূর্ণ পরিচয় যদি এবার না জানাও তাহলে এর পর থেকে রামনন্দন অশ্রু লিপিকারেব কাছে যাবে চিঠি লেখাতে। ইতি রামনন্দনের পক্ষে কে. রায়।’

গোটা গোটা হরফে এই একটি মাত্র পংক্তি লিখে একটা খামে বন্দী করে নিজের হাতে ডাকবাঁকে ফেলে দিয়ে আসে কুশাহু, খামের উপরে ফুলেশ্বরীর নাম-ঠিকানা লিখে।

আজ রবিবার। ভবতারণবাবুর কাজে যাওয়ার তাড়া নেই—তুপুরে একবার যেতে হবে অবশ্য অফিসে। জরুরী একটা ইন্ভেস্টিগেশন রিপোর্ট এসে পৌঁছবার কথা আছে বারোটা নাগাদ। সকালবেলাতেই টিলে পায়জামা আর ড্রেসিং গাউনটা জড়িয়ে অর্ধশয়ান হয়ে খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাচ্ছিলেন তিনি। মনটা কিন্তু তাঁর ঠিক খবরের কাগজে নিবদ্ধ নেই। মনে মনে অনেক কথাই ভাবছেন। কথাটা কদিন থেকেই মনে হচ্ছে। আগামী বছরই এক্সটেনসন না পেলে তাঁকে অবসর নিতে হবে। তারপর অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধদের কর্মহীন গ্রানিকর জীবনের রেশ টেনে চলতে হবে বাকি জীবন। অর্থক্লান্ত হবার কথা নয়। সঞ্চয় যথেষ্ট করেছেন। পেনসন আর বাড়ি ভাড়া নিয়ে অনায়াসে কেটে যাওয়া উচিত অবশিষ্ট দিনগুলো। জীবনে কিন্তু স্মৃতি হতে পারেননি তিনি। সরমাকেও স্মৃতি করতে পারেননি। হয়তো স্মৃতি না হতে পারার উপাদান ছিল তাঁর রক্তের মধ্যেই। হয়তো এ প্রবৃত্তি তাঁর সহজাত নয়—যে উত্তেজনাময় জীবনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল তাঁকে, তাতে উত্তেজক কোন নেশার আশ্রয় না নিলে হয়তো জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতেন। মাত্রাতিরিক্ত উগ্র পানীয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ;—কিন্তু শুধু মদিয়ার নেশাতেই তৃপ্ত থাকতে পারেননি। সরমা প্রথম নেশাটাকে সহ্য করলেও দ্বিতীয়টাকে স্বীকার করে নিতে পারেনি। টেঁচামেচি, বাগড়াবাঁটি ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ। তিল তিল করে শুকিয়ে

গিয়েছে সরমা। অন্নজলের মত আনন্দও জীবনধারণের এক আবশ্যিক উপাদান। সেই আনন্দের প্রায়োপবেশনে আত্মাকে নিঃশেষ করেছিল সরমা—একদিন শেষ পর্যন্ত মুক্তি দিল সত্যিই ঘোষাল সাহেবকে—সরে গেল ওঁর জীবন থেকে।

সরমার জীবিতকালে যা অসম্ভব মনে হত, আশ্চর্য, তার আত্মদানের পর সেটা কত সহজ হয়ে গেল। বুকের একটা পাশ খালি হয়ে গেল যেন। এতদিন চেষ্টা করতে হত সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে—এখন, আঘোবনের সাথীটির এমন নীরব প্রস্থানে স্বভাববৈরাগ্যই স্তিমিত করে দিল ওঁর উদ্দাম কামনাকে। বুড়ো হয়ে গেলেন যেন কদিনেই, মেয়েদের মুখ চেয়ে বুক বাঁধলেন—কিন্তু মেয়েদের ভাগ্যকে বাঁধতে পারলেন না। ইভার বিবাহ দিলেন, ব্যর্থ হয়ে গেল সে মিলন। আইভির জন্ম তাঁর উৎকণ্ঠা আরও বেশী। মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই সে কেমন যেন বদলে গেছে। যেন তার নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না আর। সে ওঁর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের বাইরে সরে যাচ্ছে ক্রমে। জোর করে কাছে টানতে চেয়েছেন, ফল শুভ হয়নি। আইভির অন্তরে প্রবাহিত হচ্ছে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ তা ওঁর চৌম্বকবৃত্তির আওতায় শাস্ত হয়ে ওঠে-নি। ফ্লেমিংস্ লেফট হ্যাণ্ড-রুলের আইনে ওঁর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সঙ্গে ট্যানজেন্ট রচনা করে দুর্বার কেন্দ্রাতিগ গতিতে ছুটে বেরিয়ে গেছে আইভি। যেমন করে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে অস্বীকার করে ছুটে বেরিয়ে যায় মহাশূন্যের দিকে অধিবৃত্তের পথচারী ধুমকেতু।

আইভিকে বাঁধতে হবেই, এই সিদ্ধান্তে এসেছেন ক্রমে। না হলে মহাশূন্যের নেপথ্যে হাবিয়ে যাবে মেয়েটি। আজ সকালের ডাকে এ বিষয়ে একটি চিঠি পেয়েই চঞ্চল হয়ে আছে মনটা।

ইভা এসে দাঁড়ায়। তাব হাতে একটা প্লেটে কিছু মিছরি-দেওয়া ছানা আর ভিজে মুগ, আর এক গ্লাস ওভালটিন। সকালবেলা এগুলি তাঁর নিত্য-বরাদ্দ। স্নান সেরে এসেছে ইভা, ভবতারণবাবু জানেন, শুধু স্নান নয়, পূজাও সেরে এসেছে মেয়েটি। গোপন করবার চেষ্টা করলেও তাঁর অম্লসন্ধিৎসু গোয়েন্দা চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি ইভা। ভবতারণবাবু সংবাদ রাখেন অতি প্রত্যাষে স্নানান্তে রুদ্ধদ্বারকক্ষে ইভা ঘণ্টাখানেক পূজা-আর্চা করে। আপত্তি করেননি। মানুষ মাত্রেই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। ইভা লাইব্রেরী

করেছে, কুকুর পুষেছে, একগাঙ্গা পায়রা এনে রেখেছে ছাদের জালতি দেওয়া ঘরে, বাগানের দিকে দিয়েছে মনোযোগ, কিছুই নজর এড়ায়নি তাঁর। তাই সরমার মত একদিন পূজার ঘরেও যে ঢুকতে হবে ইভাকে এটা স্বতসিদ্ধের মতই জেনে রেখেছিলেন ঘোষালসাহেব।

খাবারের প্লেট আর ওভালটিনের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ইভা চলে যাচ্ছিল। তাকে ফিরে ডাকলেন। ইভা নীরবে এসে দাঁড়ায় ওঁর ইজিচেয়ারের পিছনে।

সামনে এসে এই চেয়ারটাতে বস, কথা আছে।

ইভা এসে বসে চেয়ারটায়, জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়।

কানপুর থেকে চৌধুরীসাহেব চিঠি দিয়েছেন। আইভিকে তিনি দেখতে চান।

ইভা একটু ইতস্ততঃ করে বলে, তুমি কি সত্যিই ওর বিয়ে দেবে বাবা?

সত্যি বিয়ে দেব না তো এতদূর অগ্রসর হলাম কেন রে? চৌধুরীসাহেব একেবারে বিলাতী-কেতার মানুষ। কানপুরে বিরাট ট্যানাবির মালিক। সবই পাবে ওঁর দুই ছেলে। ছেলেটি লেখাপড়াও শিখেছে। সব দিক থেকেই পাত্রটি বাঞ্ছনীয়। ওরা নাকি আমাদের চেয়েও উগ্র-সাহেব, আইভির সঙ্গে বেশ মিলবে।

না, আমি বলছিলাম আইভি এখনও একেবারে ছেলেমানুষ। ও আমার চেয়েও দু বছরের ছোট, তাহলে ওর বয়স হল—

বাধা দিয়ে ভবতাবণ বলেন, অত হিসাবের দরকার নেই, আইভির এখন যে বয়স সেই বয়সে তুই তোর মায়ের কোল থেকে নেমে হাঁটতে শিখছিস!

কিন্তু সে আজ দু যুগ আগেকার কথা বাবা।

তা হোক। আমি চাই অল্প বয়সেই আইভির বিয়ে দিতে। ওকে সংসারের মধ্যে বেঁধে ফেলতে। ওর মনের মধ্যে একটা ঘূর্ণি আছে। ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। অনেক কিছু আমার কানে আসে। আমি ঠিক সাহস পাই না। মায়ের স্বভাব পায়নি আইভি, সে বরং— তারপর অনেকক্ষণ কি ভেবে বলেন, আমার ছেলে নেই, তুই আমার ছেলে, তাই তোর সঙ্গেই আমাকে খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে। আমার মনে হয় আইভিকে যদি এখনই সংসারের মধ্যে বেঁধে ফেলা না যায় তাহলে ও বিপথে চলে যেতে পারে।

একটু চুপ করে থেকে বলেন, তুই জবাব দিলি না যে?



সকোচ ঝেড়ে ফেলে ইভা বলে, কিন্তু বিয়ে হলেই ওর মন বদলে যাবে, এটাই বা ধরে নিচ্ছ কেন ? এটা যদি ওর স্বভাবই হয় তাহলে বিয়ের পরেও তো স্বভাবটা না-ও বদলাতে পারে ?

ভবতারণবাবু জোর দিয়ে বলেন, না বদলাবার কোন কারণ নেই। অপরাধ-বিজ্ঞানে বলে মানুষের মনের সঞ্চিত উত্তাপ কোন পথে যদি বহিস্করণের পথ পায়, তাহলেই তার অপরাধ-স্পৃহা স্তিমিত হয়ে আসে। বিবাহ আইতির কাছে সেই সেফ্টি-ভ্যাল। ওর মন এখন নিরবলম্ব বলেই এমন পল্লবগ্রাহী। নিজের ঘর, নিজের স্বামী, নিজের সম্ভান পেলে ওর সেই ভাসমান মন নোঙর ফেলবে নিশ্চিত।

ইভা বলে, অপরাধ-বিজ্ঞান পদার্থ-রসায়নের মত এক্স্যাক্ট সায়েন্স নয়—ওর অনেকটাই অনুমানের উপর নির্ভর করে তৈরী করা।

ভবতারণবাবু একটু বিরক্ত হয়েই যেন বলেন, এ কথা কেন বলছিস ?

ইভা লক্ষ্য করে ওর বিরক্তি, মাথা নীচু কবে বলে, আমার খণ্ডনও হয়তো তোমার এই যুক্তির বশবর্তী হয়ে একটা ভুল কবেছিলেন একদিন।

স্তব্ধ হয়ে যান ভবতারণ ঘোষাল। মনে পড়ে যায় তাঁর। ই্যা, তাঁর বৈবাহিক একদিন স্বীকার কবেছিলেন এ কথা। থিয়েটার, শিকার আর খেলার মাঠ থেকে বারমুখী পুত্রকে ঘরমুখো করবার শুভ উদ্দেশ্য নিয়েই পুত্রবধূকে বরণ কবে তুলেছিলেন ঘবে। তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, বউ পেলে ছেলের মন ফিরবে, তা ফেরেনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে প্রবীণ ঘোষালসাহেবের। বলেন, তাহলে তুই কি করতে বলিস ?

আমি বলি বিয়ে তুমি দাও আইভি, এখনই দাও ; কিন্তু বডলোকেয় একমাত্র ছেলেও সঙ্গে নয়, মধ্যবিত্ত ঘরের হৃদয়বান কোন ছেলের সঙ্গে।

একটু চমকে ওঠেন ভবতারণবাবু, কেন ?

আইভির বিয়েতে তুমি খবচ কবেবেই। মধ্যবিত্ত কিংবা গবীঘ ঘরের কোন স্ত্রীপাত্রের সঙ্গে যদি বিয়ে দাও তবু খাওয়া-পরার কষ্ট হওয়াব কথা নয় ওর। খণ্ডনের সম্পত্তি না থাকলেও পৈতৃক উত্তরাধিকারে সচ্ছলভাবে সংসার চালাতে পারবে আইভি। তাছাড়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্ভান কিছু না কিছু রোজগার করবেই। এ রকম পরিবারেই ওর মন বদলাতে পারে।

অপর্যাপ্ত অর্থ যদি ওর হাতে থাকে তাহলে ওর চরিত্রের পরিবর্তন হওয়া কঠিন। অর্থই থাকবে, সংসারে হবে অনর্থ।

চমৎকৃত হয়ে যান ভবতারণ। কী চমৎকার বিশ্লেষণ করল ইভা। ওর প্রত্যেকটি কথা সূর্যোদয়ের মত সত্য। অপর্যাপ্ত অর্থ আইভির জীবনে শুধু অভিশাপই আনবে। পবিত্রিত অর্থোপার্জনের সীমিত চৌহদ্দিতে ওর মন সংযত হতে বাধ্য হবে। উচ্ছৃঙ্খলতা অর্থপ্রাচুর্যের অনিবার্য অঙ্গুচর!

অনেক পরে ভবতারণ বলেন, কৃশানু ছেলেটিকে তোর কেমন লাগে?

চোখ বুজে বুজেই প্রশ্নটা সিগাবের একটা রিঙের মতই বাতাসে ছেড়ে দিয়েছেন ভবতারণ। না হলে ওঁর সন্ধানী গোয়েন্দা-চোখে ধরা পড়ত নিশ্চয়ই এ প্রশ্নে ইভার প্রতিক্রিয়া। একটু সামলে নিয়ে ইভা বলে, এ কথা কেন?

তেমনি মুদিত নেত্রেই ভবতারণ বলেন, ওদের অধ্যাপক ভবেশ দত্তর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি ছেলেটি খুব ভালো। বাপ-মা নেই, বলতে গেলে তিন কুলে কেউই নেই। পড়াশুনায় একটি রত্ন, ফার্স্ট-ক্লাস পাবেই। কম্পিটিটিভ পবীক্ষা দেবার ইচ্ছা রাখে। এদিকে খুবই বিনয়ী, লাজুক, মিষ্ট স্বভাবের। আজকালকার ছেলেদের মত নয়। ভবেশ বলছিল ও নাকি সহপাঠিনী মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা পষন্ত বলতে পারে না।

অধ্যাপক ভবেশ দত্তের সার্টিফিকেট ছাড়াও এ কথা জানতে বাকি নেই ইভার, সে শুধু বলে, তুমি কি ওর সঙ্গে আইভির বিয়ের কথা ভাবছ?

এতদিন ভাবিনি। আজ তুই মধ্যবিত্ত ঘরের সচ্চরিত্র ছেলের কথা বললি কি না, তাই মনে হল।

কিন্তু ওর তো কোন রোজগার নেই?

এখন নেই, দুদিন পরে হবে। যাতে হয় সে ব্যবস্থা আমিই করতে পারি। হয়তো তার প্রয়োজন হবে না। ভাইভোভাসিতে না আটকালে সে নিজেই কোন কম্পিটিটিভ সার্ভিসে নিলেকসন পাবে। তাছাড়া ভেবে দেখ, যেহেতু ওর ত্রিফুলে কেউ নেই, তাই হয়তো ও আমার এখানেই এসে থাকবে, বুড়ো বয়সে সেটাও আমার মস্ত বড় অবলম্বন।

ইভা জবাব দিতে পারে না। কৃশানু এসে এই বাড়িতে থাকবে? আইভির সঙ্গে বিয়ে হবে তার। কিন্তু উচ্ছল-প্রকৃতির আইভি কি পারবে ওই ভাবুক-

লাজুক শিল্পী মানুষটির মনকে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলতে ? যদি না পারে ?  
যদি পল্লবগ্রাহী আইভি সন্ধান না পায় ওর মনের গভীরতম অন্ধকারে লুকানো  
মনিমুক্তার ? যদি সেই অতৃপ্ত ক্ষুধার্ত মানুষটা কোন নির্জন রাত্রে আবছা  
আলোয় এসে দাঁড়ায় ইভার সামনে, যদি দাবী করে তার তৃষ্ণার পানীয়, তাকায়  
সেদিন সন্ধ্যার মত অদ্ভুত দৃষ্টিতে ? তখন পারবে কি ইভা ছুটে পালিয়ে  
যেতে ? আর পালাবে কোথায়, কুশানু যে তখন এ বাড়ির বাসিন্দা ।

জবাব দিলি না যে ?

ইভা কোনক্রমে বলে, ঘরজামাই ?

না, ঘরজামাই কেন ? সাপোস, হি টেকস ওয়ান অফ মাই ফ্র্যাটস্ ।  
পাশাপাশি বাড়িতে থাকবে । তার আত্মমর্খাদায় যদি লাগে ভাড়াও নেব  
আমি । আমার তো ছেলে নেই, রিটায়ার্ড লাইফে জামাইদের উপরেই  
খানিকটা নির্ভর করতে হবে ।

ইভার মনে পড়ে, বড় জামাইয়ের উপরে ভরসা করতে পারছেন না বলেই  
এমন একটা ব্যবস্থার কথা ভাবছেন ভবতারণবাবু ।

আবার কিছুটা চুপচাপ ।

নীরবতা ভেঙে ভবতারণবাবুই আবার বলেন, তুই আমার প্রথম প্রশ্নটার  
জবাব এড়িয়ে গিয়েছিলি ।

কোন্ প্রশ্ন বাবা ?

কুশানুকে তোর কেমন লাগে ?

হঠাৎ ওভালটিনের গ্লাসটার দিকে নজর পড়ে ইভার । বলে, ওই যাঃ !  
ওভালটিনটা তুমি এখনও খাও নি ? জুড়িয়ে জল হয়ে গেল বোধ  
হয় ।

গ্লাসটা তুলে দেয় বাপের হাতে । তাতে চুমুক দিয়ে ভবতারণ বলেন,  
ভাইভারসন্স ফর এ সেকেন্ড টাইম ! সো যু ডিস্‌আপ্রভ ।

কি ?

পাত্রহিসাবে কুশানুকে । প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার এড়িয়ে গেলি কিনা !

ইভা লক্ষ্য করে এবার পূর্ণদৃষ্টিতে ঘোষালসাহেব তাকিয়ে আছেন তার  
দিকে । সন্ধানী গোয়েন্দা বাপের এ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে সে চেনে । পাছে ওর  
মনের কোন অজ্ঞাত রহস্যকে টেনে বার করে আনেন তাই তাড়াতাড়ি জোর  
দিয়ে বলে ওঠে, না না, ডিস্‌আপ্রভ করব কেন ? কুশানুবাবু তো চমৎকার



লোক। আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। অনেক কথাও হয়েছে নানা বিষয়ে।  
আমার তো খুব ভালই লাগে ওঁকে—

আরও কিছু হয়তো এক নাগাড়ে বলে যেত সে, কিন্তু বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। বর্মা চুরুটটা ধরা আছে দাঁতে, এক হাতে দেশলাই, অপর হাতে কাঠি, তীব্র অভিনিবেশের সঙ্গে তাকিয়ে আছেন ভবতারণবাবু, শুনছেন কুশান্নুর পক্ষে ইভার সওয়াল।

ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠেছে ইভা। মাঝখানেই থেমে যায় সে।

বর্মা চুরুটটা নিপুণভাবে ধরিয়ে ধীরেস্থস্থে ভবতারণবাবু বলেন, কুশান্নুর সঙ্গে তোর কি ধরনের আলাপ হয়েছে?

প্রশ্নটার তাৎপর্য বুঝতে পারে না ইভা। বাপের সঙ্কানী দৃষ্টিকে সে ভয় করে। উনি কি কিছু বুঝতে পেরেছেন, সন্দেহ করছেন কি কিছু? সে প্রতিপ্রশ্ন করে একটা, কি ধরনের আলাপ মানে?

আই মীন ইস হি এ মিয়ান অ্যাকোয়েন্টেন্স অফ ইয়োস, অর এ ফ্রেণ্ড অলরেডি?

জবাবটা কি ভাবে দেওয়া যায় বুঝে উঠতে পারে না, তাই বলে, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ বাবা?

না, তুই বলছিলি না যে ওর সঙ্গে অনেক আলাপ হয়েছে তোর, তাই ভাবছিলাম তোর পক্ষে প্রশ্নটা উত্থাপন করা চলে কি না, আই মীন, কুশান্নু এখন বিয়ে করতে ইচ্ছুক কি না।

সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করে তোমাকে জানাতে পারি।

না, এখন নয়। তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। আগে এই চৌধুরী-সাহেবের ব্যাপারটা মিটুক। ভদ্রলোক কানপুর থেকে এতদূর আসছেন, মেয়ে তাঁকে দেখাতেই হবে। তারপর ও কথা।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ইলাকে পড়াতে এসে কুশান্নু দেখল ইভা আগে থেকেই বসে আছে লাইব্রেরী ঘরে। একরাশ নতুন বই এসেছে। সেগুলোতে ব্রাউন কাগজের মোড়ক লাগিয়ে নম্বর দিয়ে খাতায় লিখে আলমারীতে তুলছে।

কুশান্নু আজকাল অনেক সহজ হয়ে গেছে। ইভাকে অনায়াসে সে বলতে পারে, একা হাতে আপনার অস্থবিধা হলে আমরাও সাহায্য করতে পারি—না কি বল ইলা?

বইয়ের মলাট লাগাতে লাগাতে আড়চোখে ইভা একবার চেয়ে দেখে। মধুর হেসে বলে, সেদিন বলেছিলাম, মনে আছে ইলু, ছুটি তিনরকমের? আজ তার উদাহরণ দিচ্ছি। এটাকেই বলে ফ্রেঞ্চ-লীভ!

ইলা বলে আমার তো স্কুলের ছুটি বাপু এখন। টাস্কও আমার সব হয়ে গেছে। আসুন মাস্টার মশাই, আমরা সবাই মিলে মলাট দিই।

কুশানুব তাতে আপত্তি নেই। সেও বসে যায়। তিনজনে হাতে হাতে মলাট দিতে থাকে। মিলিঙ ফ্যানের একটানা একটা কটকটে আওয়াজ। অদূরে কোন বাড়িতে রেডিওতে বাজছে ছায়ানটে সেতার। কুশানুব আত্ম-বিশ্বাস অনেকটা বেড়ে গেছে। লক্ষ্য করে দেখে, ইভা আজ কিছুটা বেশীই প্রসাদন করেছে। গয়নাগাঁটি নেই, হালকা সাজ, তবু তাব মব্যে থেকেই বৈশিষ্ট্যের একটা সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে। ময়ূরকণ্ঠি রঙের একটা মাইশোব সিল্ক পরেছে যুবিয়ে। বাড়ির বাইরে গেলেই সচরাচর এ জাতীয় পোশাকী শাড়ি ভাঙে মেয়েবা, না কি বডলোকের মেয়েবা বাড়িতেও পরে এ ধরনের শাড়ি? কি ডানি, কুশানুব ঠিক ধারণা নেই। রজনীগন্ধাব ডাঁটার মত মসৃণ গ্রীবায় লেগে আছে হালকা পাউডারের ছোঁওয়া। অদ্ভুত মুহূ একটা সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে ওর সর্বাবয়ব থেকে। কোন দামী সেক্ট?

ইলা হঠাৎ বলে ওঠে, মেজদিটা যদি এসময় থাকত তো বেশ মজা হত। ওদেব আবার গ্রীষ্মের ছুটি নেই।

কুশানুব মুখ তুলে বলে, গ্রীষ্মের ছুটি নেই? কেন?

বাবে। ওদেব হস্টেল যে দাজিলিঙে। সেখানে গরমের দিনে আবার কষ্ট কি? ওদের একমাসের ছুটিটাই বড।

ও। কুশানুব ছেদ টানে এ প্রশঙ্গের।

কিন্তু ইভা এখনও এ প্রশঙ্গের জের টেনে বলতে চায়, বলে, মাস্টার মশাই যেন খুব হতাশ হলেন, মনে হচ্ছে?

কুশানুব অবাক হয়ে বলে, কেন, আমি হতাশ হব কোন্‌ হুখে?

ইলুব মত আপনিও হয়তো ভাবছেন এ সময়ে আইভি থাকলে বেশ মজা হত। দুঃখ মানুষের কত কারণে হতে পারে।

তাকে আমি চিনিই না। অমন অদ্ভুত কথা ভাবতে যাব কেন আমি?

ঠিক এই সময় এসে হাজির হল কেউ বেয়ারা। পর্দাটা উচু করে ধরে বললে, ছোড়দিমনি, তোমার টেলিফোন এসেছে।

ইলুর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই এ আড্ডা ছেড়ে ওঠার। বডদির হাত দুটি ধরে বলে, ঠিক মাসীমা, তুমি দেখ না বডদি।

ইভা ছোট্ট একটা ধমক দেয়, ছিঃ! ইলু, তোমাকে ডাকছেন, তুমি যাও, শুনে এস কি বলছেন।

অগত্যা ইলাকেই যেতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে কুশানুও উঠে পড়ে, আমিও চলি।

সে কি? কেন? কাজ আছে নাকি কোনও? বিস্মিত ইভার প্রশ্ন।

না, কাজ নেই কোন। মানে—

তাহলে বসুন।

কুশানু ইতস্ততঃ করে।

ইভা হেসে বলে, একলা পেলেনই আপনাকে কামড়ে দেব, একথা মনে করেন কেন আপনি?

গরমেই বোধ হয়, একেবারে ঘেমে উঠেছে কুশানু। বসে পড়ে অগত্যা। মাথা নীচু করে ব্রাউন কাগজ কাটতে থাকে কাঁচি দিয়ে। নীরবতা ভেঙে ইভাই প্রশ্ন কবে আবার, আপনার কোন বান্ধবী নেই, না?

শুধু বান্ধবী নয়, বন্ধুও নেই কোন আমার।

সে কি? কেন?

কেউ আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে নি বলেই বোধ হয়।

আপনিও নিশ্চয়ই নিজেকে থেকে কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেননি?

তা ঠিক। আমার চরিত্রে কতকগুলো দুর্বলতা আছে। তাই বোধ হয় কারও সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয় না। আমি ঠিক, মানে মিশুকে নই।

হেসে ইভা বলে, এটা খুব প্রশংসনীয় গুণ নয় নিশ্চয়ই। তা সেটার হাত থেকে বক্ষা পেতে হলে দু-একজনের সঙ্গে জোর করে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করাই তো উচিত।

তা উচিত, কিন্তু তেমন লোক আর পাচ্ছি কোথায় বলুন?

ইভা একটু চুপ করে থাকে। কিন্তু আর কিছু বলে না কুশানু। একটা নিঃশ্বাস পড়ে ইভার। বোঝে ও প্রশংসনীয় জেব টেনে আর কিছু বলা বেহায়ার মত শোনাবে। তাই নতুন পথে শুধু করে আলাপ, সেদিন আপনি বলছিলেন অনেকগুলি টিউশনি করতে হয় আপনাকে। সবসুদ্ধ কতজনকে পড়ান?



সকালে দুজন, আর সন্ধ্যায় একঘণ্টা এখানে।

তাহলে নিজের পড়া করেন কখন ?

খাওয়া-দাওয়ার পর রাতে।

সকালের টিউশানি দুটো ছেড়ে দিতে পারেন না ?

একটু হেসে কুশানু বলে, আমার মেস খরচ আর পড়ানোর জন্য অন্য কোথা থেকেও আমি সাহায্য পাই না।

আবার কিছুটা নীরবতা।

ইভাই আবার বলে, আপনাকে একটা কথা বলব ?

বলুন।

সকালের ছাত্র দুটিকে পড়াতে কত পান আপনি ?

ত্রিশ টাকা।

আপনি তাহলে ও দুটো ছেড়ে দিন।

কুশানু কথাটার যৌক্তিকতা বুঝতে না পেরে ওর দিকে তাকায়। এবার ইভাই নত করে দৃষ্টি, বলে, বি.এ.টা দেব ভাবছি প্রাইভেটে। সন্ধ্যাবেলা ইন্সুর সঙ্গে আমাকেও যদি একটু দেখে দেন। আমার কন্সিনেশন ছিল সংস্কৃত সিভিক্স আর লজিক। এবার নেব ফিলজফি আর ইকনমিক্স। পারব না প্রাইভেটে পাস করতে ?

কুশানু হেসে বলে, না, পারবেন না।

ইভা চটে উঠে বলে, কি করে জানলেন ?

আমি জানি।

ছাই জানেন।—ঠোট উল্টে বলে ইভা। আপনার মত আমার মাথায় তো গোবর পোরা নয়—রীতিমত সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করেছিলাম, আপনার মত নাইস্ হইনি !

কুশানু একটু অবাক হয়। সে আই. এ. তে বিশ্ববিদ্যালয়ে নবম স্থান অধিকার করেছিল তিন বছর আগে। ইভার জানার কথা নয়। নিশ্চয়ই কোতূহলী ইভা খোঁজ নিয়ে জেনেছে খবরটা। খুশীও হয় একটু, বলে, সে জন্য বলছি না, সেকেণ্ড যে নাইস্‌য়ের চেয়ে ভাল সেটুকু আমিও বুঝি। আপনি পাস করতে পারবেন না অন্য কারণে।

কি কারণ শুনি ?

কারণ পাস করার ইচ্ছাই নেই আপনার। আপনি চাইছেন এই উপলক্ষ্য

করে একজন দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য করতে, স্তব্ধতা পাম আপনি কিছুতেই করতে পারবেন না। মিছামিছি বদনাম হবে আমার।

ইভা চটে উঠে বলে, অত মনস্তত্ত্ব বিচার আপনার না করলেও চলবে। বলুন, নেবেন আপনি এ ভার ?

উত্তর দিতে একটু দেরী হয় কুশানুর। একটা চটুল রসিকতা করবার জন্ত দুঃস্বপ্ন লোভ হচ্ছিল তার। ‘নেবেন আপনি এ ভার’ কথাটা বিকৃত অর্থ গ্রহণ করে, বিশ্বয়ের একটা অভিব্যক্তি প্রকাশ করে ওর বলতে ইচ্ছে করছিল আপনার ভার ? ইভা নিশ্চয়ই লজ্জা পেত তাহলে ! কি বলত সে ? কিন্তু কিছুতেই সাহস সংগ্রহ করে উঠতে পারে না।

ইভা কিন্তু গম্ভীর হয়ে ওঠে, বলে, কি হল, বললেন না ?

কুশানু মন স্থির করেছে এইমাত্র যে চটুল রসিকতা করবার লোভ হয়েছিল সেই মনোবৃত্তিই ওকে সাবধান করে দিল যেন। ওর মনে হল নিজের উপর যথেষ্ট সংযম নেই ওর, ওর মনের টাইরডের নাটগুলো টিলা। এ লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করলে ভবিষ্যতে হয়তো লজ্জা রাখার স্থান থাকবে না। তাই সেও গম্ভীর হয়ে বলে, না।

কয়েকটা মুহূর্তের নৈশব্দ। শুধু বিস্মিত নয়, একটু আহত হয়েই ইভা বলে, কিন্তু কেন বলুন তো ?

কুশানু উঠে পড়ে বলে, কারণটাও বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি, যে কারণে আপনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সত্ত্বেও আপনার বন্ধুত্ব গ্রহণ করতে পারলাম না সেই কারণেই আপনার এ দান প্রত্যাখ্যান করতে হল আমাকে। আমাকে আপনি মাফ করবেন।

ইভাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল কুশানু ঘর ছেড়ে।

নীল রঙের যে খামটা এবার এল পাটনা ডাকঘরের ছাপ কপালে এঁটে তার উপর রামনন্দনের নাম লেখা ছিল না, লেখা ছিল গোটা গোটা অক্ষরে শ্রীকে. রায়।

চিঠিখানা নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করল কুশানু। খুলতে ইচ্ছা করছিল না। মনে হচ্ছিল এর ভিতরে নিশ্চয়ই আছে এবার মেয়েটির পরিচয়, নাম, ধাম। ওর মনে হচ্ছিল নামটা জানলেই বুঝি ছিন্ন হয়ে যাবে রহস্য-

যবনিকা। ধূপছায়া রঙের শাড়িপরা পাখীর পালকের মত হালকা স্বপ্নালু যে মেয়েটিকে ও তিল তিল করে সৃজন করেছে মনে মনে, তার সঙ্গে যদি নামটা ঠিক খাপ না খায়? যদি নামটা শোনামাত্রই অস্তর্হিত হতে শুরু করে ঐ ধূপছায়া রঙের শাড়িখানা। কিসে যে কি হয় তা ও জানে না, যেমন জানে না কিসে কি হতে পারে। এই একটি মেয়ের কথা সে ভেবেছে অনেকবার—এমন কি স্বপ্নও দেখেছে, কিন্তু না জাগর-চিন্তা, না নিদ্রার-স্বপ্ন, কখনও ওর মন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেনি। অপরিচিতাই ওব একমাত্র পরিচিত নারী যাকে নিবাবরণ করতে পারি নি অস্তরবাসী দুঃশাসনটা। তার শ্রীলতাহানি কিছুতেই বরদাস্ত কববে না কুশাম্বু।

শেষ পযন্ত দূরন্ত কোতূহলেরই জয় হল কিন্তু, খুলে ফেললে খামটা—

‘শ্রীতিনিলায়েষু, আপনি যে শেষ পযন্ত আমাকে এভাবে বিপদে ফেলতে পারেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। গতবারেব দীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী চিঠিখানাতে যে বিডম্বনার সম্মুখীন হয়েছিলাম, বর্তমান বিপদের তুলনায় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এবার যখন ফুলেশ্বরী আঁচলের আড়ালে খোলা খামটা লুকিয়ে এনে হাজির হল আমার দরবারে, তখন তার চোখমুখ দেখে চমকে উঠেছিলাম আমি। ভেবে পাইনি চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও এত কারা কেন কেঁদেছে ও। খামের ভিতর থেকে যখন বের হল এক চিলতে কাগজে একটি মাত্র লাইনের চিঠি তখন বুঝতে পারলাম সমস্যাটা, একটি মাত্র বাক্যে কি বলতে চায় প্রবাসী রামনন্দন তাব প্রোষিতভতৃকা স্বীকে? এমন কি কথা হতে পারে? অশিক্ষিত হলেও মূর্খ নয় ফুলেশ্বরী, অর্থনৈতির মোটা মোটা বই সে পড়ে নি, তবু এটুকু বোঝে যে এক ছত্রের চিঠি খামের বদলে পোস্টকার্ডে লিখলে দশটা নয় পয়সা বাঁচে। তার সে প্রশ্নভরা ব্যাকুল দৃষ্টির সামনে হতভম্ব হয়ে পড়লাম। ওব মুক প্রশ্নের উত্তর আমার মুখে জোগালো না। বাধ্য হয়ে যা মুখে এল তাই বললাম, রামনন্দন লিখেছে যে দু-একদিনের মধ্যেই সে এখানে আসছে, তাই আর কিছু লিখল না।

মুখটা উজ্জল হয়ে ওঠে ওব। সামলে নিয়ে বলে, ওকরাকে কহ্ দিহ কি ফিন্ লেফাফামে চিট্ঠিয়্যা না ভেজে।

দোহাই আপনাব, দিন দশেকের ছুটি দিয়ে রামনন্দনকে দেশে পাঠান, আমার মুখ রক্ষা করুন। এ অমুরোধ করার আরও একটি গুরুতর কারণ আছে। ফুলেশ্বরীর সংসারে দ্বিতীয় প্রাণী নেই—ওর বৃদ্ধা পিসিমার উপর



ভরসা করা যায় না। গতকাল ওকে পরীক্ষা করে দেখেই—মনে হয় দিন তিন-চারকের মধ্যেই ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়বে। তখন ওর স্বামীর উপস্থিতির প্রয়োজন। ফুলওয়ারি গ্রাম থেকে আমাদের বাড়ি পাকা চার মাইল রাস্তা। এবকম অ্যাডভান্সড অবস্থায় ওর পক্ষে দৈনিক আট মাইল হাঁটাও অত্যন্ত বিপদজনক। ওরা বলেই পারে—কিন্তু সেটা উচিত নয়। সম্ভবতঃ রামনন্দনের হাতে মাসেব এ শেষ সপ্তাহে গাড়ি ভাড়ার টাকাও নেই। সেক্ষেত্রে ওকে কিছু টাকা দেবেন। ভয় নেই, টাকাটা আপনার মার যাবে না, আমি জামিন থাকলাম। ও হ্যাঁ, আমার নামই তো আপনি জানেন না, গর-ঠিকানার জামিনদারের আবার দাম কি? তাই আমার নাম ও ঠিকানা পত্রশেষে জানালাম। যার কাছে অধমর্গ থাকলাম তার পুরো নামটা জানবার অধিকারও আমার আছে নিশ্চয়ই।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ—

স্বাহা মিত্র।’

স্বাহা মিত্র।

মিত্র? অর্থাৎ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণকণ্ঠা সে নয়? ওর ডিডাকসন্ সব ভুল? বাকিগুলোব সেই রকম ভুল নাকি? অনূঢ় আর ধনীকণ্ঠা?

কিন্তু মিত্র পদবীটা অদ্ভুত ‘স্মার্ট’ করেছে ওকে। কুশাম্বুর সঙ্গে ওর সম্পর্কটাই যেন ঘোষণা করেছে পদবীটা। আব নামটা? আশ্চর্য, এ কী দৈবের নির্দেশ।

একটা জিনিস কিন্তু বোঝা গেল না। এবা। একটা লেটার-হেড কাগজে চিঠি লিখেছেন স্বাহা দেবী। কাগজের মাথায় লেখা আছে ‘ডাঃ অপরেণ মিত্র, এম বি বি এস।’ অনুমান করা কঠিন নয়, ইনি স্বাহা দেবীর অভিভাবক। বাবা হতে পাবেন, দাদাও হতে পারেন। আর হ্যাঁ, ওর ‘ডিডাকসন্’ ধূলিসাৎ করে পরমারাধ্য পতিদেবতাও হতে পারেন। অথচ স্বাহা লিখেছেন ফুলেশ্বরীকে পরীক্ষা কবে তিনি বুঝেছেন যে আর দু-চার দিনের মধ্যেই সে মা হতে চলেছে। তাহলে স্বাহা দেবীও কি ডাক্তার? কিন্তু সে ক্ষেত্রে তিনি অপরের লেটার হেডে চিঠি লিখবেন কেন? মহিলা ডাক্তারের নিজস্ব লেটার-হেড প্যাড থাকা উচিত। তবে কি উনি নার্স? নার্স অথবা ডাক্তার হলে কুশাম্বুর চাইতে বয়সে বড় হবেন নিশ্চয়ই। ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল কুশাম্বুর। কোন

অবিবাহিত মেয়েও ওর চাইতে বয়সে বড় এটা ভাবতেই কেমন খারাপ লাগে। কিন্তু অবিবাহিতই বা ভাবছে কোন্ স্ত্রে!

ওর রোমান্সটা কেমন যেন চুপসে গেল। কী দরকার ছিল ওর কুলেখরীকে পরীক্ষা করার ফলাফলটা একজন প্রোটা লেডী ডাক্তারের মত জানাবার? প্রোটা না হয় নাই হল, অন্ততঃ বছর ছয়েক আগে আই. এস-সি. পাস করেছে সে, ডাক্তার হতে হলে? চোপসানো বেলুন হাতে করে যেমন বিহ্বল হয়ে বসে থাকে বাচ্চা ছেলেরা—তেমনি করেই চিঠিখানা নিয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর মনে হল—যাই হোক শেষ পর্যন্ত দেখতেই হবে তাকে। জবাব একটি লিখে ফেলল মরিয়া হয়ে। নিজের মোটামুটি পরিচয় জানাল—শুধু নিজের পুরো নামটা আর লিখল না। নামের প্রসঙ্গে লিখল ‘আমার পুরো নামটা আর জানানো সম্ভব নয়। প্রথমবারে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললে কোন বাধা ছিল না, কিন্তু এখন কেমন যেন একটা সঙ্কোচ বোধ করছি। মনে হচ্ছে, আমার কথাটা আপনি বিশ্বাস করবেন না। ভাববেন, বানিয়ে বলছি। ‘কে রায়’ একটা মানুষের সংজ্ঞা হিসাবে যথেষ্ট আশা করি।’

আজ নিয়ে চারদিন। কুশানু আসছে; ইলাকে পড়াচ্ছে, পড়া দিচ্ছে, পড়া নিচ্ছে, যথারীতি জলখাবার খেয়েও চলে যাচ্ছে। সেগুলি আসছে কেটে বেরারার মারফত। এর মধ্যে একদিনও আসেনি ইভা নীচের ঘরে। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে কুশানুর। কিন্তু এতে তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এটাই তো স্বাভাবিক। সে ইলাকেই পড়াতে আসে, ইভার তো দৈনিক হাজিরা দেবার কোন কারণ নেই। সেটাই বরং অস্বাভাবিক। অথচ এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা নিত্য ঘটতে থাকায় সেটাই কেমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

মনে মনে হাসে কুশানু। অভিমান! সেদিন পর পর দুটো আঘাত সে হেনেছিল ইভার উপর। তার বন্ধুত্ব স্বীকার করে নেয়নি, আর প্রত্যাখ্যান করেছিল তাকে বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করায়। অভিমান করতে পারে বইকি ইভা।

কিন্তু অভিমান করবারই বা কি আছে এতে? অভিমান অমুরাগের অঙ্গ। ছোট বোনের বেতনভুক মাস্টার মশায়ের উপর ধনীর ছলানীর আবার অভিমান কিসের?

সে যাই হোক অন্তায় কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে কুশান্নুর তরফে। তাই পরপর চারদিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাতটার মধ্যে লাইব্রেরী ঘরে কোন বই বদলাবার প্রয়োজন হচ্ছে না এ বাড়ির বড়দিদিমণির। ইভার বন্ধুত্ব স্বীকার করতে সে ঠিক সাহস পায়নি। ভয় হয়েছে, কি জানি কোন নির্জন অবকাশে যদি দৃষ্টিপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় লীন হয়ে যায় ওর লজ্জাবরণ—আত্মবিশ্বত কুশান্নু যদি বিসদৃশ কিছু করে বসে! মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে সে কেমন যেন একটা অস্বোয়াস্তি বোধ করে। ইভার সহৃদয় ব্যবহারে নিঃসন্দেহে সে মুগ্ধ হয়েছে, আন্তরিকতায় উৎফুল্ল হয়েছে, তার প্রতি সহানুভূতি জেগেছে, প্রীতির একটা সম্পর্ক স্বীকার করতে পারলেই যেন স্বস্তি পায় বেচারি।

গতকাল সে খাবার খায়নি। থিদেয় পেটে ইঁদুরে ডন মারছে, তবু বলেছিল, আজ আর খাব না, ওটা নিয়ে যাও কেঁটে।

কেঁটে নীরবে খাবারের থালাটা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

তবু নেমে আসেনি ইভা। খোঁজ নিতে আসেনি কেন তার এ প্রায়োপ-বেশনের আয়োজন। রাগ হয়েছিল কুশান্নুব। এ জানলে সে কখনই ফেরত দিত না খাবারের থালাটা। তাই আজ আর আত্মসংবরণ করতে পারে না—ইলাকে বলে, তোমার বড়দির কাছ থেকে আলমারীর চাবিটা নিয়ে এস তো ইলু। বাসিনের মর্ডান পেইন্টার্সটা একবার দেখতে হবে।

ইলু মাথা নীচু করে উপরে উঠে যায়। অল্প পরে ফিরে আসে চাবির খোঁকাটা নিয়ে। আর চুপ করে থাকা সম্ভব হয় না, বলে, তোমার বড়দিকে দেখছি না আজ কদিন?

ইলা অন্ধের খাতাটার উপর একেবারে ঝুঁকে পড়ে। অশ্রুটে বলে, বড়দি নেই।

নেই! চমকে ওঠে কুশান্নু, কারণ সেই মুহূর্তেই টপটপ করে ঝরে পড়ে দুফোঁটা চোখের জল জি. সি. এম.-এর ব্রাকেটের উপর।

এ কী, তুমি কাঁদছ ইলু?

এরপর আর বাঁধন মানে না ইলার উচ্ছ্বসিত কান্নার বন্যা। ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে দুহাতে মুখ ঢেকে। কুশান্নু ওর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে, ছিঃ, কাঁদে না। কি হয়েছে? কোথায় গেছে তোমার বড়দি?

শ্রীরামপুরে।

শ্রীরামপুরে? সেখানে কে থাকেন?



শ্রীরামপুরে বড়দির শস্তরবাড়ি ।

একটু অবাক হয় কুশাহু । সে শুনেছে বিয়ের পর সেই যে রাগারাগি করে চলে এসেছিল ইভা, তারপর আর এতদিন ওমুখো হয়নি । আজ হঠাৎ এতদিন পরে সে আবার শস্তরবাড়ি গেল কেন ?

ইলা একটু সামলে নিয়ে বলে, বড়দিকে কি আর ওরা আসতে দেবে না মাস্টার মশাই ?

আসতে দেবে না কেন ? নিশ্চয় দেবে । দিদি শস্তরবাড়ি গেলে বুঝি কাঁদতে হয় ! বোকা মেয়ে !

ইলা একটু ইতস্ততঃ করে—যেন কথাটা মাস্টার মশাইকে বলা উচিত হবে কিনা স্থির করে উঠতে পারে না । তারপর চুপি চুপি বলে, ওরা যে বড়দিকে মারে !

কথাটা না শোনা থাকলেও আন্দাজ করতে পারে কুশাহু ; তবু অস্বীকার করে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে, দূর পাগল মেয়ে ! বাজে কথা ! তা হলে বড়দি কখনও যেত ওখানে ?

ইলা আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বাধা পড়ল । ঘরে এলেন ভবতারণবাবু । এ সময়ে তিনি এঘরে আসেন না কখনও, অন্ততঃ ইতিপূর্বে কখনও আসেননি । কুশাহু সসম্মানে উঠে দাঁড়ায় ।

ভবতারণবাবু বলেন, আপনার ছাত্রীকে আজ একটু সকাল সকাল ছুটি দেবার একটা আর্জি আছে মাস্টার মশাই । একটা ডান্স ড্রামা দেখতে যাবার নিমন্ত্রণ আছে, ইফ্‌য় কাইওলি পারমিট, আপনার ছাত্রীটিকেও নিয়ে যেতাম ।

এ কোন ব্যঙ্গ নয়, এই ধরনের মাহুষ ভবতারণ । এ মুহূর্তে তিনি ইলার বাপ নন, দোদাঁস্ত প্রতাপ পুলিশ অফিসার নন—একটি আবেদনকারীর মূর্ত প্রতীক ।

শশব্যস্ত কুশাহু বলে, নিশ্চয় নিশ্চয়, অল ওয়ার্ক অ্যাণ্ড নো প্লে এতো হতেই পারে না । আজ তোমার ছুটি ইলা ।

তুমি তা হলে তৈরি হয়ে নাও ইলু । সাতটায় শো—লুক মার্প ! আর নবীনকে গাড়িটা বার করতে বলে দাও ।

ইলা ধীর পদে চলে যায় । বাবা কখনও কোথাও বেড়াতে নিয়ে যান না ; এ অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে সে একটু অবাক হয়েছিল । অন্য সময়ে হলে উচ্ছৃঙ্খিত

হয়ে উঠত। কিন্তু মনটা ভারাক্রান্ত থাকায় একেবারে খুশীমাল হয়ে উঠবার অবকাশ পায় না।

ইলা চলে গেলে ঘোষালসাহেব একটা সোফায় বসে পড়েন, বর্মা চুরুটটায় আগুন ধরাতে ধবাতে প্রশ্ন করেন, প্রিপারেশন কেমন হচ্ছে?

প্রশ্নটা খুবই সঙ্গত। প্রাইভেট টুইশানিতে অভ্যস্ত কুশানু জানে অভিভাবকদের এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিতে হয়। তবে নাকি ভবতারণ ঘোষালের তরফে এ প্রশ্ন প্রথম উঠল আজ, তাই জবাব দিতে একটু দেরী হল ওব। সংসারের কোন কথায় থাকেন না ঘোষালসাহেব। আজ ইভা না থাকাতেই বোধ হয় পিতার কর্তব্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাঁর মনে। কুশানু বলে, অন্তসব সাবজেক্ট তো ভালই তৈরি হয়েছে, অঙ্কটাতেই একটু কাঁচা!

ভবতারণ একটু অবাক হয়ে বলেন, ম্যাথমেটিক্স? ম্যাথমেটিক্স ইস্ নট য়োর সাবজেক্ট।

এবার অবাক হওয়ার পালা কুশানুর। ভবতারণবাবু তাহলে তার প্রিপারেশনের কথা জিজ্ঞাসা কবছেন, মেয়েব নয়। বলে, আমি ভেবেছিলাম, ইলার পড়াশুনার কথাই জিজ্ঞাসা করছেন আপনি। আমার প্রিপারেশন ভালই হচ্ছে।

ফার্স্ট ক্লাস থাকবে?

তা কি কবে বলব বলুন। চেষ্টা তো করছি।

টুইশানিতে বড্ড সময় নষ্ট হয়—তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো হয়ই, নিজের পড়াশুনা কবার সময়ই পাই না।

সাপোস্, য়ু গিভ আপ্ সাম অফ দেম্? সাপোস্, আই ডাব্ল্ য়োর ফীস? না না, কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই। তোমার আত্মমর্যাদায় বাধলে এটাকে ঋণ হিসাবেও ধবে নিতে পাব তুমি। পাস কবে চাকরি তো কববেই—তখন ক্রমে ক্রমে না হয় শোধ করে দেবে। ফার্স্ট ক্লাস কিন্তু পেতেই হবে তোমাকে।

কুশানু চুপ করে থাকে। প্রস্তাবটা অভাবিত। তাছাড়া হঠাৎ ওঁর তুমি সম্বোধনটাও কানে বাজতে থাকে ওব। বুঝতে পাবে তাকে ভালবেসে ফেলেছে এ পরিবারের সকলেই। এই ধনী-পরিবারেব সে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে ক্রমে, তাই ওঁর অর্থকৃচ্ছ তার জন্ম এদের মনে জন্মেছে একটা বেদনা-

বোধ। তাই মেয়ে আজ নতুন করে বি এ. পরীক্ষা দিতে চায়—বাপ মহাজনী কারবারের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছেন।

শাক ও কথা। পরে ভেবে দেখে না হয় জানিও আমাকে। আমি এখন অন্য একটা কথা বলতে চাই তোমাকে।

উৎসুককণ্ঠে কুশাম্বু বলে, বলুন।

চুরুটের ছাইটার দিকে তাকিয়ে ভবতারণবাবু ইংরাজিতে বলেন, কথাটা একটু গোপনীয় এবং পারিবারিক।

কুশাম্বু চুপ করে অপেক্ষা করে। চুরুটের ছাইটাকে যেন আর ধরে রাখতে পারছে না—সেটার অবস্থা যেন ভবতারণের মতই। ছাইদানি ছিল না হাতেব কাছে। ঘোষালসাহেব উঠে গেলেন জানলার কাছে। ছাইটা বাইরে ঝাড়লেন। যেন মনটাও ঝাড়লেন সেই সঙ্গে। মুখটা না ঘুরিয়েই প্রশ্ন করেন, ইভার সঙ্গে তোমার কতদূর ইন্টিমেসি হয়েছে?

কান দুটো লাল হয়ে ওঠে কুশাম্বুর। এ কী অসঙ্গত প্রশ্ন! উনি কি কিছু আন্দাজ করেছেন? কিন্তু অন্তায় অশোভন আচরণ তো কিছু করেনি কখনও। কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না। তিন কি চার সেকেন্ড অপেক্ষা করেই এদিকে ফেরেন ঘোষালসাহেব। ওর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলেন, যু নিড্‌ন্‌ট ফ্লাশ্! বিংশ শতাব্দী প্রোট হতে চলেছে। নারী-পুরুষের বন্ধুত্ব এমন কিছু অদ্ভুত জিনিস নয় আজকের দিনে। তুমি অবশ্য বলতে পার, তাহলে বুড়ো বাপের এ নাক গলাবার চেষ্টা কেন। বলছি সে কথা।

এসে বসেন ফের সোফাটায়। এবার আর ওর দিকে তাকাচ্ছেন না। মেদিনী নিবন্ধ দৃষ্টি। ধীরে ধীরে উনি বলতে থাকেন, ইভার দুর্ভাগ্যের কথা কিছুটা তোমায় বলেছিলাম একদিন। সী কুড্‌ট কম্প্রোমাইস্ হারসেল্‌ফ উইথ হার হাস্‌ব্যাণ্ড। চলে এসেছিল সব সম্পর্ক অস্বীকার করে। ওর স্বামীর জীবনবাবু শ্রীরামপুরের বড় জমিদার। সাবেকি আমলের বনেদী পরিবার। জমিদারী আজ নেই—কিন্তু জমিদারী চাল আর মেজাজটা আছে। সুকান্ত ওঁর একমাত্র ছেলে—অপদার্থ! ঠিক অপদার্থ অবশ্য নয়, লেখাপড়া শিখেছে, বুদ্ধি বিবেচনাও আছে, বাট্‌ হি হ্যাস্‌ গন টু ডগ্‌স্। ছেলেবেলা থেকেই কতকগুলো বখাটে ছেলের সঙ্গে মিশে কেমন বিগড়ে গেছে। থিয়েটার, ক্লাব, ফুটবল টুর্নামেন্ট এই নিয়েই আছে। দুর্ধর্ষ ডেয়ারিং, মরবে কোনদিন বেঘোরে। একবার একটা দাঙ্গার কেসে ফেসেও গিয়েছিল—আমিই বাঁচিয়ে



দিই—সে কথা ইভাও জানে না। মদ আমরাও এককালে প্রচুর খেয়েছি, কিন্তু—, যাক ও কথা।...দিন চারেক আগে ইভার স্বপ্নরবাড়ি থেকে একজন খবর নিয়ে এল ওর স্বপ্নর মরণাপন্ন, বউমাকে দেখতে চান। আমার আপত্তি ছিল ইভাকে পাঠানোতে। এতদিনে আমার বিশ্বাস হয়েছে স্বকান্তের সঙ্গে একদিন বিবাহ-বিচ্ছেদ করতেই হবে ইভাকে। সেক্ষেত্রে ওর যাওয়াটা উচিত নয়। জীবনবাবুর সঙ্গে আমাব প্রচণ্ড বাদানুবাদ হয়েছিল একদিন। আমার বিশ্বাস সব জেনেগুনেই তিনি সর্বনাশ কবেছেন আমার মেয়ের। তাই তিনি নিজেকে যখন ইভাকে ফেরত নিতে এলেন তখন অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাঁকে। আজও তাই ইভাকে পাঠাবার ইচ্ছা ছিল না আমার; কিন্তু ও জোর করল। বলল, তিনি তো আমার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেননি। তিনি ভেবেছিলেন, বিয়ে দিলে তাঁর ছেলে শুধরে যাবে। সেটা ভুল হয়েছিল তাঁর। ভুল ভুলই, অপরাধ নয়! সেইজন্তে তাঁর মৃত্যুর সময়ে এত বড় আঘাত দেওয়া কি উচিত হবে বাবা?

তোমাকে কি বলব কুশাহু, ওর মহানুভবতায় আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ছেলেবেলায় কোথায় যেন পড়েছিলাম—তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?—ওর কথা শুনে সেই উদ্ধৃতিটাই মনে পড়ে গেলে আমার।

একটু দম নিয়ে ঘোষাল সাহেব বলেন, আজ চতুর্থ দিন। মেয়েটা গিয়ে পর্যন্ত কোন খবর পাঠায়নি। তাকে বারবার বলে দিয়েছিলাম চিঠি লিখতে। অথচ আজও কোন খবর এল না। আমি নিজেই যেতে পারতাম, কিন্তু যাওয়াটা বোধ হয় উচিত হবে না। জীবনবাবুকে আমার দরজা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, ওরা সেটা ভোলেনি নিশ্চয়। আমাকে দেখে ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারেন, এ সময়ে সেটা ঠিক নয়। কিন্তু আমিও তো মানুষ! একবার ভেবেছিলাম, কেটে, নবীন অথবা আর কাউকে পাঠাই, কিন্তু ওরা অশিক্ষিত মূর্খ, ভরসা হয় না তাই। শেষে ভাবলাম, তোমার সঙ্গে কথাটা আলোচনা করি। ইভা বলেছিল, তোমাদের দুজনের মধ্যে ‘সামসট অফ এ ফ্রেণ্ডশীপ গ্রো’ করেছে। তুমি গেলে হয়তো আরও ইন্টিমেট খবর পেতে পারব। আই মীন, হাউ নী ওয়াজ রিসিভড বাই স্বকান্ত। তিনটে দিন, চারটে রাত, কম তো নয়!

ইলা এসে দাঁড়ায়। ফিকে ভায়োলেট রঙের একটা নাইলনের ফ্রক পরেছে,

মাথায় বো, পায়ে সাদা মোজা আর জুতো। মুখে পাউডারও বুলিয়েছে একটু। ভবতারণ বলেন, গাড়িটা বের করেছে কি নবীন ?

এ সব ইঙ্গিত এরা সহজেই বোঝে। ইলার কোন অসুবিধা হয় না বুঝতে যে, কুশানুরা এখন এমন কিছু আলোচনা করছে যাতে তার এখানে না থাকাই কাম্য। তাই নিজে থেকেই বলে, আমি বরং গাড়িতে গিয়েই বসি বাপি।

ভবতারণ বলেন, থ্যাঙ্ক, ইয়েস।

ইলা চলে যায়।

এই সব ‘থ্যাঙ্ক, উইথ য়োর পার্মিসন্স,’ ‘এক্সকিউস্ মি’ এখনও ঠিক মত রপ্ত হয়নি কুশানুর। বাপে-মেয়ের এ জাতীয় কথোপকথন যেন বড় কৃত্রিম। কিন্তু সে কথা চিন্তা করবার সময় পায়না। হঠাৎ একটা খাপছাড়া অসংলগ্ন প্রশ্নে সে চমকে ওঠে—হোয়াই ডোন্টু ম্যারি কুশানু ?

এ কী অসংলগ্ন প্রশ্ন ! কন্নার দুর্ভাবনায় ভবতারণ ঘোষাল কি চিন্তাধারার পারম্পর্য হারিয়ে ফেলছেন ? না হলে পূর্বের আলোচনার সঙ্গে এ প্রশ্নের তো কোন সঙ্গতি নেই। ও জবাব দেবার আগেই ঘোষাল সাহেব আবার বলেন, বেটার ম্যারি আর্লি ! অল্প বয়সে বিয়ে কর, তাহলে পরস্পরকে বোকা যায়, পরস্পরকে মানিয়ে নেওয়া যায়, পরস্পরকে স্বীকার করা যায়।

নথটা খুঁটতে খুঁটতে কুশানু বলে, আমার কোন আয় নেই।

জানি। কিন্তু পাশ করেই তো ভাল চাকরি পাবে তুমি।

পাস করেই চাকরি পাব তার গ্যারান্টি কোথায় ?

আমি যদি গ্যারান্টি দিই ?

এবার বিস্ময়ের মাত্রা আকাশচুম্বী হয়ে উঠছে কুশানুর। বলে, আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না আমি।

আবার সিগারের ছাইটা ঝাড়বার জগ্জ উঠতে হল ভবতারণবাবুকে। জানালার কাছে গিয়ে পিছন ফিরে তেমনিভাবে বলেন, আমার পরিচিত একজন ভদ্রলোক অল্পবিত্তের একজন সচ্চরিত্র শিক্ষিত পাত্র খুঁজছেন। তোমার কথা ভবেশের কাছে শুনেছি, নিজেও দেখেছি। গ্যাচারালি তোমার কথাই মনে হয়েছিল আমার। আর্থিক অসুবিধা হবার কথা নয়। অ্যাট লিস্ট যু ক্যান সেকলি সেট অ্যাসাইড ছ ফিনানসিয়াল আসপেক্ট অব ছ প্রবলেম। মেয়েটি সুন্দরী, শিক্ষিতা, স্বাস্থ্যবতী। অ্যাপারেন্টলি একটু উচ্ছল প্রকৃতির। বাইরে থেকে মনে হতে পারে অতি লঘু চরিত্রের মেয়ে

সে,—বাট্‌ আই নো, শী ইন্‌ রিষালি গ্রেট্‌ অ্যাট্‌ হার্ট্‌ ! আমি জানি, মনে মনে সৈ নিম্পাপ !

রুশানু যেন অর্টিস্টের সামনে সিটিং দিচ্ছে । এক তিলও নড়ে না । মিনিট খানেক কেউ কোন কথা বলে না । তারপর ভবতাবণবাবু ফিরে এসে বসেন নিজের সোফায় । একেবারে অগ্নি গলায় শুরু করেন হোয়াট্‌স্‌ য়োর অ্যাশ্বিসন ?

রুশানু বুঝতে পেরেছে—অসংলগ্ন প্রশ্ন করছেন না ভবতারণবাবু । কণ্ঠার জগ্নু তুচ্ছিস্তায় এলোমেলো প্রশ্নেব অবতারণা করছেন না মোটেই । পাকা ব্যারিস্টারের এলোপাতাড়ি প্রশ্নে সাক্ষী যেমন দিশেহারা হয়ে পড়ে, তেমনি দিশেহারা হয়ে পড়লেও ওর বুঝতে অসুবিধা হয় না, সওয়ালে এই অসংলগ্ন প্রশ্নস্তোবগুলিকে যখন সুসংবদ্ধ করা হবে তখন বোঝা যাবে বুঝা প্রশ্ন তাকে একটাও করা হয়নি । তাই সাবধানে জবাব দেয়, বড় হয়ে কি হব সেকথা ছেলেবেলা থেকেই ভাবছি । দুটো দিকে ঝাঁক ছিল আমার । বস্তুত দুটো অ্যাশ্বিসন ছিল আমার । আজও আছে । এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোন্‌ দিকে ঝুঁকব বলা কঠিন । হয়তো দুটোব একটাও হব না, হব সাধারণ কেরানী ।

সে দুটো কি ?—চোখ বুজেই প্রশ্ন করেন ঘোষাল সাহেব ।

ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখতাম বড় আর্টিস্ট হব আমি । পোট্রেট পেইন্টার । মডেলার । ছবি আঁকার হাত আমার সহজাত ।

হাসলেন ভবতাবণ, বলেন, কার যেন দু লাইনের একটা কবিতা পড়েছিলাম :

Doctor s fees are heavy, Lawyers fees are high,

Artists are just supposed to entertain and die !

নেশা হিসাবে আর্টের সাধনা আমি খুব ঈর্ষালি রেকমেণ্ড করব , কিন্তু পেশা হিসাবে ? নৈব নৈব চ ! দ্বিতীয় স্তত্রটা কি ?

রুশানু লজ্জা পেয়ে বলে, সেটা নেহাতই ছেলেমানুষি ।

ছেলেবেলার চিন্তাধাৰা ছেলেমানুষের মতই হওয়ার কথা ।

রুশানু একটু ইতস্তত করে বলে, ছেলেবেলা থেকেই গোয়েন্দা গল্প আমার খুব ভাল লাগে । কোনাল ডয়েল, এডগার এলেন পো থেকে সব বিদেশী গোয়েন্দা গল্পই আমার পড়া শেষ । ক্রিমিনোলজির অনেক প্রামাণিক গ্রন্থও পড়ে ফেলেছি নেশার ঝাঁকে । তাই ভাবতাম বড় হয়ে শখের গোয়েন্দা হব ।



এবারও হাসতে হাসতে ঘোষাল সাহেব বলেন, পেশা হিসাবে গোয়েন্দা হওয়া— আমি নিশ্চয়ই ষ্ট্রংলি রেকমেণ্ড করব, কিন্তু নেশা হিসাবে? নৈব নৈব চ!

কৃশানুও হেসে বলে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না তো।

ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে যারা কাজ করবে তাদের হাতে হবে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের মত। দুঃখে অন্তঃস্বপ্নমন, সুখে বিগতস্মৃহ! একটু নেশা হলেই পদস্থলন অনিবার্য—তুমি আনডু রিস্ক নিয়ে বসবে। কুণ্ডলো যাবে নজর এড়িয়ে। নেশাখোরের স্থান এ নয়। অথচ পেশা হিসাবে—

দ্বারপ্রান্তে আবার এসে নীরবে দাঁড়ায় ইলা।

আয়্যাম সরি ইলু-মা!— উঠে পড়েন ঘোষাল সাহেব—চল যাই।

কণ্ঠ্যাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যান তিনি। তারপর হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, তাহলে শ্রীরামপুরে—

কাল সকালেই যাব আমি। বাধা দিয়ে বলে কৃশানু।

থ্যাঙ্ক!

মেসে ফিরে কৃশানু দেখে তার চিঠির জবাব এসেছে। নিজের মোটামুটি পরিচয় সে দিয়েছে। স্বাহা মিত্র পাটনা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। ওর বাপ-মা নেই—আছে এক ছোট বোন, আর আছেন দাদা। তিনিই ডাঃ অপারেশন মিত্র এম. বি., বি. এস.। ভারতীয় ডাক্তারী খেতাবটাকে মাকিন-মলুক থেকে ঘষে মেজে উজ্জ্বলতর করে আনবার শুভ ইচ্ছা নিয়ে তিনি বছর তিনেক আগে আমেরিকায় গিয়েছেন। মানসিক রোগের ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই, তাই মনোবিজ্ঞানের উপর বিশেষ এক ডিপ্লোমা নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি বর্তমানে ‘আমেরিকান বোর্ড অফ সাইকিয়াট্রি অ্যান্ড নিউরোলজি’র একজন শিক্ষানবিশী। বোনও থাকে না সাহার কাছে। বোনের কথায় লিখেছে, সে আমার মাসীমার বাড়িতে থেকে পড়ে আপনাদের কলকাতাতেই। মাসীমার বাসার ঠিকানা ১৬১।১বি রাসবিহারী এভিনিউ। মহানির্বাণ মঠের কাছে। ওর ডাক-নাম টুকলি। আপনি একদিন গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করে আসবেন। তাকে আপনার কথা লিখেছি, সে খুব খুশী হবে। ওকে অবশ্য টুকলি বলে ডেকে বসবেন না যেন; ডাক-নামটা ও পছন্দ করে না। মানে পছন্দ ঠিকই করে, তবে বাইরের লোকের কাছে

গোপন করতে চায়। যদি ঘরের লোক হয়ে যান তাহলে টুকলি বলে ডাকলেও সে সাড়া দেবে নিশ্চয়, তা যতদিন না হচ্ছে ততদিন ওর নাম আপনার কাছে শ্রুতি। শ্রুতি মিত্র। বেশ মিষ্টি নাম, নয়? মেয়েটিও ভারী মিষ্টি। আলাপ হলে দেখবেন ভগ্নীগবে মিথ্যা বলিনি আমি। আপনি নিশ্চয়ই দেখা করবেন। ওর কাছ থেকে আপনার গল্প শুনব।

নামের প্রসঙ্গে লিখেছে—আপনার নামটা নিয়ে এ আবার কোন নতুন হৈয়ালি শুরু করলেন? সব কথা স্বীকার করে নামটা গোপন করার অর্থ? অভিধান খুলেও তো ‘কে’ অঙ্করেব এমন কোন নাম মনে করতে পারছি না। যা এতই শ্রুতিকটু অথবা অশ্লীল যে কাউকে বলা যায় না! আপনি কিন্তু অদ্ভুত মানুষ!

কৃশানু সেই বাত্রেই জবাব লিখল। লিখল, সত্যিই আমি অদ্ভুত মানুষ স্বাহা। নিতান্তই অদ্ভুত। আমার সব কথা শুনলে অবাক হয়ে যাবে তুমি, কিন্তু সব কথা তো বলা যাবে না।...আমার মা নেই, বোন, দিদি, মাসী, পিসী কিছুই নেই। এমন কি দূর সম্পর্কের একটা দাদারও সন্ধান পাইনি যার বউকে বউদি বলে ডাকতে পারি। দুটো মনের কথা বলে মনটা হাল্কা করতে পারি। এই জন্মে অপরিচিতা অনায়ায়া কোন মহিলার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে, আমাদের ক্লাসে পাচটি ছাত্রী পড়ে, আমি তাদের নাম জানি, চিনি না। চোখ তুলে দেখিনি কোন দিন। সে জন্মে তোমার সনিবন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তোমার মাসীমার বাসায় যেতে পারলাম না। আলাপ করতে পারলাম না তোমার বোন টুকলির সঙ্গে।

...এতখানি লিখে হঠাৎ খেয়াল হল কখন অজান্তে তুমি লিখে শুরু করেছি এ চিঠি। ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে লেখা যায়, কিন্তু মনে হচ্ছে থাক না! তুমিই আমার জীবনে প্রথম নারী যাকে এতটা মন খুলে চিঠি লিখতে পারি। হয়তো, আর হয়তো কেন—নিশ্চয়ই তাব একমাত্র কারণ আমি জানি তোমার সঙ্গে কোনদিন আমাব চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হবে না—তাই চক্ষুলজ্জা এসে বাধা দিচ্ছে না আমাকে। আশা করি তুমি ও আপনাব দূরত্ব রাখবে না এর পর থেকে।

যে কথা বলছিলাম। আমার মনকে আমি চিনতে পারিনি, নাগাল পাইনি মনের। আমাব মন যেন আমার নিজের নয়, যেন তার উপর আমার কোন

জোর নেই। অতি সামান্য কারণে আমার মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগে, আবার অতি কঠিন আঘাতও আমি বুক পেতে সহ্য করতে পারি। খুব ছেলেবেলা থেকেই আমার আঁকার হাত। এখনও আমি ছবি আঁকি। স্কুলের ড্রইং মাস্টারমশাই আমাকে একটা ড্রইং-খাতা কিনে দিয়েছিলেন। সেটা ছিল সে যুগে আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। একদিন আমার বৈমাত্রেয় বড় ভাইয়ের সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া হয়। দোষ তারই ছিল, আক্রোশের বসে সে আমার খাতাখানা কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। আমার বিমাতা কোন দিন আমার পক্ষ নিতেন না। সেদিন কিন্তু তিনি আমার দাদাকে মারতে গিয়েছিলেন। মনে আছে, আমিই তাঁর হাত চেপে ধরেছিলাম,— বাধা দিয়েছিলাম। ওকে ক্ষমা করেছিলাম। সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল অতটুকু ছেলের সহ্যজ্ঞান দেখে। আর একদিনের কথা মনে আছে। আমাদের ক্লাশে গোবিন্দগোপাল ছিল সবচেয়ে বকাটে ছেলে। বড়লোকের ছেলে, অত্যন্ত আতুরে। ওর বাবার অনেক সুন্দর সুন্দর ছবির বই ছিল। মাঝে মাঝে এক আধটা বই ও নিয়ে আসত ক্লাসে। ছবির দিকে আমার বরাবর ঝাঁক। চেয়ে নিয়ে দেখতাম আমি। একদিন গোবিন্দগোপাল কি একটা রঙিন ছবির বই এনেছে। টিফিন-পিরিয়ডে লুকিয়ে লুকিয়ে কয়েকজন বন্ধুকে ছবিগুলো দেখাচ্ছিল আব কী গল্প বলছিল। আমিও গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম পিছনে। ছবিগুলো কিসের তা মনে নেই—যুদ্ধের চিত্র, বরফের ঝড় এই সব। আমি তন্ময় হয়ে ছবি দেখছি, হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে বইটা বন্ধ করে দিল গোবিন্দগোপাল, বললে—ভাল ছেলে, এখানে কেন?

এই সামান্য কারণে আমার এত রাগ হয়ে গেল যে গোবিন্দর সঙ্গে আর জীবনে আমি কথা বলিনি। গোবিন্দ বারবার এসে সেধেছিল, দেখাতে চেয়েছিল ছবিগুলো—কিন্তু দ্রুত অভিমানে আমি ওব সঙ্গে ভাব করিনি। এখনও ভেবে পাই না, এত সামান্য কারণে কেন এতটা বিচলিত হলাম। গোবিন্দগোপালের সঙ্গে স্কুল-জীবনে আর কথা বলিনি আমি।

বিস্তারিত ঘটনা দুটো লিখলাম, কাবণ আমি এখনও ভেবে পাই না কেন এমন অদ্ভুত আচরণ করি আমি। তুমি বলতে পার? কেনই বা দাদার অত বড় অন্তায়টা অত সহজে ক্ষমা করলাম, আর কেনই বা গোবিন্দগোপালের ঐ সামান্য ঠাট্টা সহ্য করতে পারলাম না আমি?

আমি জানি। তার কারণ আমি স্বাভাবিক মানুষ নই। আমার মন আমার নিজের নয়। তার লাগাম হারিয়ে গেছে।

এত কথা তোমাকে লিখলাম যাতে তুমি বুঝতে পার, কেন তোমার বোনের সঙ্গে আলাপ করতে যাবার সাহস নেই আমার। যাতে ক্ষমা করতে পার আমার এ অপরাধ।”

ঠিকানা মিলিয়ে যে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল কৃশাঙ্ক পরদিন সকালে তাকে প্রাসাদই বলা উচিত। সামনে লোহার বড় গেট। একটা পাশা মরচে ধরে অনড়, অপর পাশাটা কাত হয়ে পড়ে থাকায় গরু-বাহুর অনায়াসে ঢুকে পড়ছে বাগানে। বাগান অবশ্য এখন নেই—আগাছায় ভাঁত চত্বরটা, মাঝে মাঝে কামিনী, বকুল, করবী প্রভৃতি জোরাল গাছগুলো টিকে আছে। বাড়িটা চারমহলা। মাঝখানে তৃণ-আচ্ছাদিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। দেওয়ালের বাইরের দিকে অসংখ্য ছোট ছোট ঘুলঘুলি—পায়রার খোপ। চওড়া বারান্দাটা অত্যন্ত নোংরা করে রেখেছে তারা। বারান্দার উপরেই বিরাট একজোড়া মোষের শিং—সম্ভবত এই ভগ্নপ্রায় প্রাসাদের কোন পূর্বতন মালিক সেটিকে রাইফেলবিদ্ধ করেছিলেন আসাম অথবা সুন্দরবনের জঙ্গলে।

প্রবেশপথে দারোয়ানের ঘর থেকে আটামাথা হাতেই উঠে আসে কৌতূহলী দারোয়ান। কৃশাঙ্কর পরিচয় শুনে সে খবর পাঠাল ভিতরে। একটি অবগুণ্ঠনবতী দাসী ওকে নিয়ে গেল ভিতরে।

চওড়া বারান্দাটা পার হয়ে দ্বিতলে যাবার সিঁড়ি। দ্বিতলের প্রথমেই চতুষ্কোণ গাডিবারান্দার মত একটা অংশ। একসার টব আছে রেলিং ঘেঁষে। শ্রাওলা আর দুর্বা যদি টবের গাছ না হয়—তবে কোন টবেই গাছ নেই। দ্বিতলের চওড়া বারান্দায় একটা শ্বেতপাথরের বিরাট টেবিল; রক্তাভাসের পরিবর্তে চতুষ্কোণ হলে হয়তো পিংপং খেলা চলত। সেটাকে পার হয়ে একসার তালাবন্ধ খড়খড়ি-পাল্লাওয়ালা বিরাট দরজাকে বাঁয়ে রেখে ও এসে পৌঁছলো একটি ঘরে। ওকে বসিয়ে ফ্যানটা খুলে দিয়ে ঝি-টি চলে যায়। বিজলীপাথা দেখে একটু অবাক হয় কৃশাঙ্ক। এ সাবেক জমিদার বাড়িতে এটা সে যেন আশা করেনি। ঘরটির দিকে ভাল করে তাকিয়ে অনেক কিছু বৈপরীত্যই ওর নজরে পড়ে। সিলিং থেকে ঝুলছে একটি ঝাড়, ঘরের মাঝখানে আবলুশকাঠের একটা পালিশ-চটা টেবিল। খানচারেক



ছোবড়া বের হওয়া সোফা-সেটি। দেওয়ালে দুখানা প্রকাণ্ড অয়েলপেন্টিং। বুককেসে সারসার বাঁধানো বই। তাল্যাটা মরচে ধরে রক্তবর্ণের। পেরেক থেকে ঝুলছে ফ্রেমে-আঁটা একটা গাট-কাটা টেনিস-র‍্যাকেট। এ পাশে একটা ড্রেসিং টেবিলের উপর কিছু প্রসাধন সামগ্রী আর একগাদা ছোট-বড় রূপোর কাপ স্তূপাকার করা। আবলুশকাঠের টেবিলের নিচে একটা ভাঙা হকি ষ্টিক আর একপাটি বক্সিং গ্লাভস্। অয়েলপেন্টিং দুটোর মাঝখানে আর একটা দরজা, খডখডি পাল্লার নর। এ বাড়ির স্বপতি-পর্ষায়ের সঙ্গে একেবারে গোত্রহীন ফ্লাস পাল্লা একটা, গায়ে তার গা-তালা।

হঠাৎ সেই দরজাটা খুলে গেল। ঘরে এল ইভা। কদিনেই চোখমুখ একটু বসে গেছে। অত্যধিক পরিশ্রমে অথবা রাত্রি জাগরণে, কিন্তু এই স্নানিমার উপর লেগেছে হঠাৎ খুশীর একটা দম্কা হাওয়া।

হাত দুটি বুকের কাছে এনে নমস্কার কবে ইভা বলে, স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম—নাকি আমার পূর্বজন্মের পুণ্যফল।

ক্লশানু চোখ তুলে ওর দিকে তাকায়নি একবারও। তবু অভ্যাসবশে প্রতিনমস্কার করে বলে, জানি, সংস্কৃত নিয়ে সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করেছিলেন আপনি, আমার মত নাইস্ হননি। বিত্তে জাহির না করলেও হবে—

ইভা ঠোট উল্টে বলে, বারে। বিত্তে জাহির করলাম কোথায়? হঠাৎ কি মনে করে এসেছেন তাই তো জানতে চাইছি।

ক্লশানুও উত্তরে বলে, বারে। আপনজন হঠাৎ হারিয়ে গেলে যাত্নুষে খোঁজ করে না বুঝি?

বলেই লজ্জা পায়, খুশীও হয়। এমনভাবে সহজ সুরে ও যে কথা বলতে পারে কোন এক অনাখ্যায়ী মহিলার সঙ্গে, তা যেন নিজেরই বিশ্বাস ছিল না। হঠাৎ মুখ-ফসকে-বলা কথাটাতে ইভার মুখে কি প্রতিক্রিয়া হল তা দেখবার জন্য ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল—কিন্তু সে কৌতূহল দমন করল ক্লশানু। এ নির্জন ঘরে ও পূর্ণ দৃষ্টিতে ইভার দিকে তাকাতে সাহস পায় না।

একটু নীরবতা।

ইভাই ফের বলে, বাবা নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

নতনেত্রে ক্লশানু গম্ভীর হয়ে বলে, পড়াই স্বাভাবিক; আপনি তো এসে পর্যন্ত কোন চিঠি দেননি।

কি করে দেব বলুন ? এসে পর্যন্ত যমে-মামুযে যে টানাটানি চলছিল । একেবারে সময় পাইনি । আজকেই শুধু হাতে এসেছে অথও অবসর । আজই খবর দিতাম ; কিন্তু আপনিই এসে পড়লেন ।

আপনার শুভ্র—

তাকে আজ কলকাতায় রিনিভ করা হল ।

ক্রমে ক্রমে ইভার কাছ থেকে সব খবর পাওয়া গেল । হঠাৎ সিঁড়ি থেকে পড়ে যান জীবনানন্দবাবু । ব্লাড-প্রেসার ছিলই । এই বিশাল প্রাসাদের একান্তে তিনি থাকতেন কিছু বেতনভুক বি-চাকর আর কর্মচারীর বেষ্টনীতে । একটাই সম্ভান জীবনানন্দবাবুর । তাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল তাঁর আসানসোলের ঠিকানায় । আসানসোলের কাছে একটা স্কুলের তিনি গেমস্ টীচার । তিনি আসেননি, চিঠি-পত্রও আসেনি কোন তাঁর । এদিকে ইভাকে আনতে লোক যায় কলকাতায় । সে এসে পড়ায় অনেকটা সুবিধা হয়েছিল অবশ্য । ইভার খুড়শুভ্রের একটি ছেলেও এসে পড়েছিল টেলিগ্রাম পেয়ে । ওরা দুজনে মিলে যা পেরেছে করেছে । ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী আজ তাকে কলকাতায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । বাড়ির গাড়িতে করেই গেছেন তিনি, সঙ্গে মৃন্ময়, অর্থাৎ ইভার দে ওর আছে ।

আপনিও তাঁর সঙ্গে কলকাতা গেলেন না কেন ?

না, বিশেষ একটা কাজে আটকে গেলাম আমি । আজই বিকেলে যাব ।

একাই ?

না, একজনের সঙ্গে !

চোখে না দেখেও কানে শুনেই বুঝতে পারে ক্রশান্ত এ কথাটায় কেমন যেন রাগিয়ে উঠেছে ইভা । বাক্যের তিনটি শব্দই যেন বার হয়ে এল লজ্জাকর একটি কণ্ঠ থেকে । ইভা কি তবে ক্রশান্তর সঙ্গেই ফিরে যাবার কথা ভাবছে ? তাই কি নত হয়ে পড়ল ওর দৃষ্টি ? নত হয়েছে কি ? অদম্য কৌতুহলে এতক্ষণে প্রথম চোখ তুলে তাকায় ক্রশান্ত । আর তাকিয়েই চমকে ওঠে ।

জোড়া জ্বর মাঝখানে একটি কুমকুমের টিপ । হালকা চাঁপা রঙের সেই সিল্কের শাড়িখানাই পরেছে ইভা, গায়ে আগুন রঙের আটো জ্যাকেট, দার্জিলিং পাথরের সেই ধুকধুকি তুলছে বুকের উপত্যকায় ! না, শাড়ি-ব্লাউস পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ক্রশান্ত ; সব ভয়ে কণ্ঠনালী শুকিয়ে ওঠে ।

ইভা চোখ তুলে তাকায়নি ! নতনেত্রে একটু সামলে নিয়ে বলে, না, একা নয়, আশা করছি উনি এসে পড়বেন বিকেলের ট্রেনে। টেলিগ্রাম করেও জবাব না আসাতে একজন কর্ণচারীকে পাঠিয়েছি আসানসোলে। তিনি পৌঁছে টেলিগ্রাম করেছেন আজ বিকেলের গাড়িতেই ফিরে আসছেন বলে। তাই আমি বাবার সঙ্গে কলকাতা যাইনি। উনি এলে আমরা দুজনে একসঙ্গেই কলকাতা যাব। ওকি, আপনি উঠছেন কেন ?

কৃশানু অতর্কিতে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, বলে, আমি তবে চলি।

ইভা বাধা দিয়ে বলে, সে কি ! না না, তা হয় না ! সারাটা দিন একা একা কাটবে কি করে আমার ! বসুন, মেসে কেউ আপনার জন্তে শবরীর প্রতীক্ষায় বসে নেই।

মরিয়া হয়ে কৃশানু বলে, তা হলে, আপনার ঝিকে একটু ডাকুন এখানে।

কেন ?

একটু জল খাব।

এনে দিচ্ছি, ঝি নিচে গেছে।

ইভা উঠে যায় পাশের ঘরে। কৃশানু প্রাণপণে মনকে সংযত করে। কোনমতেই মনের উপর নিয়ন্ত্রণ শ্লথ হতে দেবে না। চিন্তাধারাকে সে অন্য পথে চালিত করতে চায়। বেশী ফল্‌স্‌-ওলা আলগা স্টিয়ারিং পাঁচসাত পাক না মারলে যেমন গাড়ির মুখ ঘুরতে চায়না তেমনি ওর আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আতঙ্কের ঝাঁকমুখ থেকে মনটা কিছুতেই মোড় ঘুরল না। ইভা অল্প পরেই ফিরে আসে। একটা ডিসে কিছু পুডিং আর কাচের গ্লাসে জল নিয়ে। সেই সাবেকী জমিদার বাড়িতে এমন তৈরী কাস্টার্ড-পুডিং একেবারেই অভাবিত। কৃশানুর বিস্ময় লক্ষ্য করেই ইভা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলে, উনি পুডিং খুব ভালবাসতেন।

খেয়ে নিয়ে কৃশানু প্রশ্ন করে, এখানে এসে তা হলে স্ককান্ডবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি আপনার ?

ইভা হেসে বলে, পুডিংটা খেয়ে আপনাব বৃদ্ধি খুলছে দেখছি।

কৃশানু বলে, ব্রাহ্মণভোজনের ফল হাতে হাতে পাবেন, আজ রাত্রেই দেখা হবে।

ইভা মুখ টিপে হেসে বলে, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

এইসব চটুল রসিকতা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে কৃশানু।

অনাখীয়া একটি মহিলার সঙ্গে এ ভাষায় এ ভাবে সে যে কথা বলতে পারে তা তার নিজেরই ধারণা ছিল না। নিজের কৃতিত্বে সে আত্মহারা হয়ে উঠছে, কিন্তু ভয়ও হচ্ছে প্রচণ্ড। ওর বুকেব মধ্যে যে গুরগুর করে উঠছে, হাড়ের মধ্যে যে সিরসিরানির ছোঁয়া পাচ্ছে সে কি আনন্দে, না আতঙ্কে? না কি এগুলো তার রোগের আক্রমণের পূর্বাভাস?

ইঠাং বলে ফেলে বেচারি, আপনি বরং আপনার ঝিকে ডেকে পাঠান এখানে।

বীতিমত অবাক হয়ে ইভা বলে, কেন বলুন তো?

উত্তর দিতে দেরি হয় কুশান্তর, তবু উত্তর তাকে দিতে হয় একটা শেষ পয়স্তু, বলে, একটি বিশেষ সন্ধ্যার কথা আপনি আমাকে ভুলে যেতে বলেছিলেন, আজকের এই সকালেব স্মৃতিটাও আমি ভুলে যেতে রাজি নই।

এবার ইভার পক্ষেই জবাব দিতে বিলম্ব হয়। জোড়া ভ্রূব মাঝখানের কমকুমের টিপটা লম্বাটে দেখাচ্ছে চামড়ার কুঞ্জে। নখটা খোঁটে দাঁতে, অবশেষে মনস্থির করে বলে, আপনি কি এঘবে অস্বোয়াস্তি বোধ কবছেন কুশান্তবাবু?

মেদিনীনিবন্ধ দৃষ্টি কুশান্ত বলে, বলা অশোভন, তবু বলছি, করছি।

ইভা এ কথায় আঘাত পেল কিনা বোঝা গেল না, আবাব প্রশ্ন করে, কিন্তু কেন বলুন তো?

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বেচারি জবাব দেয়, সে কথা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না, আমাকে মাফ কববেন।

নাইবা বোঝালেন সব কথা, কিসে অস্বোয়াস্তি বোধ করছেন তা তো বলতে পারেন?

চোখ ফেটে জল আসে। ছুটে পালাতে পারলেই যেন নিস্তার পাওয়া যায়। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়। তেমনি অসম্ভব মনে হচ্ছে এই নির্জন ঘরে ঐ মেয়েটির সঙ্গে এমন বিশ্রান্তালাপ। তাই বলে কিসে অস্বোয়াস্তি হচ্ছে তা কেমন করে বোঝাই? বললে শুধু অসৌজন্য নয়, অভদ্রতাও হবে হয়তো।

ইভা কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলে, হোক, তবু আপনি বলুন। আজ আপনি আমার অতিথি। এ বাড়ির অতিথি। আপনার অসচ্ছন্দ্য যদি কোনকিছুতে হয় তা আমাকে দূর কবতেই হবে। বলুন আপনি, লক্ষ্মীটি—



শেষ সম্বোধনটার আন্তরিকতায় একটু বৃষ্টি বিচলিত হয়ে পড়ে কুশান্ত।  
বুঝতে পারে চার-পাঁচদিন অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষাব পর আজ একটু আলাপ  
করার সময়, স্বেয়োগ আব মানুষ পেয়েছে ইভা। আব এ মানুষও সেই  
মানুষ যার জন্তে প্রতিদিন সকালে-শেষ বই সে সাবাদিন আগলে বাথত  
সন্ধ্যা ছটা থেকে সাতটাব মধ্যে লাইব্রেরী ঘবে বদলে নেবে বলে। হোক  
অসৌজন্য, তবু এই মিষ্টি লক্ষ্মীটি ডাকেব মর্যাদা বাথতেই হবে তাকে। উঠে  
চলে যেতে পাববে না এখনই। তাই মবিয়া হয়ে বলে ফেলে, অস্বোয়াস্তি  
এ ঘবেব নির্জনতায়, আপনাব ওই টাপা বঙের সাডিতে, ওই লকেট হাবে।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় ইভা।

কুশান্তব মাথাটা ও একেবাবে ঝুঁবে পড়ে বৃকেব উপব।

অনেকক্ষণ ইভাব দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে ধীরে ধীরে মুখ তোলে  
কুশান্ত। দেখে, নিজন ঘবে ও একা বসে আছে। কি কববে এবাব বুঝে  
উঠতে পারে না।

প্রায় মিনিট দশেক পবে ইভা ফিবে আসে। তাব কোলে একটি বছব  
তিনেকেব ছেলে। তাকে একমুঠো খেলনা দিয সে নামিয়ে দেয মেঝেতে।  
কুশান্ত লক্ষ্য কবে দেখে ইতিমধ্যে ইভা সাজটা পালটে এসেছে। লাল ভেলভেট  
পাডের পাটভাঙা মিনেব একথানা সাধাবণ শাড়ি পরেছে। গলাব মালাটা  
খুলে রেখে এসছে। যেন কিছুই হয়নি তেমনি ভাবে বলে, এটি হচ্ছে  
আমাদের বামুনদিব ছোলা। কদিনেই বেশ ভাব হয়ে গেছে আমার সঙ্গে।  
না বে টলটল / টলটলেব গালট' ও টিপে দেয।

কুশান্ত কিন্তু অত শীঘ্র সহজ হতে পারে না। গাঢ়স্বরে বলে, আমার এ  
অদৃষ্ট আচরণে আপনি নিশ্চয়ই—

বাধা দিযে ইভা বলে, মাস্তাবমশাই, আজকেব সকালবেলাব সব কথা  
আপনাকে ভুলে যেতে বলি না—কিন্তু এইমাত্র আপনাব সঙ্গে আমার যে  
কথোপকথন হল সেটুকু আমবা দুজনেই ভুলে যাব। মনে কববেন, আজকেব  
এই স্বন্দর সকালবেলাটায় ওটুকু ঘটনা ঘটেনি।

এবাবও 'ধবে নিলাম' কথাটা বলাতে বাধল কুশান্তব।

আবাব কিছুটা চুপচাপ।

হেসে ইভা বলে, কি হল, অমন মুখগোমড়া কবে থাকলে বৃষ্টি গল্প করা  
যায়? ইলু কেমন আছে বলুন।

কুশানু সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ? কিছু মনে করবেন না তো ?

না, করব না, জিজ্ঞাসা করুন। তবে বিনিময়ে আমাকেও কয়েকটি প্রশ্ন করার অধিকার দিতে হবে কিন্তু।

কুশানু ঘাবড়ে গিয়ে বলে, আচ্ছা, তবে না হয় থাক।

খিলখিল করে হেসে ওঠে ইভা। বলে, আচ্ছা বাপু হল, আমি না হয় কোন প্রশ্ন করব না। কাঠ-গডায়-ওঠা সাক্ষীর মত শুধু জবাবই দিয়ে যাব। কি বলছিলেন বলুন।

কুশানু বলে, আপনার শ্বশুরের অবস্থা তো ভালই, তাহলে সুকান্তবাবু চাকরি করেন কেন ?

ইভা সহজভাবেই সমস্যাটা পরিষ্কার করে দেয়। ওদের ঘরোয়া কথা বলতে কোন সঙ্কোচ বোধ করে না। জীবনানন্দবাবুর সঙ্গে কোন একটি বিষয় নিয়ে তাঁর একমাত্র পুত্রের মতবিরোধ হয়। বিষয়টা কি স্পষ্ট করে না বললেও সেটা আন্দাজ করতে পারে কুশানু। তা সে যাই হোক, এই মতান্তর ক্রমে মনান্তরে পরিণত হয়। একদিন শেষ পর্যন্ত সুকান্তবাবু রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলেও যান। আগে নাকি ওদের অবস্থা আরও ভাল ছিল—জমিদারী-প্রথা রদ হওয়ার পব ওদের সে ব্যবস্থা আর নেই। তাছাড়া ছেলে চলে যাওয়ার পর থেকে জীবনানন্দবাবুরও কেমন একটা বীতরাগ এসেছে সংসারের উপর। বাড়িঘর মেরামত করানো, সম্পত্তি দেখাশোনা করা—কিছুই আর মন দিয়ে করেন না তিনি—কার জন্তে করবেন ?

সব শুনে কুশানু বলে, আপনাকে আরও একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু সেটা বোধহয়—

ইভা বাধা দিয়ে বলে, এইসব ফর্মালিটির হাত এড়াবার জন্তেই একদিন আপনাকে বলেছিলাম আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে, কিন্তু তাতে তো আপনি রাজি নন—

কুশানু হঠাৎ বলে বসে, সেদিন রাজি ছিলাম না, আজ রাজি।

ইভা একগাল হেসে বলে, তাহলে এবার অকপটে আপনার প্রশ্নটা পেশ করুন, তবে অমন মুখ নীচু করে নয়, বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে—

কুশানুও হেসে ওর দিকে তাকায়, নিঃসঙ্কোচে বলে, সুকান্তবাবুর শুনেছিলাম পান-দোষ আছে, তাহলে স্কুলে চাকরি পেলেন কি কবে উনি ?

ইভা একটু গম্ভীর হয়ে বলে, সে কথা আমিও ভেবেছি, ভেবে উত্তর পাইনি। শুধু ড্রিক করা নয়, নিয়মশৃঙ্খলা ও মেনে চলতে পারে না। খিয়েটার, খেলাধুলা, শিকার—এই নিয়েই ওর দিন কাটে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় কেমন করে নিয়মমাফিক ক্লাস নেয় ও? জানি না। হয়তো বাবার সঙ্গে মনোমালিগ্জে সে নিজেকে খানিকটা শুধরে নিয়েছে, তা নিয়ে থাকলে বলব এ বিরোধ ওর পক্ষে অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ। আজ বিকেলে কিশোরীবাবুর সঙ্গে ও ফিরে এলেই জানতে পারব।

বেলা বেশ বেড়ে উঠেছে। গ্রীষ্মকাল। বেশী বেলা হলে রোদে কষ্ট হবে। কুশান্তর হাতে ঘড়ি নেই, ঘরেও নেই কোন ঘড়ি। বলে, কটা বাজে?

সাড়ে দশটা।

আমি তা হলে উঠি এবার।

তাই কি হয়! আজ আপনি আমার অতিথি। এত বেলায় না খাইয়ে কি আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি?

বারে, খেলায় তো আমি পুড়ি।

ইভা মুখ টিপে হেসে বলে, সে তো আর পেট ভরাবার জন্তে খাননি, যেই শুনলেন অণ্ড একজন পুড়িং খেতে ভালবাসেন, অমনি হিংসে করে তাতে ভাগ বসালেন—

কুশান্তর ইচ্ছে করছিল এখানে একটা রসিকতা করার। বেশ জুতসই একটা ঠাট্টা মনেও এসেছিল ওর। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলেও বাংলা কথাসাহিত্যের কল্যাণে ও জানে এ জাতীয় রসিকতা বান্ধবীর সঙ্গে করলে সেটাতে অসৌজন্য প্রকাশ পায় না। বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে না।

ইভা বলে, এখানে স্নানাহার করবেন, তপ্পুরে একটু গড়িয়েও নেবেন। বিকেলে আপনার সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দেব। তারপর আমরা তিনজনে একসঙ্গে কলকাতা যাব।

হু' একবার যুহু আপত্তি জানিয়ে কুশান্তর বুঝতে পারে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। তখন নিশ্চিত হয়ে খোশগল্লের দ্বিতীয় খণ্ড খুলে বসে।

ইভা দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথমেই সরাসরি বলে বসে, এবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি?

বাধা দিয়ে কুশানু বলে, কিন্তু শর্ত ছিল আমিই শুধু প্রসন্ন করব আর আপনি শুধু উত্তর দিয়ে যাবেন।

সে মামলা তো ডিসমিস হয়ে গেল। আপোস হয়ে গেল।

কুশানু অবাক হওয়ার ভান করে বলে, কই আমি তো করিনি আপোস।

গালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে ইভা চোখ বড় বড় করে বলে ওমা, কী মিথ্যুক আপনি। আপনি বললেন না—সেদিন মামলা তুলে নিতে রাজি ছিলাম না, আজ রাজি?

কুশানু হেসে বলে, হ্যাঁ, ঠিক কথা। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন কি বলছিলেন

আমার প্রস্তুতি স্বাভাবিক এবং প্রাঞ্জল। আপনি বিয়ে করছেন না কেন?

কুশানু লজ্জা পায় না, আব পায় না বলে খুশী হয়ে ওঠে। হেসে বলে, প্রস্তুতি স্বাভাবিক তো বটেই, নির্লাঙ্গুলীনীর পক্ষে লাঙ্গুলযুক্ত শৃগালের দিকে এ প্রস্তুতি হোঁড়া একটুও অস্বাভাবিক নয়। আর প্রাঞ্জল? হ্যাঁ, প্রাণ তো জলই হয়ে গেল আমাব।

রসিকতা বন্ধ কবে জবাবটা দেবেন? কাঠগডায় দাঁড়িয়ে প্রশ্নের স্পেসিফিক জবাব দিতে হয়।

কুশানু বলে, মনোমত পাত্রী পাইনি বলে।

আমি যদি আপনার মনোমত একটি পাত্রীর সন্ধান দিই?

আমি তৎক্ষণাৎ টোপব কিনতে ছুটি।

আমি কিন্তু সিরিয়াস!

বিয়ের ব্যাপারে আমিও অসিরিয়াস নই নিশ্চয়।

ইভা ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

কুশানু একটু ইতস্তত করে বলে, এখানে সিগারেট খাওয়া কি আশোভন হবে?

সিগারেট। আপনি সিগারেট খান নাকি? কখনও তো খেতে দেখিনি।

কুশানু আতঙ্কিত হবাব অভিনয় করে বলে, এইরে! ভারি ভুল করে বসেছি তো। আমি যে ভাল ছেলে নই এটা আপনি জেনে ফেললেন—এখন বোধ হয় সেই মহিলাটির সঙ্গে আমার বিবাহ প্রস্তাব উইথড্র করবেন আপনি।—সিগারেট ধরাতে ধরাতে কুশানু ছাই ফেলার জন্তে ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে ছোট একটা রূপার কাপ টেনে নেয়।

ইভা বলে, বহন, অ্যাসট্রে নিয়ে আসছি আমি।



হঠাৎ খেয়াল হয় কুশানুর ! কাপটা পরীক্ষা করে দেখে, তার গায়ে লেখা আছে টু এম চৌধুরী অ্যাজ ডঃ ভোস ইন তটিনীর বিচার ।

অ্যাসট্রেটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে ইভা বলে, যাক, নিশ্চিত করলেন আপনি । বিয়ে করবার নামে আপনি যে মৌজ করে সিগারেট ধরান এ খবরটা বাবাকে বলব 'অখন ।

একটু চককে উঠে কুশানু বলে, বাবাকে ! বাবাকে কেন ?

তিনি তো জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন ।

রসিকতার বাষ্পটুকু পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়ে যায় । বলে, ব্যাপারটা কি বলুন তো ? আপনার বাবাও কাল এই রকম একটা প্রশ্ন কবেছিলেন । পাত্রীটিকে ? আপনি চেনেন ?

নিশ্চয়ই ।

কে ?

ধরুন, যদি বলি আমার ছোট বোন, আইভি ?

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে কুশানু ।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে কুশানু ধীরে ধীরে বলে, আমাকে মাফ করবেন ইভা দেবী, আমি বাজি নই ।

কেন বলুন তো ?

কারণটা আমি জানাতে পারব না ।

আপনি তো আইভিকে দেখেননি । সে আমার মত কালো নয়—

কালো আপনিও নন, সে জ্ঞান নয় ।

কারণটা কি অর্থ নৈতিক ?

না । আপনার বাবা বলেছিলেন অর্থ নৈতিক অসুবিধাটা থাকবে না ।

একবার একটু যেন বেধে যায়, তবু সব সঙ্কোচ ত্যাগ করে ইভা নিশ্কেপ করে তার পরবর্তী প্রশ্নটি, আপনি কি কাউকে ভালবাসেন ?

লাজুক কুশানুর পক্ষে জবাব দেওয়া শক্ত । সে কি মনে মনে কোন মেয়েকে ভালোবাসে ? হ্যাঁ, বাসে । ধূপছায়া রঙের ঢাকাই শাড়ি-পরা একটি অপার্থিব মেয়ে ওর মনের এক কোণায় নিত্য এসে দাঁড়ায় লাজনম্রচরণে, পায়ে তার আলতার রাঙা-রেখা, কপালে সিঁদুরের ছোট টিপ । সে মেয়েটি, কুশানু জানে, দুনিয়ার কোথাও নেই, সে ওর মানসী ।

ইভা ওর লজ্জাজড়িত নীরবতাকে উপভোগ করে, কেমন যেন বেদনার্ত

হয়ে ওঠে। সহানুভূতিতে ঘেঁষে ওর চোখ দুটি আঁর্জ হয়ে ওঠে। চাপা গলায় ও আশ্তে আশ্তে বলে, আমি জানি আপনার মনের কথা।

চমকে ওঠে কুশানু। ইভা বলেই চলে, আপনি একটি মেয়েকে মনে মনে ভালবাসেন, কিন্তু এও আপনি জানেন তাকে দূর থেকেই শুধু ভালবাসা যায়—তাকে ঘরে আনা যায় না, তাই নয়?

অবাক হয়ে যায় কুশানু, বলে, আপনি কি করে জানলেন?

অদ্ভুত হাসল ইভা। এর জবাব অতি সহজ, কিন্তু ইভা জানে সে-কথা বলা যায় না। ষতটা বলেছে, হয়তো এতটা খোলাখুলি বলাও উচিত হয় নি ওর। হাজার হোক সে এ বাড়ির বউ। লাজুক কুশানুকে ভাল করে চেনে বলেই এতটা মন খুলে কথা বলতে পেরেছে ইভা। সে নিশ্চিত জানে যে, তার এ কথার জবাবে কুশানু কখনই ভেঙে পড়ে বলবে না—একবার বল ইভা, ঘরে না এলেও সে মেয়েটিও আমাকে তেমনি করে ভালবাসে!...সেটুকু সাহস ছিল বলেই এতখানি খুলতে পেরেছে মনের কপাট। অদ্ভুতভাবে হেসে তাই বলে, আপনি তো জানেন সে আপনার ঘর করতে আসতে পারবে না কোনদিন। তাই বলে কি বিয়েই করবেন না আপনি জীবনে?

কুশানু জবাবে বলে, জানি না এতকথা, কি করে আন্দাজ করেছেন আপনি, কিন্তু বাধা শুধু সেটাই নয়। আরও বাধা আছে, সে বাধা দুরতিক্রম্য। তাই হয়তো বিবাহিত-জীবন আমার হবার নয়।

অবাক গলায় ইভা বলে, দুরতিক্রম্য বাধা। কিসের?

কুশানু মাথা নীচু করে বলে, এ আলোচনা আমার পক্ষে ক্লেশকর। ঠিক যে কারণে আপনি গলার লকেটটা খুলে রেখে এলেন, শাড়িটা পালটে এলেন—যে কারণে একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল আপনাকে—সেই কারণেই। আমাকে মাপ করবেন ইভা দেবী, আমি ঠিক সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ নই। সব কথা আপনাকে বলা যায় না—কাউকেই বলা যায় না। আপনি দয়া করে আপনার বাবাকে বুঝিয়ে বলবেন।

অনেকক্ষণ ইভা কোন জবাব দেয় না। কুণ্ঠিত যুগ্মদ্রব মাঝখানে দুটি অবাক দৃষ্টি মেলে দেয় জানলা দিয়ে কোন্‌ দুর্নিরীক্ষ্য দিগন্তে। বসে থাকে চূপ করে। কুশানুর গলায় একটা বোবা কারা যেন আটকে গেছে। কী ভাবল ইভা? সে কি এখন থেকে ঘৃণা করবে কুশানুকে? সে কি ভাবল কুশানুর কোন দৈহিক অপূর্ণতা আছে! তাই সে বিবাহিত-জীবনে বীতকাম!

লজ্জার সঙ্কোচে মর্যাদাসিক অপমানের অন্তর্দাহে সে ভিতরে ভিতরে পুড়তে থাকে। হয়তো ইভা এখন ভাবছে—কোন লজ্জায় সে এমন একটা নপুংশকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল!

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে ইভার। অদ্ভুত মিষ্টি গলায় ও শুধু বলে, নিন, উঠুন এবার। স্নান সেরে নিন।

নিন উঠুন, পাঁচটা বেজে গেল যে!

ঘুমটা ভেঙে যায় কুশান্নুর। তারি সুন্দর লাগে পরিবেশটা। পুরু গদিওলা নরম বিছানা। যে ঘরটাতে সকালে ও বসেছিল, এটা ঠিক তার পাশের ঘর। মাবোর সেই গা-তাল্লা লাগানো দরজা দিয়ে আসতে হয় এ ঘরে। ঐ একটাই দরজা। নিঃসন্দেহে এটাই ওদের স্বামী-স্ত্রীর শয়নকক্ষ। মার্বেল পাথরের নক্সাকাটা ঠাণ্ডা মেঝে। হালকা ডিসটেম্পার কবা সবুজাভ দেওয়াল। পশ্চিমের জানলাটা বন্ধ। ঘরটা প্রায়াক্ষকার। নিশুন্ধ। টেবিলফ্যানের একটানা একটা আওয়াজ শুধু শোনা যায়। একটা মিঠে মিঠে গন্ধ উঠছে কিসের। খেয়াল করলে কুশান্নু দেখতে পেত মাথার কাছে যে টেবিলে ফ্যানটা রাখা আছে তাতেই আছে ছোট্ট রেকাবিতে রাখা কয়েকটা জুই। পরিপূর্ণ আহালাদির পর এমন পরিবেশে এ রকম একটা মোরসী ঘুমের আমেজ সহজে কাটতে চায় না। তবু উঠতে হল তাকে।

দেখে, ধূমায়িত এক পেয়াল চা হাতে দাঁড়িয়ে আছে ইভা। বলে, যান, মুখ-হাত ধুয়ে আসুন।

ঘরের লাগাও বাথরুমটা চেনা হয়ে গেছে। মুখ হাত ধুয়ে এসে বসে আবার পালকে।

চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন নাকি?

চমকে উঠে কুশান্নু বলে, আবার।

তবে তাড়াতাড়ি চা-টা খেয়ে নিন। চলুন, এবারে রওনা হওয়া যাক।

কিন্তু স্বকাস্তবাবু কই?

তিনি আসেননি।

আসেননি? মানে? আসবেন না?

হঠাৎ একটু কল্লস্বরেই ইভা বলে, সেসব বৃত্তান্ত পরে হবে, কিন্তু আর দেরি করলে পাঁচটা চল্লিশের ট্রেনটাও ধরতে পারব না।

কুশাহু একটু আহত হয়। হঠাৎ কেন যে এমন রকম হয়ে উঠল ইভা বোঝা গেল না।

অলক্ষণ পরেই ইভা তৈরি হয়ে এসে বলে, নিন, চলুন এবার।

আপনি জামা-কাপড় পালটাবেন না ?

না। আসুন।—এবারও ওর কণ্ঠে অহেতুক উদ্ভা।

ওর পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে কুশাহু। সে ভাবছিল, আশ্চর্য মেয়ে এই ইভা। সেদিন বাড়ির বাইরের ঘরে ওকে ময়ূরকণ্ঠি রঙের একটা মাইশোর সিঁড়ি পরে থাকতে দেখে ওর মনে হয়েছিল বড়লোকের মেয়েরা কি এমন শাড়ি বাড়িতেও পরে নাকি! আজ মনে হল এমন সাধারণ লালপেড়ে শাড়ি পরে কেউ পথে বার হয় নাকি! বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ঘোড়ার গাড়ি। দারোয়ান আর ঝিকে কি সব নির্দেশ দিল ইভা। তারপর উঠে বসল গাড়িতে কুশাহুর মুখোমুখি।

পাথর-বাঁধানো পথে ঘড়ঘড় করে চলল গাড়ি।

হঠাৎ আচমকা একটু হেসে ইভা বলে, আপনি কোন কথা বলছেন না যে ?

কি বলব ?

ছুটো সান্ত্বনার কথাও তো বলতে পারেন। এক প্লেট পুডিং কুকুরের মুখে ধরে দিয়ে এলাম।

আশ্চর্য মেয়ে তো! ভাবে কুশাহু। একটু আগে সে প্রশ্ন করেছিল স্বকাস্তবাবু কেন আসেননি, তখন রুখে উঠেছিল ইভা, অথচ এখন নিজে থেকেই সে প্রশ্নটা তুলছে। বলে, কেন এলেন না তিনি ?

জানলা দিয়ে ইভা তাকিয়েছিল বাইরের দিকে। গঙ্গার ধার দিয়ে পাথর-বাঁধানো পথ। পডন্ত রোজ্জু ঘান হয়ে আসছে। সমস্ত দিনের গুমট গরমেব পর আকাশটা থমকে আছে। ক্লাস্ত দেহে বিদায় নিচ্ছে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে। সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ইভা বলে, তিনি ওখানে নেই। কিশোরী-বাবু একাই ফিরে এসেছেন। এখন আর ও-স্কুলে কাজ করেন না তিনি।

চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন ?

অথবা ছাড়িয়ে দিয়েছে।

কিছুটা দুজনেই চুপচাপ। তারপর বাইরের দিকে তাকিয়েই ইভা বলে, থাক ও কথা। অন্য কোন গল্প করুন।



কুশান্ন বুঝতে পারে স্বকাস্তবাবুর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চায় ইভা। হয়তো মনে মনে সে তীব্রভাবে প্রত্যাশা করেছিল আজ তাকে। ওদের মনের মিল হয়নি। রাগ করে ওকে একদিন ছেড়ে গিয়েছিল ইভা। ইভা একদিন বলেছিল—দিদিকে ওরা মারে। ‘ওরা’ নিশ্চয়ই গোরবে। জীবনানন্দবাবুর সংসারের ষেটুকু দেখেছে কুশান্ন, তাতে আন্দাজ করতে অস্ববিধা হয় না যে স্বকাস্তবাবু ছাড়া আর কেউ নিশ্চয় ইভার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি। অথচ এই দুশ্চরিত্র মতৃপ স্বামীর জন্তে আজও তার মনের কোণে সঞ্চিত আছে গোপন দাক্ষিণ্য। সে যেন ক্ষমা করবার জন্তই উদ্গ্রীব হয়ে আছে। ইভা বুদ্ধিমতী, তাই বলতে পেরেছিল, বাপের সঙ্গে মনোমালিঙ্গ হয়তো অভিশাপ নয়, আশীর্বাদই হবে তার কাছে। মনে পড়ল কুশান্নর যে কথাটার আজ সে প্রথম চোখ তুলে তাকায় ইভার দিকে। সে কণ্ঠস্বরে যে লজ্জার আমেজ মিশে ছিল তাতেই বোঝা যায় মনে মনে সে আজও প্রত্যাশা করে আছে পুনর্মিলনের।

এক কাজ করবেন? চলুন, গঙ্গা পার হয়ে ব্যারাকপুর দিয়ে যাই।

কেন? তাতে তো আরও দেরি হবে।

হলই বা। কীই বা এমন রাজকর্ম পড়ে আছে কলকাতায়।

কুশান্ন বুঝতে পারে না কি চাইছে ইভা। ইতস্ততঃ করে। হয়তো মনের মধ্যে যে উদ্ভাপ জমা হয়ে আছে, গঙ্গার শীতল বাতাসে তা সে জুড়িয়ে নিতে চায়। তাই ইভার ইচ্ছানুযায়ী ঘোড়ার গাড়িটা গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়ায়। নেমে পড়ে ওরা। ভাড়া মিটিয়ে দেয়।

স্বটকেশটা আমার হাতে দিন—বলে কুশান্ন।

না থাক, ভারী নয় এটা মোটেই।

হাঙ্গা বলেই তো বলছি। ভারী হলে না হয় একটা সাঙ্গনা থাকত। হাঙ্গা যখন, তখন শিত্যালরি দেখাবার স্বযোগটা ছাড়ি কেন?

বেশ, তবে নিন।—স্বটকেশটা বাড়িয়ে দেয় ইভা।

কুশান্ন একটু ইতস্ততঃ করে বলে, এখানে রাখুন।

ইভার মুখে ফুটে ওঠে একচিলুতে হাসি। হাতে হাতে স্বটকেশটা হস্তান্তরিত হয় না। মাটিতে নামানো স্বটকেশটা তুলে নেয় কুশান্ন। এক নজর ওর দিকে তাকিয়েই কুশান্ন বুঝতে পারে ইভার মনের মেঘ কেটে গেছে। স্বকাস্তের জন্তে মনে মনে সে আজ সারা সকাল প্রহর ওনেছে,

তাই আশাভঙ্গে ক্রন্দন হয়ে উঠেছিল তখন। এতক্ষণে আবার সামলে নিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। শুধু স্বাভাবিকই নয়, বুকচাপা ঐ প্রাসাদ থেকে মুক্ত প্রকৃতিতে বেরিয়ে এসে ক্রমে সে খুশীয়াল হয়ে উঠেছে। তার অল্পমান যে সত্য তা বুঝতে পারে ইভার পরের কথাটায় : একটা জিনিস খাওয়াবেন ?

কি !—অবাক কুশানু প্রশ্ন করে।

ঐ মোড়ের দোকান থেকে একখিলি মিঠে পান নিয়ে আসুন।

কুশানুর ভারী মজা লাগে। ইভা একেবারে সহজ হয়ে পড়েছে। গীচ মোড়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ও-পাশে একটা পানের দোকান। একগাদা ডাব জডো করা আছে পাশে। পিতলের পাটাতনে একটাই বরফের উপর বিছানো আছে একসার খোলা পান—তার উপর নানান মশলা বিছানো। ইভাকে রাস্তার এ পাশে রেখে কুশানু ওদিকে চলে যায় পান কিনে আনতে। রাস্তার মাঝামাঝি গিয়ে শুনতে পায় ইভার পুনশ্চ : জর্দা আনবে একটু।

সূর্যটা আটকে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তের একখণ্ড কালো মেঘে। প্র্যাটিনামের মত উজ্জল মেঘের সীমান্তরেখা। গুমট গরমটা এখনও কাটেনি। পান নিয়ে ফিরে এল কুশানু। দাঁড়াল ইভার অনতিদূরে। বাড়িয়ে ধরল পানটা ওর দিকে। ইভার কোতুকোজ্জল মুখে ফুটে উঠল হাসির একটা আভাস। সেটা গোপন কবে গম্ভীর হয়ে বলে, পানটা তো হাতে হাতে নেওয়া যাবে না, কোথায় নামিয়ে রাখবেন ?

কুশানু লজ্জা পায়। সেটা গোপন করবাব জগ্রেই রাগ দেখিয়ে বলে, ছেলেমানুষী করবেন না—ধরুন।

অতি সাবধানে স্পর্শ বাঁচিয়ে পানের দোনাটা গ্রহণ করে ইভা। হাতে হাতে ছোঁয়া লাগলে ষতটা লাল হয়ে উঠত তার চেয়ে বেশীই রাঙিয়ে ওঠে বেচারী ইভার অতি সস্তর্পণে সেটা গ্রহণ করার ভঙ্গিতে।

ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে দেখে পারানি লঞ্চটা মাঝ গাড়ে বাড়ী বোঝাই হয়ে চলেছে ওপারে। আর একটা লঞ্চ এখনও ছাডেনি ওপার থেকে। গঙ্গায় ভাঁটার এখন শেষ। অনেকটা কাদা বেরিয়ে পড়েছে পাড়ের কাছে। পাষাণ রানার শেষ সোপান থেকে জল এখন অনেকটা দূরে। দুখানা করে কাঠের তক্তা পাতা আছে জল পর্যন্ত। ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলি বাড়ী, একপাল ছাগল নিয়েও একজন।

চারিদিকে একবার দেখে নিয়ে ইভা বলে, একটা নৌকা ভাড়া করুন বরং।  
এই একপাল পাঠার সহযাত্রী হতে পারব না আমি।

অগত্যা কুশাহুকে সেই চেষ্টাই করতে হয়। এমন একটি দুর্লভ সার্বাহে  
যদি গজাবন্ধে ভেসে পড়তেই হয় তাহলে কলরবমুখরিত পারানি-লঙ্ঘের  
তুলনায় ছোট পানসীর পরিবেশ অনেক বেশী কাম্য। ঘাটে কোন নৌকা  
ছিল না, একটু দূরে বাঁধা আছে একসার নৌকা। কাদা বাঁচিয়ে আলগা  
ভাবে ওরা সরে এসে মাঝিকে ডাকল। ছেয়ের থেকে বেরিয়ে এসে মাঝি  
ওদের দেখে নিয়ে বলে, পারে যাবেন? একটু সবুর করতে হবে।

কুশাহু বিরক্ত হয়ে বলে, আরে বাপু সবুর করব না বলেই তো ডাকছি  
তোমায়।

না বাবু, এখনই বান আসবে। আজ পুণ্ড্রিমে। বান চলে গেলে নিয়ে  
যেতে পারি।

ইভা অসহিষ্ণু হয়ে বলে, কটায় আসবে বান?

আজ্ঞে সওয়া ছটায়।

তোমার পার হতে কতক্ষণ লাগবে?

এখন লাগে বিশ মিনিট, জোয়ার এসে গেলে আধ ঘণ্টা।

বাম মনিবন্ধের দিকে তাকিয়ে ইভা বলে, তা হলে আর বাজ্রে কথা না বলে  
এখনই নৌকা ছাড় তুমি। এখন ঠিক পাঁচটা চল্লিশ।

মাঝি একবার গাঙের দিকে চেয়ে নিয়ে বলে, বারো আনা লাগবে বাবু।

ইভা বলে, পুরো টাকাটাই দেব, এখন ছাড় দেখি নৌকা।

তবে ঘাটে আসুন মাঠান, এখানে নায়ে চড়তে লারবেন।

আবার কাদা বাঁচিয়ে ঘাটে আসে ওরা। নৌকাও এসে লাগে জোড়া  
কাঠের পাটাতনের গায়ে। মাঝি নিজেই স্ল্যটকেশটা তুলে নেয়। সস্তর্পণে  
পা ফেলে কুশাহু উঠে পড়ে নৌকায়। ইভা ইতস্ততঃ করে মাঝপথে। মাঝি  
পিছন ফিরে স্ল্যটকেশটা গুছিয়ে রাখছিল, হঠাৎ দেখতে পেয়ে ধমকে ওঠে,  
কেমন মাছুষ বাপু আপনি? বউমাছুষ উল্টে পড়বে কাদায়, ধর কেন  
হাতখান্ আগ্ বাড়িয়ে।

কুশাহু বেচারির অবস্থা মর্মান্তিক। হাত বাড়িয়ে ইভার মকরমুখো  
বালা-পর্য হাতখানা ধরতে হবে বলেই নয়, সে লাল হয়ে উঠেছিল এই কথা  
ভেবে যে মাঝি ওদের একটা মনগড়া নিকটতম সম্পর্কে বেঁধে ফেলেছে! তবু

নৌকার কিনারায় দাঁড়িয়ে হাতখানা সে বাড়িয়ে দেয়। আর পাঁচজন ছেলের কাছে ব্যাপারটা হয়তো অতি সাধারণ—কিন্তু ওর কাছে তা মনে হল না। একটি নরম মূঠির স্পর্শের প্রত্যাশায় ওর চোখ দুটি আবেশে মুদ্রিত আসে। চমকপ্রদ একটা শিহরণের জগ্নে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। সন্নিহিত ফিরে আসে নৌকাটা ছলে ওঠায়। চোখ মেলে দেখে—নৌকায় উঠে এসেছে ইভা, ওর প্রসারিত করের সাহায্য না নিয়েই। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে কুশাহুর। পাটাতনের একটি প্রান্তে বসে নীরবে একটা সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

একটু ফাঁক রেখে ইভাও এসে বসল পাশে।

নৌকা ছাড়ল।

খুব বেঁচে গেছেন যা হোক।—মুখ টিপে হাসে ইভা।

কেন?

আর একটু হলেই ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যেত।

আমাকে ছুঁয়ে ফেললে কি আপনার জাত যেত? তাই বুঝি গদাজল দিচ্ছেন মাথায়?

জাত আমার যেত না, যেত আপনার। বাব্বা, কী মানুষ সঙ্গে করেই বেরিয়েছি পথে। পদে পদে ভোগান্তি!

কুশাহু বলে, বেশ যা হোক, ভোগান্তি আপনার, না আমার! আপনার হুকুমে ট্রেন ছেড়ে নৌকায় চড়লাম, স্ট্রটকেশ বইলাম, পান এনে দিলাম, জর্দার যোগান দিলাম—

আর আপনার জগ্নে তারের খেলা দেখাতে দেখাতে আমি নৌকায় উঠলাম, এই সাদা শাড়ি পরে পথে বের হলাম—

কেন আমি কি বলেছি?

বলেন নি! মাত্র চারখানা শাড়ি নিয়ে চলে আসি। তখন কি জানি এতদিন থাকতে হবে। দুখানা তো একেবারে ময়লা হয়ে গেছে। বাকি আছে এখানা, আর সেই টাঙ্গা-রঙের সিঁকের খানা। তা আপনি—কথার মাঝপথেই থেমে গেল ইভা। হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখে কুশাহুর মুখটা বেদনার ম্লান হয়ে গেছে। কেন যে এ ভাবান্তর হল কুশাহুর তা বুঝতে পারে না; বুঝতে অনেক কিছুই সে পারে না। তবে এটুকু বুঝেছে কোথায় একটা ব্যথার কাঁটা বিঁধে আছে ওই ছেলেটির অন্তরের গহনে। ক্ষতটা দেখা



যায় না, কিসের আঘাতে ওটা হয়েছে বোঝা যায় না তা-ও ; কিন্তু বেদনশীল  
 যন্ত্রণার অভিব্যক্তি মাঝে মাঝে অসুভব করা যায়— যখন নিভৃত ঘরে ও ঝিকে  
 ভেকে দিতে বলে, অসুযোগ করে শাড়িটা পান্টে আসতে, খুলে রেখে আসতে  
 বলে দার্জিলিঙ পাথরের মালাছড়া । প্রেম তোমার অনেক কিছু কেড়ে নেয়,  
 বঞ্চিত করে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনা থেকে, রাত্রে স্বনিদ্রা থেকে । তেমনি  
 দৃষ্টিহীনের স্পর্শসুভূতির তীক্ষ্ণতার মত পুষিয়েও দেয় ক্ষতি, এনে দেয়  
 মর্মভেদী দৃষ্টি । ইভা তাই বুঝতে পারে ওর সামনে এসে উজ্জল হয়ে ওঠে  
 কুশাহুর মুখ, যে সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন পর্দাব ওপার থেকেই ইতস্ততঃ  
 করে ফিরে গেছে সে, সেদিন লক্ষ্য করেছে ইভা, মন দিয়ে পড়াতে পারে নি  
 মাস্টার মশাই—বারেবারে আনমনা হয়ে পড়েছে । ইভার সঙ্গে একটা  
 প্রীতির একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্বীকার করবার জন্য বেতসপত্রের মত কাঁপত  
 কুশাহুর আনত দৃষ্টি—এটা নজর এডায়নি তার, কিন্তু মুখে সে স্বীকার  
 করতে চাইত না । ইভাকে পড়ার দায়িত্বের কথায় সে শিউরে ওঠে, ওর  
 হাত থেকে স্লটকেশটা নিতেও অসুযম্পত্তা গাঁয়ের ঘোড়শীর মত মরমে  
 মরে যায় । ইভা জানে, ওর মনের নিভৃত কন্দরে আছে আত্মগোপনের এক  
 শঙ্কুবৃত্তি, তারই আকর্ষণে মনকে গুটিয়ে নেয় সে, কিন্তু এ জানা তো সবটা  
 জানা নয় । কেন ওর মন কদমফুলের মত ফুটে ওঠবার জন্য ব্যাকুল নয়,  
 কেন তা সর্বদাই শামুকের মত আডাল খোঁজে ? মাধ্যাকর্ষণের জন্যই যাবতীয়  
 উৎক্লিষ্ট বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্রেব দিকে ধাবিত হয় এ জানাই কি সব ? কেন  
 পৃথিবীর বুকে প্রতিনিয়ত এই আত্মকেন্দ্রিক লাজনম্রতা ?

এ সব কেনর জবাব ইভা পায়নি, কিন্তু এটুকু সে বুঝেছে যে ওদের  
 পরিচয় এখন যে পর্যায়ে আছে, তাতে এসব কেনর জবাব না জানতে  
 চাওয়াই মঙ্গল—থাক না প্রচ্ছন্ন হয়ে একথা । ও বুঝেছে, ওর থেকে একটু  
 দূরে পাটাতনের ও প্রান্তে ওই যে লাজুক মুখচোরা ছেলেটি আনমনে সিগারেট  
 টানছে, ও বড় অসহায় । হয়তো ইভা পারে, জানতে পারলে, ওর সে  
 বেদনার ক্ষতে প্রলেপ দিতে—কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয় । ওর সব  
 কথা যে সে জানে না, জানা যাবেও না কোন দিন ।

কুশাহুর দিক থেকে জোর করে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল  
 ইভা । গৈরিকবসনা গজার ওপারে কিছুক্ষণ আগে অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য ।  
 দিনের শেষ আলো মিলিয়ে আসছে । চাঁদ ওঠেনি এখনও পূর্ব আকাশে ।

ঝাপসা হয়ে আসছে চারিদিক। একঝাঁক পাখী, গাঙশালিকই হবে বোধ হয়, নৌকার উপর দিয়ে উড়ে গেল পাখা ঝাপটে। আকাশে ধমকে ধেকে আছে বিষম শাস্তির এক মহাসজীত, তার ধুয়োটা ধরে রেখেছে শ্রান্ত জোনাকির মত এক তারাটা। কেন যেন হঠাৎ কারা পেল ইভার। একটা বোবা কারা বুকে চাপ দিচ্ছে ক্রমশঃ। নাঃ, এ কী ছেলেমানুষী, এমনভাবে অহেতুক বিচলিত হয়ে পড়ার মানে কি? অন্তমনস্ক হতে চাইল সে। কথাবার্তায় মনটা ব্যাপ্ত রাখতে হবে। কিছুতেই ধরা দেবে না নিজেকে। আজকের দিনটা ওর জীবনে এক দুর্লভ সঞ্চয়—উষর মরুভূমির মাঝখানে মরুজানের আভাস—কুশাহু জানে না তাব মূল্যের পরিমাণ। কিন্তু ইভা তো জানে আজ তার বুভুক্ষু হৃদয়ের তৃষ্ণা কি ভাবে মিটেছে একটি মানুষকে একটি দিনের সেবার মাধ্যমে। এমন সুন্দর দিনের শেষ প্রান্তে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে না কিছুতেই, তাই আবার নতুন কথার সূত্র তুলে ধরে, আচ্ছা, আমার না হয় সংসারে কোন আকর্ষণ নেই, আমি না হয় সকালে পুডিং বানাই, বিকালে তা কুকুর দিয়ে খাওয়াই—তাই আমার এ দুর্মতি হলেও হতে পারে, কিন্তু আপনি কোন্ আক্কেলে রাজি হলেন এই বানের মুখে গাঙ পার হতে?

সেটিমেণ্টাল কুশাহু ফস করে বলে বসে, আপনি পাশে থাকলে গঙ্গা কেন সমুদ্রও পাড়ি দিতে রাজি আছি আমি!

বলেই লজ্জা পায়। ছি ছি, ইভা কি ভাবল! কিন্তু ইভা যে মোটেই সিরিয়াসলি নেয়নি কথাটা তা বুঝতে পারে তার কথায়। কুশাহু জানে না অনেক পার্টির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইভা এ জাতীয় কন্সিমেণ্টস বহুবার পেয়েছে বহুজনের কাছে। এ কথাও জানে না যে ইভা বুঝতে পারে এটা সে জাতীয় ফাঁকা বুলি নয়। আর তা বুঝতে পারে বলেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠে লঘু করে দেয় কথাটা, বলে, কথাটা বড তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন মাস্টারমশাই, আর আধঘণ্টা পরে বলা উচিত ছিল।

কেন?

আর আধঘণ্টা পরে চাঁদ উঠবে! আজ পূর্ণিমা!

কুশাহু চটে উঠে বলে, আপনি তো ভারী ইয়ে—

ইভা তাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে, চুপ চুপ, অত চোঁচাবেন না; তাহলে মাঝি আপনাকে ব্যারাকপুর থানায় নিয়ে গিয়ে তুলবে।

কুশাহু গলাটি অবশ্য নীচু করে, অবাকস্বরে বলে, কেন, থানায় কেন?

এতক্ষণে বুকচাপা কান্নাটাকে উইংসের আড়ালে ঠেলে দিয়ে রক্তমঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে কোতুকময়ী চটুল ইভা। বলে, মাঝি আমাদের সম্বন্ধে যা ভেবেছে তাতে আপনি-আজ্ঞে একেবারেই চলে না। অত চেষ্টিয়ে যদি আপনি আপনি করেন ও সন্দেহ করবে আপনি বুঝি আমাকে নিয়ে ইলোপ করছেন।

কুশালু লাল হয়ে ওঠে।

কিন্তু না, হার মানবে না সে আজ। একজন অনায়াস অচেনা মহিলার সঙ্গে সে আজ অনায়াসে আলাপ করতে পেরেছে, তার চটুল রসিকতায় মুখে মুখে জবাব দিয়েছে। ধাপে ধাপে অনেকটা এগিয়ে গেছে ইভা। যায় থাক, সে রাশ টেনে থামাবে না তাকে। দেখাই থাক না কতটা দৌড় ওর।

তাই বলে, তবে কি এবার থেকে তুমি-তুমি বলব?

ইভা বলে, চেষ্টিয়ে বললে তাই বলা উচিত।

আর আশ্বে বললে?

ইভা একটা জুতসই জবাব দেবার জন্তই বোধ হয় সময় নেয়। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে কি যেন ভাবে। জবাব দেবার আগেই মাঝি বলে ওঠে, গাঙের গতিক খুব ভাল নয় বাবু।

বাবুকে বললেও কথাটা কানে যায় শুধু ইভারই। বাহাজগৎ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এতক্ষণে। পশ্চিমাকাশেব যে ক্ষুদ্র কালোরঙের মেঘে আড়াল হয়েছিল অস্তুগামী সূর্য, ইতিমধ্যে আকারে সেটা বেড়েছে। ঠাণ্ডা একটা এলোমেলো বাতাস বইতে শুরু করেছে। গাঙের বুকে জেগেছে শিহরণ। কুটি কুটি ছোট ছোট ঢেউয়ের উপর অশান্ত বাতাসের চাবুক আপসানি। ওপারে উঠেছে একটা ধুলোর ঝড়। কারখানার কালো চিমনিগুলো ঢেকে গেল ধুলোর ঝড়ে।

কিন্তু এসব কিছুই নজরে পড়েনি কুশালুর। বাইরের ঝড়ের দিকে তার মন নেই, আছে ভিতরের ঝড়ের দিকে। আজকের সারাটা দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছে সে মনে মনে। একটি পূর্ণঘোবনা নারীর একান্ত সাহচর্যে, তার চটুল রসিকতায় কোতুকবচনে বিদ্ধ হয়েও কোন মনোবিকলন হয়নি তার। কুশালু ভাবতে থাকে হয়তো অহেতুক ভয়ে ভয়ে মরেছে সে এতদিন। নারীভীতিটা হয়তো নিতান্তই রজ্জুতে সর্পভ্রম। রজ্জুতেই বা কেন? পুষ্পমালায়। বুকে তুলে নিলেই দেখবে আর পাঁচটা স্বাভাবিক মানুষের মতই ফুলের সৌরভে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে মন, তার পেলব স্পর্শস্থলে অবশ্য হয়ে আসছে দেহ।

মাঝি বলে, মাঠানকে নিয়ে আপনি ছইয়ের ভিতর গিয়ে বহ্নন বাবু।

কুশাহু বাধা পেয়ে বলে কেন ?

বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে দু-একটা। পালটা ইতিমধ্যেই নামিয়ে নিয়েছে মাঝি। হাওয়া বইছে উন্টো দিক থেকে, নোকা অতি ধীর বেগে অগ্রসর হচ্ছে।

কটা বাজল বাবু ?

কুশাহুর হাতে ঘড়ি নেই। ইভা মনিবন্ধের দিকে তাকিয়ে বলে, ছটা বাজে।

মাঝির মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। প্রাণপণে বৈঠায় টান দেয়। ইভা লক্ষ্য করে দেখে আশপাশে একখানাও নোকা নেই। জ্যেষ্ঠের সন্ধ্যা, কাল-বৈশাখী ঝড় আসা বিচিত্র নয়। ঝড়জল হচ্ছেও মাঝে মাঝে। মাঝ-গাঙ অবশ্য ওরা পার হয়ে এসেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু ওপারের তটভূমি এখনও অনেকটা দূরে। মিনিট পাঁচেক পরেই ইভা অমুভব করল যে, মাঝির আগ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নোকা একতিলও অগ্রসর হচ্ছে না। স্থানুর মত বসে আছে কুশাহু—সে কি আন্দাজ করেছে বিপদটা ? মুখ দেখে বোঝা যায় না কিছু। ঘড়ির দিকে আর একবার তাকিয়ে ইভা বলে, ছটা সাত হয়ে গেল যে। বান এসে পড়বে নাকি, পারে যাবার আগেই ?

দাঁড় ছটো তুলে ফেলেছে মাঝি নোকার গলুইয়ে। ও পাশের ছোট ছেলেটার হাত থেকে হালটা কেড়ে নিতে নিতে বলে, এসে যাবে না মাঠান, এসে গেছেন ! আপনি ভিতরে যান, জোর করে ধরে থাকুন বাবুর হাত। জোর ধাক্কা লাগবে কিন্তুক।

কুশাহু বসেছিল, মাথা তুলে তাকাতেই একটি অপূর্ব দৃশ্য ফুটে ওঠে ওর চোখের সম্মুখে। গঙ্গার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ভীমবেগে ছুটে আসছে গৈরিকবসনা এক উন্মাদিনী ! এ পার থেকে ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত একটা খাড়া পাঁচিল। বহুদূরে রয়েছে এখনও প্রাচীরটা ওর উচ্চতাটা আন্দাজ করা যাচ্ছে না। শ্রাবণরাত্রির মেঘডব্বরুর মত একটা গুরু গুরু গম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসছে দূর থেকে। শিকল বাঁধা একটা বয়াকে আত্মসাৎ করে ফেলল সেই জলপ্রাচীর। কচুরিপানার ভাসমান একটা বড় চাওড তারপর পড়ল তার কবলে—শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মিলিয়ে গেল মুহূর্তে।

মাঝি চিৎকার করে ওঠে, সামাল, বাবু সামাল। উঠে দাঁড়াবেন না,



ভয়ে পড়ল। পাটাতন আঁকড়ে ধরল। ভয় নেই, আমি হাল ধরে আছি।

সে সাবধানবাণী কুশান্নর কর্ণকুহরে প্রবেশ করল না। ও সম্পূর্ণ অতিভূত হয়ে পড়েছিল এই অপূর্ব দৃশ্যের সামনে। স্থির অচঞ্চল নৌকার ছইয়ের ভিতর নয়, বাইরে এসে উঠে দাঁড়াল সে। জলের প্রাচীরটা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। কালনাগিনীর ক্রুদ্ধ গর্জন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এবার। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তটের উপর আঁছড়ে পড়া জোয়ারের ফেনিল আক্রোশ। তটরেখা খুব দূরে নয়। ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে একসার মানুষ। ওদের নৌকার দিকে হাত দেখিয়ে চিৎকার করে ওদের মধ্যে একজন কি যেন বলল। বাতাসের শব্দে ভেসে গেল সে সাবধান বাণী।

ছোট ছেলেটা ঘটিবাটি সামলে বসেছে পাটাতন আঁকড়ে ধরে। ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখে মাঝি শেষবারের মত চিৎকার করে ওঠে, খাপামি করবেন না বাবু। মাঠানকে ধরুন।

মাঠান। তাই তো। সে তো একা আসেনি নৌকায়। তন্নয় ভাবটা কেটে যেতেই ওর মনে প্রশ্ন জাগে কোথায় ওর সঙ্গিনী। মৃত্যুপ্রাচীর এসে পড়েছে অতি নিকটে। পাশ ফিরতেই দেখতে পায় কুশান্ন, ইভা এসে দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশটিতে একেবারে পাঁজর ঘেঁষে।

সেদিকে তাকাতেই ওর হাত দুটি ধরে ফেলে ইভা। হাত ধরা তো নয় আশ্রয় খোঁজা। ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে তার মুখ। জোড়া ক্রর নীচে দুটি ভীত আতঙ্কিত চোখে মৃত্যুভয়ের আঁতি। কুশান্ন দৃঢ়মুষ্টিতে ওর দুটি হাত ধরে প্রায় কানে কানে বলে, ভয় কি ইভা। আমি তো আছি।

ইভার বিশীর্ণ বেপথুমান ওষ্ঠাধরে ফুটে ওঠে দুটি কথা, তুমি, তুমি আমাকে জোর করে ধরে থেক।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মাঝি চৈচিয়ে উঠল—জয়শঙ্কু।

আব পবমুহূর্তে নৌকাব তলদেশে লাগল প্রচণ্ড আঘাত। যেন গজাগর্ভ থেকে অতিকায় একটা প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ ওদের নৌকায় ধাক্কা মারল। একেবারে খাড়া হয়ে ওঠে নৌকাটা, গলুইয়ের মাথায় মাঝিকে নিয়ে। আতঙ্কে যে তুঙ্গশীঘ্রে উঠে মানুষ ভাল-মন্দ উচিত-অনুচিত বোধ হারিয়ে আত্মবক্ষার প্রবণায় আঁকড়ে ধবতে চায় জীবনকে—ইভা এই প্রচণ্ড আঘাতে তেমনিই আত্মহারা হয়ে সবলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুশান্নর বুকের উপর। জড়িয়ে

ধরে তার কণ্ঠ। টাল সামলাতে পারে না কুশানু। ইভাকে বুকে নিয়ে উঠে পড়ে নৌকার উপর।

ওর পেশীবহুল বুকের উপর কতক্ষণ উপুড় হয়ে পড়েছিল, ইভার তা খেয়াল নেই। কুশানু কিন্তু একটি পলকেব জন্মও চেতনা হারায়নি। বিপদ কেটে যাবার পরেও কয়েকটা মুহূর্ত দেরি হয় দৃঢ়বদ্ধ ইভার আলিঙ্গনপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে। নৌকা তখনও হুলছে বেশ, কিন্তু ওরা উঠে পড়েছে জোয়ারের মালভূমিতে।

আচল সামলে নিয়ে ইভা আবার গিয়ে বসেছে তার জায়গায়। দুজনেই ভিজ়ে গেছে একেবারে।

মাঝি তিরস্কার করে বলে, সোণামৌব হাত ধরে বসিয়ে বাথতে পার না, তুমি কেমন মেয়েমানুষ গো মাঠান।

ইভার মুখটা একেবারে বুকের উপর বুকে পড়েছে। কপালের টিপটাই জলে ধুয়ে সারা মুখে লেগেছে নাকি। মুখটা হয়ে উঠেছে টকটকে লাল। কুশানু চুপিচুপি বলে, লাগেনি তো আপনার কোথাও?

মাথা না তুলেই ঘাড়টা নাড়ে ইভা। জানায়, কোথাও আঘাত লাগেনি তার। কুশানু মনে মনে ভাবে ওকে যদি ইভা ঠিক ঐ প্রশ্নটাই করত তাহলে সে কিন্তু অমনভাবে মাথা নাড়তে পারত না। লেগেছে, প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে তার। প্রবল বন্টার চাপে যেমন করে ভেঙে পড়ে বাঁধের আগল— তেমনি করেই ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে গেছে ওর আফসোসের একটা ভাস্কর্য ধারণা।

ভিজ়ে কাপড় বদলাবার আর উপায় নেই। স্টেশনে পৌঁছে কুশানু একবার বলে, শাড়িটা পান্টে নেবেন ওয়েটিং রুমে?

ইভা মাথা নেড়ে জানায়, না।

চটুল ইভা ভিজ়ে যেন চুপসে গেছে। সে বলে, না, আপনি যখন ভিজ়ে পাঞ্জাবিটা পান্টাতে পারবেন না, তখন আর এক যাত্রায় পৃথক ফল হয়ে লাভ কি। বলে না—এটা ছাড়লেই তো সেই টাঙ্গা শাড়িটা পরতে হয়। সেটা কি উচিত হবে? বলে না—এই ধরনের আরও হাজারটা কৌতুকমাথা কথা। শুধু মাথা নেড়েই জানায়, না।

ফার্স্ট ক্লাসের একটা নির্জন কামরায় উঠে বসল ওরা দুজন। কিন্তু নির্জনতাকে আর ভয় করে না কুশানু।

আধ ঘণ্টা আগে কি একটা কথা বলেছিল কুশানু, যেটা নাকি ইভার মতে

আধঘণ্টা পরে বলা উচিত ছিল। এখন সেই স্তম্ভস্বর এসেছে। জানলা দিয়ে রূপালী আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে কামরার মধ্যে। বৃষ্টি-ধোওয়া টাঙ্কের আলো! অনেক কথাই বলতে পারত কুশানু, কিন্তু বলল না। যেন এই চুপ করে থাকারাই এখন সবচেয়ে রোমান্টিক। কথার সৃষ্টি তো এমন চুপ করে থাকার জন্মেই। কথার পরে কথার মালা গাঁথে অপরিচিত দুটি মানুষ দূর থেকে কাছে আসে এমন একটা নীরব প্রহরে মৌন স্তব্ধতায় ডুবে থাকতে।

ইভা সে নির্জন ঘরেও প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, এদিকে সরে আসুন, আপনার পাঞ্জাবিতে সিঁ‌দুরের একটা দাগ লেগেছে—মুছে দিই।

এতক্ষণে লক্ষ্য হয় বুকপকেটের কাছে ক্ষণিক বিহ্বলতার রক্তিম স্বাক্ষরটাকে। খুশী হয়ে ওঠে সে। আজকের দিনটা ওর বিজয়ের দিন। ইভা বহু দিন বহু বার ওর পা টেনেছে। লাজুক কুশানু সহ্যই করে গেছে এতকাল। আজ একটা জুতসই জবাব দেবার তুলভ সুযোগটা সে কিছুতেই ছাড়তে পারল না, বলল, দাগটা শুধু পাঞ্জাবির উপর দিকেই লাগে নি ইভাদেবী, নীচের দিকেও লেগে থাকতে পারে। সেটাকে যখন মোছা যাবে না, তখন এটাও থাক না।

ইভার কর্ণমূল লাল হয়ে ওঠে। কোন জবাব দিতে পারে না। হয়তো কথা বলতেই ভাল লাগছিল না তার। তাই চুপ করে বসে থাকে জানলার কাছে গালটা চেপে। কুশানুও চুপ করে বসে থাকে, রসিয়ে রসিয়ে রোমন্থন করে আজকের সারাদিনের স্মৃতিকে। আজ সে দিগ্বিজয়ী! দিনের শুরুতে নির্জন ঘরে যে মুখরা মেয়েটির উপস্থিতিতে অস্বোয়াস্তি বোধ করতে হয়েছিল, দিনের শেষে তাকে চূড়ান্তভাবে নীরব করে দিয়েছে সে।

ট্যান্ড্রি করে ইভাকে তার খুড়খুড়ের বাসায় পৌঁছে দেওয়ার সময় শুধু বললে, আপনার বাবাকে বলবেন, তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজি আছি।

আর্তস্বরে ইভা বলে, তার মানে?

তার মানে দীর্ঘদিনের একটা ভ্রান্ত ধারণা আজ আমার ভেঙে গেছে। আমি বুঝতে পেরেছি—আমি স্বাভাবিক। আর পাঁচজনের মতই আমি।

ইভা বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করে, কি করে বুঝলেন?

মা গন্ধা আজ আগায় চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মাস দুয়েক হল কলকাতার জল কলেজ সব খুলে গেছে। আরব সাগরের জল এসে পৌঁছেছে চেরাপুঞ্জিতে। নেমেছে ধারাত্রোতে কলকাতায়। পথ-ঘাট ভরে গেছে জলে। তারপর হাক্কা হয়ে এসেছে আবার আকাশ। এই কমাসে কুশানুও বদলে গেছে বেশ। আকৃতিতে না হলেও প্রকৃতিতে।

এতদিন ট্রামে উঠে ওর গতিভঙ্গিটা ছিল নাগাড় অফত্রেক বলের মতই একঘেয়ে। ফুটবোর্ডে পীচ খেয়েই ডানদিকে ভাঙত সে। এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ক্রমে। পারতপক্ষে ফুটবোর্ডে পা দিয়ে বাঁ দিকে তাকাতই না—তাকালেও সামনের একজোড়া সীটের মাথার উপর দিয়ে ফেলত দৃষ্টি। না দেখলেও নিকটবর্তী সীটের অধিবাসীন্দ্রের উপস্থিতি সন্দেহে সে থাকত পূর্ণ সচেতন। সর্ট-ফাইন-লেগের প্রসারিত কর ফিল্ডসম্যানকে চোখে না দেখেও যেমন ভুলতে পারে না ব্যাটসম্যান। ও জানত সেদিকে দৃষ্টিব একটা ছোট খোঁচা তুললেও মারাত্মক পরিণতি হতে পারত তার। হয়তো একট্রাম লোক চীৎকার করে উঠত ‘হাউসডাট!’ হয়তো লেগ-আম্পায়ারের মতই হাতটা তুলে কণ্ঠাঙ্কিত ওঁকে নেমে যেতে বলত।

কিন্তু আজকাল আর অতটা ভয় করে না। আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে ক্রমে। হাত জমে যাওয়া ব্যাটসম্যানের মতই জোরালো হিট করে দেখেছে লেডিস-সীটের দিকে। শুধু চোরা-গ্লাস নয়, সজোর-ছক্ করেও দেখেছে। না, আউট সে হয়নি। বহুবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে দেখেছে ও দিকে। নানান বেশে নানান বয়সের মেয়েকে দেখেছে, দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি একবারও। বুকে খাতা চাপা কলেজের ছাত্রী, বাঁ-হাতে রিস্টওয়াচ বাঁধা আফিসগামীনী, সাদা ঘোমটা বাঁধা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স। লাল-নীল-সবুজ-হলদে রঙের ধনেখালি, শান্তিপুর্ন, মাইশোরী আর কাঞ্চিভরমই নজরে পড়েছে—কাচ অথবা সেলোফেন নয়। খুশীয়াল হয়ে উঠেছে। ওদের একজন অধ্যাপক রোল নাস্তাবেবর বদলে নাম ধরে ডাকতেন। বহুবার শুনে শুনে মিষ্টিনামের একটা মালা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল তার। ‘দীপালী বসু, দীপ্তি রায়, সুলেখা সান্যাল, ছায়া বিশ্বাস’, অথচ ও কাউকে চিনত না। এতদিনে কুশানুর সাহস হয়েছে, সেদিন ভবেশবাবুর ডাকের তালে তালে ও মুখ তুলে দেখল। প্রথম উপলব্ধি করল এই নামের মালায় প্রত্যেকটি ফুল এক-একটি পৃথক সত্তাকে চিহ্নিত করে। ওরা একে একে উঠে দাঁড়িয়ে সাড়া দিল—প্রেসেন্ট স্যার, ইয়েস স্যার, ইয়েস প্রীস।



ও মুখ তুলে তুলে দেখল—দীপালী বসুর বেণী, দীপ্তি বায়ের বুয়কো হল, স্নেহা সান্যালের রক্তিম সীমন্ত আর ছায়া বিশ্বাসের স্রু ক্রেমের চশমা। চিনল সহপাঠিনীদের। ওর ইচ্ছা করছিল সবকটি মেয়েকে নিমন্ত্রণ করে কফি হাউসে, নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দেয়—সবকটি মেয়েকে দল বেঁধে নিয়ে যায় লাইট হাউসে।

মায়ের সাহচর্য পায়নি কুশান্ন। ছোট বোন, বড়দিদি, মাসী পিসী, এমন কি দূর সম্পর্কের একটা পাতানো বউদিও পায় নি বেচারী। পেলে হয়তো এ দশা হত না। মেয়েমানুষ জাতটাকেই ও এড়িয়ে চলত ভয়ে। তার স্কেচবুকে নারীচরিত্রের তাই স্থান হয়নি কোনদিন।

প্রমীলারাজ্যে নাকি পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। তার কনভার্স থিয়োরেমটা মহাকবির পরিকল্পনাতে আসে নি। কুশান্নর মনোবাজ্য ছিল তারই একটা বাস্তব উদাহরণ। শতাব্দীর প্রায় চতুর্থাংশে এমন একটা রাজ্যে বসবাস করে হঠাৎ ঘা খেল কুশান্ন দুটি রমণীর অনধিকার প্রবেশে। দুটি নয় তিনটি। প্রথমত কোতুকময়ী চটুল ইভা, দ্বিতীয়ত অন্তরালবর্তিনী স্বাহা, তৃতীয়ত উইংসেব আড়ালে প্রতীক্ষমানা আইভি। সেদিনের গঙ্গাবক্ষে দুর্ঘটনার পরে ইভাও সবে গেছে নেপথ্যে। স্বপ্নরবাডিতেই থাকে সে। কচিং কখনও এসেছে ঘোষাল সাহেবের বাড়ি, কিন্তু মনে হয়েছে কুশান্নর, সে ঘেন স্নকৌশলে এড়িয়ে গেছে সম্ভাব্য সাক্ষাৎ। কাবণটা ঠিক আন্দাজ করে উঠতে পারেনি। হয়তো সেদিনকার ক্ষণিক বিহ্বলতার জন্মে সে মর্মান্তিক লজ্জিত, হয়তো পাঞ্জাবির তলায়-লাগা রক্তিম চিহ্নটার উল্লেখই সে মরমে মরে গেছে। সঘনো এড়িয়ে চলছে ওকে।

আইভির সম্বন্ধে অবশ্য কিছুই জানে না। ভবতারণ সে প্রসঙ্গ আর তোলেননি। ইভার সঙ্গে তো দেখাই হয় না।

এদিকে স্বাহা মিত্র ওর মনের দুয়ার খুলে দিয়েছে অনেকটা। প্রতি সপ্তাহে দু'তিনখানি চিঠি সে পায়, দু'তিনখানি চিঠি সে লেখে। একটি একটি করে পাপড়ি মেলে ঘেমন করে ফুটে ওঠে পদ্মফুল, বাতাসে বিলিয়ে দেয় আপন স্নগন্ধ—ঠিক তেমনি করেই ওদের পরিচয় ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করছিল। অনেক সহজ হয়ে এসেছে সম্বন্ধটা—আন্তরিক হয়েছে বন্ধুত্ব। গার্ড-ফাইলে স্বাহার চিঠি আর তার উত্তর তারিখ মিলিয়ে পর পর এঁটে রেখেছে। কতবার এগুলো পড়েছে তার ঠিক নেই। এখনও পড়ে। সাম্প্রতিক একখানা

চিঠিতে স্বাহা লিখেছে—তোমার চিঠি পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল, এমন করে নিজেকে ক্ষয় করছ কেন? অতগুলো টুইশানি করতে হবে না তোমাকে। তাহলে পড়াশুনা করবে কখন? ফার্স্ট ক্লাস তোমাকে পেতেই হবে, শুধু তাই নয়, যথেষ্ট পড়বার সময় পেলো তুমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে এতে আমার বিদ্‌মাত্র সন্দেহ নেই। তারপর নিশ্চয় কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেবে— তাই নয়? আমি বলি কি, এক কাজ কর না কুশাহু। আমার কাছ থেকে কিছু ধার নাও। আমার অনেক টাকা, বুঝলে। এমন কিছু লাখ পঞ্চাশ নয়, তবু যথেষ্ট টাকা রেখে গেছেন বাবা, আমাদের তিনজনের জন্ত। টুক্লির বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। মাসীমাই আমাদের গার্জেন—মেশোমশাই জীবিত থাকতেই। দাদা মত দিয়ে চিঠি লিখেছে। বলেছে, সুপাত্র পেলো তার প্রত্যাভর্তনের জন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। বৈকে বসেছে টুক্লিই। এমন বোকা মেয়েটা, জানলে, বলে দিদির বিয়ে না হলে আমি বিয়ে করব কি করে? অনেক করে তাকে বোঝানো হয়েছে। রাজী হয়েছে শেষ পর্যন্ত। ওর বিয়ে মাস-দুয়েকের মধ্যেই দিয়ে দেব। ভাল পাত্র পেয়েছি একজন। দাদা ফিরে আসতে আসতে আমিও পাস করে বের হব। দাদার ইচ্ছে তারপরে আমরা দুজনে এখানেই প্র্যাকটিসে বসি। আমার ইচ্ছে তারপর আমিও একবার বাইরে যাব। একা যেতে যদি সাহস না পাই তুমিও সঙ্গে যেতে পার। তারপর একসঙ্গে দুজনে ফিরে আসব। তুমিও একটা ডিগ্রি-টিগ্রি নিয়ে আসবে। আমি জানি দাদা তাতে আপত্তি করবে না। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। আপাতত তুমি কিছু টাকা ধার নাও আমার কাছ থেকে। টুইশানিগুলো ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ে লেগে যাও বরং পরীক্ষার পড়ায়। শোধ দেবার কথা ভেবে অত ব্যস্ত হয়ে উঠছ কেন এখন থেকেই? কতরকম ভাবেই তো শোধ দিতে পার তুমি। আর কিছু না হোক, পরে যখন চাকরি করবে তখন না হয় ইনস্টলমেন্টে শোধ করে দিও।

কুশাহু মূর্থ নয়। এ চিঠির ছত্রে ছত্রে যে ইঙ্গিত করেছে স্বাহা তার অর্থ বোঝবার মত বাংলা ভাষাজ্ঞান তার আছে। কিন্তু সে তো পাগল নয়! তাই ওর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু না বুঝবার ভান করে লম্বা লম্বা জবাব লেখে। ও-কথা এড়িয়ে যায়!

জগদীশ দে দার্জিলিং থানার সম্প্রতি বদলি হয়ে এসেছেন। মধ্যবয়সী খুরকর ও. সি.। ডিপার্টমেন্টে সুনাম আছে তাঁর। ভবতারণ ঘোষালের প্রিয়-পাত্র। সকালবেলাতেই তিনি একটা ট্রাক-টেলিফোন পেয়েছেন। বড়-কর্তা নির্দেশ দিচ্ছেন বিশেষ প্রয়োজনে তাঁর মধ্যমা কন্ঠাটিকে কলকাতা পাঠিয়ে দিতে। আইভি দার্জিলিংএ একটি কনভেন্ট থেকে সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পড়ে। জগদীশ দে তার লোকাল গার্জেন। সব ব্যাপারেই ঘোষাল সাহেবের নির্দেশ একেবারে স্পেসিফিক। আগামী মঙ্গলবারের সকালের প্লেনে যেন আইভিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জগদীশবাবু বিশ্বস্ত কোন লোক দিয়ে আইভিকে হস্টেল থেকে আনিবে একেবারে বাগডোগরায় প্লেনে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন যেন। দমদমে ভবতারণবাবু স্বয়ং তাকে লুফে নেবেন বাউণ্ডারীর শেষ সীমায় দাঁড়ানো ফিল্ডস্ম্যানের মত। নির্দেশটা প্রাঞ্জল, যদিও প্রাণটা জল হয়ে যায়নি প্রোট জগদীশের। তিনি জানেন যে, ভবতারণ জানেন তাঁর কন্ঠার স্বভাব, এবং আরও জানেন যে কন্ঠাটি প্যারাস্ট ল্যাণ্ডিংএ অভ্যস্ত নয়—তাই এ ব্যবস্থা। জগদীশচন্দ্র এও জানেন যে এইসব আন্-অফিসিয়াল নির্দেশ নিভুল ও যথাযথভাবে পালন করার অর্থ ‘সি’কে ‘বি’ এবং ‘বিকে’ ‘এ’ করা। তিনি নিজেও তা করে থাকেন তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের বাৎসরিক সি. সি. আর-এ! এ জাতীয় আন্-অফিসিয়াল অর্ডার পালন করতে গিয়ে অফিসিয়াল কাজে যদি কিছু গাফিলতি হয় তাতে ক্ষতি হয় না। অফিসিয়াল কাজ অষ্টম খুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে।

তাই সর্বপ্রথমেই তিনি একটা টেলিফোন করলেন এয়ার অফিসে। বুক করতে চাইলেন মঙ্গলবারের সকালের সাভিসের একটি আসন। এয়ার লাইন্সে একটি মেমসাহেব আছেন—তাঁকে যতবারই টেলিফোন করেছেন জগদীশ ততবারই শুনেছেন সীট নেই। অদ্ভুত স্মিষ্ট মহিলার কণ্ঠস্বর, মর্যাদাসিক দুঃসংবাদ দেবার জন্য সদা উত্তত। স্মিষ্টতম কণ্ঠস্বরে তিনি এবারও জানালেন সেই পিতিজালানো বার্তাটি—‘রিগ্রেট, নো এ্যাকোমোডেসান্!’ শুধু মঙ্গল নয়, আগামী তিন দিনের সব আসন পূর্বেই সংরক্ষিত করা হয়েছে। কিন্তু জগদীশ দেও ব্যাঘ্র শাবক! ছুঁদে দারোগা তিনি। পরিচয় দিতে হল তাঁকে, জানাতে হল বিশেষ জরুরী কাজে মঙ্গলবারের সকালের প্লেনে একজনকে কলকাতায় পাঠাতে হবেই। স্টেট এমার্জেন্সি! যার বাড়ী কথা নেই! আসন যদি না থাকে তাহলে মাল কমিয়ে পাউণ্ডেজ ঠিক রেখে একটি অতিরিক্ত

আসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আধঘণ্টা ধস্তাধস্তি করে দু'তিন জায়গায় টেলিফোন করে অবশেষে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হল।

এবার আইভিকে হস্টেল থেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। সকালের ডাকটা দেখা হয়নি, কাল রাত্রে জলা পাহাড় অঞ্চলে একটা সিঁদেল-চুরি হয়েছে। সকালেই থানায় এসে পৌঁচেছে এফ. আই. আর.। লোকজন গ্রীষ্মের ছুটিতে আসতে শুরু কবেছে, আর ওদেরও কর্মতৎপরতা বাড়তে শুরু করেছে। ওখানেও এনকোয়াবিতে কাউকে পাঠাতে হবে। আরও কত কাজ পড়ে আছে। তা যাক, সর্বপ্রথমেই মিস ঘোষালের বখেড়াটা মিটিয়ে ফেলা দরকার। খড়াচুড়া আঁটতে থাকেন জগদীশবাবু।

স্ত্রী মণিমালা কেটলিতে গরম জল ঢালতে ঢালতে বলেন, এখনই বেরুচ্ছ নাকি ?

হ্যাঁ, শুনলে না, ঘোষাল-নন্দিনীকে কলকাতা পাঠাতে হবে।

সে তো মঙ্গলবাবু, এখনই অত উতলা হয়ে উঠলে কেন ?

হাসেন জগদীশবাবু। মেয়েমানুষ, কী বুঝবে! এসব কাজ স্ফটিকরূপে সম্পন্ন করার তাৎপর্যটা বোধবার বুদ্ধি থাকলে বাবো হাত কাপড়েও কাছা দেয় না ? কাজটা সহজ নাকি ? আইভি মেয়েটি কী ধাতুতে তৈরি তা কি বুঝবে ! বাঘের বাচ্চা বাঘই ! আইভিকে তিনি রীতিমত ভয় কবে চলেন—বস্তুত ঘোষাল সাহেবেব চাইতেও বেশী ! যদিও খাতা-কলমে তিনিই নাকি আইভির নোকাল গার্জেন।

মণিমালা পাউরুটি কাটতে কাটতে বলেন, খাবার হয়ে গেছে, খেয়ে যাও।

বেন্ট কষতে কষতে জগদীশ বলেন, আগে মিস্ ঘোষালের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা পাকা করে আসি।

মণিমালা বাকী হাসি হেসে বলেন, সকালবেলা টেলিফোনটা পেয়ে তুমি একেবারে খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠেছ দেখছি। গুনগুন কবে ঠুংরি ভাঁজছ মনে হচ্ছে !

ঠুংরি ভাঁজছি ? বেন্টটা খুলে ফেলে নতুন করে কষতে শুরু করেন জগদীশ।

অভিসারিকা রাধার মত—বেন্টু বন্ধ খুলু-খুলু যায়—হয়ে পড়ছে না ? নিজে দৌড়বাব দরকার কি ? একটা টেলিফোনে বলে দাও না মেজ খিজিকে, ওদের হস্টেলে তো ফোন আছে।



মণিমালা ঘোষাল সাহেবের পরিবারভুক্ত সকলকেই চেনেন। ইভার সঙ্গে অন্তরঙ্গতাও আছে। ঘোষাল সাহেবের তিন কন্যাকে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী নতুন নামে উল্লেখ করতেন জনান্তিকের কথোপকথনে—বড় ধিজি, মেজ ধিজি আর ছোট ধিজি। দার্জিলিঙে আসার আগে জগদীশ ছিলেন দমদমে। তখন ঘোষাল সাহেবের বাড়িতে বছবার গিয়েছেন মণিমালা। বড় ধিজির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে, ছোট ধিজিকেও তিনি স্নেহ করেন—কিন্তু দু' চোখে দেখতে পারেন না এই নেকী অর্থাৎ মেজ ধিজিকে। অথচ ভাগ্যের এমন খেলা, ওঁর স্বামী হচ্ছেন এই মেজ ধিজির অভিভাবক।

জগদীশ বলেন, মেজ ধিজিকে তো চেন না তুমি, তাই রসিকতা করছ। বাপকো বেটি, ওঁর সিপাহীকো ঘোড়ি! দুদিন ধরে তোষামোদ করে যদি রাজি করাতে পারি! রাই বিনোদিনী আদৌ কলকাতা যেতে রাজি হলে হয়। জানি না এখন কার সঙ্গে ওঁর রাসলীলা চলছে। যদি ওঁর লেটেস্ট কেইটি কলকাতাবাসী হন তাহলে হয়তো বায়না ধরে বসতে পারেন, মঙ্গল নয়, সোমবারের প্লেনেই তিনি যেতে চান; আর এই দার্জিলিঙ পাহাড়ই যদি হয় তাঁর বর্তমান বন্দাবন তাহলে বলে বসতে পারেন দার্জিলিঙ পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি!

মণিমালা পাউরুটির উপরে মাখনের পলস্তারা লাগাতে লাগাতে বলেন, তাহলে তুমিও মঙ্গলবারে কলকাতা যাচ্ছ বল?

আমি কেন?

আমার তো ধারণা মেজ ধিজির লেটেস্ট টার্গেট এখন তুমিই। সঙ্গে না গেলে রাই-বব-হেয়ারিণী কি যেতে রাজি হবেন?

জগদীশ হেসে বলেন, অত সৌভাগ্য করিনি। বলেই মনে মনে জিব কাটেন। কথাটা মর্মান্তিক রকমের বেঁফাস হয়ে গেছে। তাই এক চুমুকে চাটুকু শেষ করে মাখন মাখানো রুটির পীসটা হাতে নিয়েই বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়।

জগদীশবাবুর অহুমান মিথ্যা নয়। পিতার আদেশ আত্মপ্রাপ্ত শুনে আইভি শুধু বললে, এ্যাবসার্ড! মঙ্গলবারে আমার যাওয়া হতেই পারে না, ঐদিন বিকালে একটা জরুরী এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

জগদীশবাবু শুকে আপাদমস্তক একবার দেখে নেন। ফ্রকপরা এই খুকাটির তিনি নাকি স্থানীয় অভিভাবক। বয়স কত ওর? বিশ? বাইশ?

আন্দাজ নেই জগদীশের। একবার, মনে আছে মণিমালার একটা বাঁকা ইঙ্গিতের জবাবে উনি বলেছিলেন, কি যে বল তুমি, ও তো আমার হাঁটুর বয়সী। উত্তরে মণিমালা বলেছিলেন, বয়স সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই। তোমার হাঁটুর বয়স বিয়াল্লিশ, তোমার সঙ্গেই জন্মেছে হাঁটুটা। মেজ ধিধি তোমার হাঁটুর বয়সী নয়—তার চেয়ে ছোট, তবু সময়ে বিয়ে হলে তিনজোড়া হাঁটু সেই পয়দা করতে পারত!...সেই ধমক খাওয়ার পর থেকে আইভিব বয়সটা আর কোনদিন আন্দাজ করবার চেষ্টা করতেন না। জগদীশ লক্ষ্য করে দেখেন ফ্রকপরা মেয়েটির মাথায় লাল রিবনের একটা বোঁ বাঁধা, বব-করা খাটো কৌকড়া চুল টাকা-টাকা হয়ে কানের দু পাশ দিয়ে ঊকি মারছে। মাজাটা অস্বাভাবিক রকমের সরু। মুখশ্রী সুন্দর না হলেও ফিগারটি তার সত্যিই অনিন্দ্য। সরু মাজা বেষ্টন করে টাইট-ফিট টকটকে লাল একটা বেন্ট। দেহটাকে যেন ডমরুর রূপ দিয়েছে। সরু মাজার দুদিকে পুরন্ত দেহের আভাস।

দার্জিলিং থানার দুঁদে দারোগা জগদীশ দে আমতা আমতা করে বলেন, এ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্যানসেল কবা যায় না?

একটি শব্দে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেয় আইভি এ প্রসঙ্গের,—এ্যাবসার্ড!

ঘাড়টা চুলকে জগদীশ বলেন, তা হলে তো মুশকিলে ফেললে তুমি। আমি আবার মজলবারে তোমার সীট বুক করলাম যে প্লেনে।

সেটা বদলিয়ে বুধবাবে করুন।

তোমার বাবা আসবেন দমদমে।

তাকে একটা টেলিগ্রাম করে দিন।

জগদীশবাবু মনে হল একবার প্রশ্নটা করে দেখবেন কিনা। অর্থাৎ জরুরী এ্যাপয়েন্টমেন্টটা কোথায়—কাব সঙ্গে? হস্টেলবাসিনী একটি কুমারী-কন্য়ার এমন কী জরুরী এ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকতে পারে? লোকাল গার্জেন হিসাবে এ প্রশ্নটা করা কি অধিকার বহিভূত হবে? ঘোষাল সাহেব যদি ভবিষ্যতে কখনও জানতে চান, কেন মজলবারে আইভিকে পাঠানো গেল না, তখন কী জবাবদিহি কববেন তিনি? কিন্তু প্রশ্নটা করে বসলে আবার কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে না তো? আইভি যদি বলে বসে একজন আমেরিকান ট্রবিস্ট ছোকরার সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সাপ্তাকপু দেখতে যাওয়ার। লোকাল গার্জেন হিসাবে সে কথা শুনেও চুপ করে থাকা কি উচিত হবে ওঁর?

সমস্তার সমাধান হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। আইভি নিজে থেকেই বলে, মঙ্গলবার বিকালে আমার একটা স্কটিং আছে।

স্কটিং ? জগদীশের মুখটা হাঁ হয়ে যায়।

হ্যাঁ, প্রডিউসার তরুণ গুপ্তের সঙ্গে একটা এনগেজমেন্ট আছে। তরুণ গুপ্ত সিঞ্চল লেকে ওর ছায়াসজিনীর একটা সীন তুলবে পরশু, মানে মঙ্গলবার বিকেলে। একজন স্মার্ট একস্ত্রার দরকার তার। আমাকেই সে সিলেক্ট করেছে।

জগদীশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, তোমাকে তিনি চিনলেন কী করে, যে সিলেক্ট করলেন ?

বারে, উই আর ইন্টিমেট ফ্রেন্ডস ! কাল সমস্তটা ছুটির দিন আমরা এক-সঙ্গেই বেড়ালাম যে ! এমন লাভলি স্মার্ট ইয়ংম্যান, কি বলব কাকাবাবু, আমি তো সিম্পলি চার্মড ! আচ্ছা, তরুণ বিকালে আসবে, আপনাদের বাসায় নিয়ে যাব'খন।

বিশ্বয়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে জগদীশের ; 'ছায়াসজিনী'র স্কটিং করছে কি একটা ফিল্ম কোম্পানী, এটা জানা ছিল তাঁর। সিঞ্চল লেকের প্রোটেক্টেড এরিয়াতে ওরা একটা স্ট নিতে চায়, তাই ডি. সি.র কাছে অনুমতি চেয়েছে। সেই প্রসঙ্গে ডি. সি.র অফিসে তিনি দেখেছেন প্রডিউসার তরুণ গুপ্তকে। মধ্যবয়সী গভীর প্রকৃতির রাসভারী মানুষটাকে দেখে 'লাভলি স্মার্ট' বিশেষণ দুটি তো মনে পড়েনি তাঁর ! তবে কি আইভির চোখে মাথাভরা টাক আর পাকা গৌফজোড়াসমেত তিনি নিজেও সিম্পলি চার্মিং নাকি ? গৌফগুলো কণ্টকিত হয়ে ওঠে এ চিন্তায়।

এ বিষয়ে একটু কোতূহলী হয়ে ওঠেন সন্ধানী জগদীশ, বলেন, তরুণবাবু কোথায় উঠেছেন ?

স্নো-পিক্ হোটেলে।

মনে মনে ক্রকুঞ্চিত করেন জগদীশ। তরুণ গুপ্ত পাঁচ-সাতখানা বক্স-অফিস হিট করা ছবি তুলেছেন ইতিমধ্যে। অগাধ পরসাগুয়ানা প্রযোজক। সিনেমা-জগতের নাম করা লোক। তাঁর পদমর্যাদার তুলনায় এভারেস্ট অথবা উবেরয় নামটা শোনবার একটা আশা জেগেছিল মনে। কিন্তু সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য না করে বলেন, বেশ, তাহলে বুধবারের টিকিটই কাটছি আমি। অবশ্য বেশ বেগ পেতে হবে, কারণ বুধবারেও সীট নেই। সে যা হোক, তুমি

তৈরী হয়ে থেক। তোমার বাবাকেও একটা তার করে দিচ্ছি। আমি বরং বুধবারের সীট রিজার্ভ করে তোমাকে টেলিফোনে আর একবার কনফার্ম করব।

দিস্ ইস্ লাইক্ মাই ডিয়ারেস্ট কাকাবাবু! গলে পড়ে আইভি।

শশব্যস্তে উঠে পড়েন জগদীশ দারোগা। কি জানি—‘থ্যাঙ্ক ওল্ড বয়!’ বলে যদি ওঁর গওদেশে একটা চুমুই খেয়ে বসে খুকীটি! ছেলেমানুষের উচ্ছ্বাস তো! কে বলতে পারে!

কর্তব্যে ক্রটি হয় না জগদীশবাবুর। ফেরার পথে স্নো-পিক হোটেলে আসেন একবার। গত সপ্তাহে যে সব বোর্ডার এসেছে তাদের নামের উপর চোখ বোলাতে থাকেন। ম্যানেজার সসকোচে হাত কচলাতে থাকে। আসে চা, ডবল ডিমের অমলেট, গোল্ড ফ্লেক। দক্ষিণ রায় স্বয়ং এসেছেন যখন তখন আঠারো-ঘা হবেই! আগে থেকেই সাবধান হচ্ছে ম্যানেজার। জগদীশবাবুর দৃষ্টি আটকে যায় একটি নামের উপর—পি. কে. নাহা। স্থায়ী ঠিকানার ঘরে লেখা আছে C/o ছায়ামুভি পিক্‌চাস্, রিজেন্ট পার্ক, টালিগঞ্জ। পাঁচ নম্বর ঘরে আছেন তিনি।

খবর নিয়ে জানা গেল মিষ্টার নাহা ঘরেই আছেন। জগদীশবাবু নিজেই যান ওঁর ঘরে। দারোগা সাহেব দেখা করতে এসেছেন শুনে ছেলেটি একটু অবাক হল। খবরের কাগজের ছাপমারা একটা হাওয়াইয়ান সার্ট আর কডের প্যান্টপরা ছেলেটি আপ্যায়ন করে বসায় তাঁকে। বেশ স্মার্ট ছেলে, ফিল্ম লাইনের চালু মাল। দারোগা এসেছে শুনেই ম্যানেজারের মত হকচকিয়ে যায়নি। সিগারেটের টিনটা এগিয়ে ধরে ইংরাজিতে বলে, আপনার জন্তে কি করতে পারি আমি?

জগদীশ ওব তিন দুর্গ-আঁকা সবুজ টিনের গর্ভ থেকে সাদা একটি সিগারেট বার করে নিয়ে বলেন, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ কবতে এলাম।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ঘাড়ছাঁটা ছেলেটি বললে, সো কাইও অফ যু।

আপনি কি বেড়াতে এসেছেন দার্জিলিঙে?

আজ্ঞে না! মশাই, কাজে। একটা স্যুটিঙের কাজে। ছায়ামুভি পিক্‌চাসেঁর ছায়াসজ্জিনী!

আই সী! আপনিই বুঝি হিরো?

একগাল হেসে রোমান নোভারোর মত মুখ করে ছেলেটি বলে, এবারও



আপনার আন্দাজে ভুল হল দারোগাবাবু। হিরো নই আমি, আমি ক্যামেরাম্যান।

জগদীশ কপালে একটা টোকা মেরে বলেন, ডিয়ার মি! ছায়াসজিনী? আপনারা তো সিকল লেকে ছবি তোলার জন্য একটা দরখাস্ত করেছেন না?

ছেলেটি হেসে বললে, এক্সকুজি, থ্যাঙ্কস্ টু য়োর ভিজিটেশন—ভারি নীট কবে রেখেছেন লেকটাকে আপনারা। স্পটটা দেখেই আমার লোভ হয়েছিল এখানে একটা সট নিতে হবে। ইন ফ্যাক্ট, এ স্টান্ট ছিল না। ক্লীপে—আমি জোর করে এটা এনসার্ট করে দিলাম। এবার ওকে দেখাচ্ছে অনেকটা সত্যজিভের মত—আউটডোর স্যুটিংয়ের একটা বহির্দৃশ্যের মুহূর্তায় বিহ্বল পরিচালকের মত।

আপনাদের প্রডিউসার তরুণবাবুও এসেছেন নাকি!

না, গুঁরা কালকের প্লেনে আসবেন। আমরা কয়েকজন এ্যাডভান্স পার্টির লোক আগেই চলে এসেছি। ওসব ডাইবেক্টার প্রডিউসার কিছু নয় মশাই, যন্ত্রটা তো আমার হাতে!

তা তো বটেই। কিন্তু ছায়াসজিনীর ক্যামেরাম্যানের পদবী তো ‘নাহা’ নয়—কি যেন নামটা ভুল্লোকে, ঠিক মনে আসছে না—

জয়ন্ত তরফদার!

এক্সকুজি। আপনি তাহলে—

আমি তাঁরই এ্যাসিস্টেন্ট। বললে ছেলেটি এ্যালেক গুইনেসের মত সিরিয়াস মুখ করে।

আই সী, এ্যাসিস্টেন্ট ক্যামেরাম্যান আপনি! কত মাইনে পান?

নাহার মনে হল প্রশ্নবান নয় হাতের ঘাভুসটা ছুঁড়ে মেরেছেন এবার দারোগাবাবু। এরল ফ্রিনের ভঙ্গিতে বাও করে ডুয়েলের এনগেজমেন্টটা এখন করে ফেলা উচিত; তা কিন্তু করল না সে। কান দুটো একটু লাল হয়ে ওঠে ছোকরার। ঢোক গিলে বলে, সরাসরি এ প্রশ্নটা করা কি একটু আনশ্চিভালরাস হয়ে যাচ্ছে না স্যর?

জগদীশ হেসে বলেন, পুলিশের চাকরিতে ঐ তো অস্ববিধা মিষ্টার নাহা—আপনার জবাব শোনার পরে আমাকে আবার একটি প্রশ্ন করতে হবে—এক টিন থি-কাস্‌ল সিগারেটের দাম কত!

মূল ত্রেনারের মত উদ্ধত ভঙ্গিতে ছেলেটি বড় বড় চোখ করে বলে, পুলিশের

চাকরি করেন বলে একের পর একটা অভদ্র প্রশ্ন করবার অধিকার আপনার থাকতে পারে, কিন্তু দেড়শো টাকা মাইনের এ্যাসিস্টেন্ট ক্যামেরাম্যানও স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক। জবাব দিতে সে বাধ্য নয়।

ওঁর থি-কাসল সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে জগদীশবাবু বলেন, নয়ই তো! স্বাধীন দেশের নাগরিক যখন তখন নিজেকে তরুণ গুপ্ত বলে বাঙ্কবীদের কাছে পরিচয় দেবার স্বাধীনতাও আপনার থাকা উচিত।

একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে যায় পি, কে, নাহা।

জগদীশবাবু গম্ভীর হয়ে বলেন, আর প্রশ্ন কিছু করব না, শুধু একটা খবর দিয়ে যাব তোমাকে। আইভি নামে যে মেয়েটির সঙ্গে মঙ্গলবার বিকালে তোমার, অর্থাৎ প্রডিউসার তরুণ গুপ্তের সিঙ্কল লেকে বেড়াতে যাবার কথা সে বেঙ্গল পুলিশের ভবতারণ ঘোষালের মেয়ে। ভবতারণ ঘোষালের নাম শুনেছ? সিভিল লিফ্ট খুলে দেখ—আরক্ষা বিভাগে প্রথম পাতাতেই নামটা পাবে!

বব হোপ কে চেনেন না জগদীশ, তাই নাহার ড্যাভড্যাভে চোখ দুটোকে মরা পাবদা মাছের মত বলে মনে হল তাঁর।

উইথ য়োব পার্মিসন, বলে আর একটা সিগারেট তুলে নিয়ে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন জগদীশবাবু।

থানায় ফিরে আবার টেলিফোন তুলে নিতে হল। এয়ার অফিসের সেই মধুকণ্ঠ মেমসাহেব ধরলেন ও প্রান্তে। না, মঙ্গলবার নয়, বুধবারের সকালে তাঁর একটি সীট চাই। এখন আর নতুন করে ব্যবস্থা করা যাবে না? যেতেই হবে। স্টেট এমার্জেন্সি! বুধবারে কোন গোবেচারী ধবনেব যাত্রীকে মঙ্গলে ঠেলে দিয়ে সীট খালি কর।...তা অসম্ভব? তা হলে বুধবারের প্লেনের লাগেজ কমিয়ে একটা বাড়তি প্যাসেঞ্জার নেবাব ব্যবস্থা করা হোক।...ই্যা, ডি,সি,র লিখিত অর্ডার পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা তিনি করবেন।...কি? মঙ্গলবারের সেই ভেকেন্ট সীটটা? যা ইচ্ছে করতে পারেন ওঁরা। না না না, সেটার আর দরকার নেই। কতবার বলতে হবে এককথা।

ব্যবস্থাটা পাকা করে একটা স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি।

এইবার ডাক-ফাইলটা দেখতে হয়। কিন্তু না, এখনও দুটো কাজ বাকী আছে, প্রথমত ঘোষাল সাহেবকে একটা টেলিগ্রাম করে বুধবারের কথাটা জানানো, আর দ্বিতীয় আইভিকে টেলিফোনে কনফার্ম করা। তৎক্ষণাৎ

টেলিগ্রাম ফর্মে খবরটা লিখে একটা সেপাইয়ের হাতে সেটা ডাকঘরে পাঠান;  
আর টেলিফোন তুলে ওদের হস্টেলের নম্বরটা চাইলেন। ও-প্রান্ত থেকে মিষ্টি  
গলায় ভেসে এল—হ্যালো?

জগদীশ ইংরেজিতে বলেন, দয়া করে একবার আইভি ঘোষালকে  
ডেকে দেবেন? আমি তার লোকাল গার্জেন কথা বলছি।

ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল, ডিয়ার মি! কে কাকাবাবু? আমি  
আইভি। আপনাকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম। শুনুন। এই মাত্র স্নো-  
পিক হোটেল থেকে তরুণ ফোন করে জানাল মঙ্গলবাবের প্লেনেই তাকে  
কলকাতা যেতে হচ্ছে। তাই এ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্যানসেল করল সে। সুতরাং  
টিকিট বদলাবার আর দরকার নেই আপনি মঙ্গলবার যাবাবই ব্যবস্থা করুন।

আমতা আমতা করে জগদীশ বলে, কিন্তু এখন তো আর তা হয় না।

নিশ্চয়ই হবে। ভারি নটি আপনি, আবদেরে গলায় আইভি বলতে  
থাকে, তখন যেই বললাম, মঙ্গল নয় বুধে যাব, অমনি বললেন তা হয় না।  
এখন যেই বলছি, বেশ আপনার কথাই থাক মঙ্গলেই যাব, অমনি আবার  
বলছেন তা হয় না। তরুণের সঙ্গে একসঙ্গে গেলে একটা সঙ্গী পাই, তা  
আপনার সহ হয় না।

এবার দৃঢ়স্বরে জগদীশ বলেন, তরুণ গুপ্ত মঙ্গলবারেব প্লেনে কলকাতা  
যাচ্ছেন না, আর গেলেও তাঁর সঙ্গে যেতে হবে না তোমাকে।

ও পাশ থেকে ভেসে আসে এক ঝলক খিলখিলে হাসি, বাই জোভ!  
আর যু জেলাস অফ হিম?

কানটা ঝাঁ ঝাঁ কবে ওঠে জগদীশেব। কী জবাব দেবেন স্থির কবে  
উঠতে পারেন না।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে মণিমালা এসে বলেন, কাকে ফোন করছ?

তৎক্ষণাৎ বিসিভার নামিয়ে বাথেন জগদীশ দারোগা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখন তাকে একবার ভবতারণবাবুর কাছে যেতে হবে।  
ইলাকে পড়াতে। উপায় নেই। এইটেই তার অর্থোপার্জনের গ্র্যাণ্ড ট্রাক  
রোড। অর্থসাহায্য তাকে করতে চেয়েছেন ভবতারণ, চেয়েছে স্বাহা।  
টাকা ধার দেওয়ার প্রস্তাব। ধার নয়, দাদন! রাজী হতে পারেনি। এই  
টুইশানির নৌকার উপর ভর দিয়েই এম, এ, পরীক্ষাব সমুদ্র পার হতে চান

সে। কোন দায় রাখতে চায় না। না হলে কবে সে ছেড়ে দিয়ে আসত এই মানিকর দায়িত্ব।

এমন একদিন ছিল যখন ক্লাশের শেষ পিরিয়ড থেকেই উসখুস করত মনটা। চারটে থেকে ছটা এই দু ঘণ্টা কিছুতেই কাটতে চাইত না। পথে পার্কে এখানে সেখানে কাটিয়ে দিত। কখনও হাঁটতে হাঁটতে চলে আসত এসপ্ল্যানেন্ড পর্যন্ত, সেখান থেকে বাস ধরে হাজরা রোড। কখনও ক্লাশ ভাঙতেই চলে যেত বেলভেডিয়ারে। ক্লাশনাল লাইব্রেরীতে বসে বই পড়ত ঘণ্টা দেড়-দুই। তারপর হেঁটেই চলে আসত ঘোষাল-লজে। ইলা এসে বসত বইখাতা নিয়ে। কুশানু ওর ট্রান্সলেশন কারেক্ট করত, আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখত দরজার জোড়া হাতি আঁকা শাস্তিনিকেতনী পর্দাটার দিকে—কখন হুলে ওঠে সেটা ওর হৃদস্পন্দনের তালে তালে। সাতটা পর্যন্ত পড়াবার কথা, কিন্তু পড়ানোর অজুহাতে গল্প করতে করতে আটটা নটাও বেজে যেত প্রায়ই। দু একদিন রাতের আহারও করে যেতে হয়েছে। আপত্তি জানিয়েছে কুশানু, কিন্তু সে আপত্তি ধোপে ঢেকে নি। ইভা হয়তো বলেছে, আজ রাতে যে আমাদের মাংসের হাঁড়ি কাবাব হয়েছে সে কথা তোমার মাস্টার মশাইকে বলনি তো ইলু?

ইলা অবাক হয়ে জানতে চেয়েছে কেন, বললে কি হয়?

ওঁকে খেয়ে যেতে বললে তো খাবেন না, অথচ লোভ নিয়ে যাবেন। মাঝের থেকে হাঁড়ি-কাবাব হজম হবে না আমাদের।

ইলা মাস্টারমশায়ের পক্ষ নিয়ে হয়তো বলেছে, মাস্টারমশাই তোমার মত লোভী নন।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু মুখ নীচু করে কুশানুকে নীরবেই দেরাহ্ন চালের ভাত খেয়ে যেতে হয়েছে হাঁড়ি কাবাব দিয়ে মেখে।

আজকাল সে রকম ঘটনা ঘটলে কুশানু নিশ্চয়ই নীরবে সহ্য করত না এ স্নেহের অত্যাচার। ইভাকে হয়তো প্রশ্ন করে বসত, মাস্টারমশায়ের মধ্যে যে একজন লোভী লোলুপ আত্মগোপন করে আছে সে কথা আর কেউ বুঝতে না পারলেও আপনি কি করে টের পান ইভা দেবী?

কিন্তু এখন আর সে পরিবেশ নেই। এখন ও বাড়িতে যেতেই ইচ্ছা করে না। শবুর একটু সেরে ওঠায় ইভা তাঁকে নিয়ে ফিরে গেছে শ্রীরামপুরে। শবুরের কাছেই থাকে সে আজকাল। কুশানুর অনেকবার ইচ্ছা হয়েছে



কোন এক রবিবারে গিয়ে খবর নিয়ে আসে, অথবা চিঠি লেখে কিন্তু সফোচে মন স্থির করে উঠতে পারেনি। এদিকে ভবতারণবাবুও কেমন যেন নিরাশঙ্ক হয়ে পড়েছেন সাংসারিক বিষয়ে। জনশূণ্য বাড়িতে ইলাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্ত একদিন নৈতিক একটা দায়িত্ব বোধ করেছিলেন ঘোষাল সাহেব, আজকাল তাও করেন না। কারণ ইলা এখন একা নেই বাড়িতে। ইভা না থাকলেও আছে আইভি।

আইভি! এই মেয়েটির উপস্থিতিই কুশানুর মনে সজ্জার করেছে তার সাক্ষ্যবৈঠকের প্রতি একটা বীতশ্রদ্ধা। মনে আছে তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা। সেদিন সাক্ষ্যবেলা পড়াতে এসে দেখে বাইরের ঘরে কেউ নেই। পর্দা সরিয়ে লাইব্রেরী ঘরে এল কুশানু। যে টেবিলে বসে সে নিত্য পড়ায় ইলাকে, সেই টেবিলের পাশেই একটা ইজিচেয়ারে বসে একটি অপরিচিতা মেয়ে একথানা ইংরেজী সিনেমা সাপ্তাহিকের পাতা ওলটাচ্ছে। দেখেই চিনতে পেরেছিল কুশানু—এ আইভি, ইলার মেজদি। গাঢ় ভায়োলেট রঙের একটা লাইলনেব শাড়ি পরেছে, গায়ে ওই রঙেরই একটা খাটো জ্যাকেট। নীলবীজের কাছে অনেকটা অনাবৃত। শাড়ি ও ব্লাউজ এত পাতলা যে অধোবাসের হেম শেলাই পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়—গোলাপী রঙের সায়ার অতি সূক্ষ্ম চিকনের কাজটাও। মাথায় কার্ল-করা ছোট বব-চুল। বাঁ হাতে পাথর বসানো একটি সফ্র ব্রেসলেট, ডান হাতে একসার কাঁচের চুড়ি।

ঘরের কাছে পদশব্দ শুনে বই থেকে মুখ তুলে তাকায়।

ওর নিজের যখন দৃষ্টিবিভ্রম হয় তখন ওর সামনে দাঁড়ানো মেয়েটির মনে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হয় জানবার একটা কোতূহল ছিল কুশানুর। ইচ্ছা ছিল জানতে, কেউ যদি অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে তাহলে দৃষ্ট ব্যক্তির কেমন অনুভূতি হয়। সে কোতূহল ওর চরিতার্থ হল এতদিনে। শুধু দৃষ্টি দিয়ে যে একটা মানুষকে গিলে খাওয়া যায়, তা এই প্রথম অনুভব করল। বুঝল, কেন বহুদিন আগে একটি বিচলিত বামার বামহস্ত অতর্কিতে স্পর্শ করেছিল তার গণ্ডদেশ!

মিনিটখানেক কেউ কোন কথা বলেনি। কুশানু অবাক হয়ে ভাবছিল, এই মেয়েটির সজ্জার প্রতিটি আয়োজনের মূল প্রেরণা আবরণ নয়—উন্মাদন! ঘোঁষনপুষ্ট দেহের স্বতঃবিজ্ঞানেও যেন সে সজ্জা নয়, কিছুটা আগার-লাইন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রসাধন করেছে সে। ওর রক্তিম গালে, ঠোঁটে, ওর

চুনী-বসানো জড়োয়া হুলের দোলানিতে, ওর হাতকাটা জ্যাকেটের স্বচ্ছতার ঘোবনের আমন্ত্রণ। এতদিন ‘ওপেক’ জিনিসকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বচ্ছ হতে দেখেছে সে, অথচ এই প্রায়স্বচ্ছ বস্ত্রাচ্ছাদিতা তো তার চোখে বুলিয়ে দিতে পারল না কোন মোহাঙ্গন! যা দেখছে, তাই সে দেখছে—দৃশ্যের অতীত কিছু দেখছে না!

কাকে চাই?

ইলাকে।

সরি, সে তো বাড়ি নেই।

বাড়ি নেই? কখন ফিরবে?

ফিরতে রাত হবে, কেন বলুন তো?

না থাক, আমি যাই।—ফেরবার জন্ত প্রস্তুত হয় কুশানু। চলে আসে ড্রইংরুমে। মেয়েটি পিছন থেকে বলে, কোন খবর থাকলে আমাকে বলে যেতে পারেন। আমি হচ্ছি—

বাধা দিয়ে কুশানু বলেছিল, জানি, আইভি দেবী, ইলার মেজদি।

এক্সাক্টলি। কিন্তু আমি তো ঠিক, মানে—

আমার নাম কুশানু রায়। আমি ইলাকে পড়াই।

বাই জোভ! চমকে ওঠে আইভি, আপনার কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু আমার ধারণা ছিল, আই মীন—। ইভা তো আমাকে চিঠিতে—

কী ভেবে থেমে গিয়েছিল আইভি।

আচ্ছা, আমি চলি, পরে আসব।

কেন, বসুন না। ওরা এখুনি ফিরে আসবে।

কুশানু হয়তো বসেই যেত, কিন্তু মতটা পালটাতে বাধ্য হল আইভির পরবর্তী যোজনাতে—ইভাও এসেছে কাল শ্রীরামপুর থেকে, সেও এসে পড়বে।

আইভির মুখে কোন চটুলতার অভিব্যক্তি নেই, তবু কুশানু কেমন যেন অস্বোয়াস্তি বোধ করে। বলে, আপনিও যাননি যে ওদের সঙ্গে?

গাঁয়ের মানুষ শহরে এসেছি তাই। ওরা বাজারে গেছে, আমি সিনেমার টিকিট কেটে বসে আছি।

বাম মনিবন্ধের দিকে একবার তাকাল আইভি। কুশানু লক্ষ্য করে দেখে ওটা ব্রেসলেট নয়, পাথর-বসানো একটা সোখিন হাতঘড়ি। সেটার দিকে

একনজর দেখে আইভি শেষ করে তার বক্তব্য, ছটা বেজে দশ, জয়ন্ত তাহলে এল না। নষ্টই হবে টিকিট ছুটো।

কুশানু একটু ঘনিষ্ট হবার চেষ্টা করে, কোথায় যাচ্ছিলেন আপনারা?

নিউ এম্পায়ারে। ম্যান এ্যাণ্ড ওম্যান। দেখেছেন বইটা? বসুন না।

এবারও আসন গ্রহণ করে না কুশানু, বলে, না।

এক কাজ করলে কেমন হয়? জয়ন্তকে জব্ব করা যাক। যেমন লেট করেছে তেমনি শাস্তি হবে। চলুন, আমরা দুজনেই দেখে আসি বইটা।

কুশানু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। জয়ন্ত কে তা সে জানে না। সময়মত হাজিরা না দেওয়ায় তার অন্তায়টা নিশ্চয়ই গুরুতর। কিন্তু এক মিনিটের আলাপে এ মেয়েটির তরফের এ আমন্ত্রণ শুধু দুঃসাহসিকই নয়, বোধ হয় আরও কিছু। কুশানুর মনে পড়ল, একদিন এই মেয়েটির সম্বন্ধেই সে ইভাকে বলেছিল, আপনার বাবাকে বলবেন, তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজি আছি।

কি, যাবেন?

কুশানু জবাবে বলে, মাফ করবেন। আমার অন্য একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

নমস্কার করে চলে গিয়েছিল সে।

সেই প্রথম সাক্ষাৎ।

তারপর এ কয়দিনে বারে বারে তাকে সম্মুখীন হতে হয়েছে এই অতি-আধুনিক মেয়েটির। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। অধিকাংশ সময়েই সফলকাম হয়নি। ইভার সঙ্গে এবারও দেখা হয়নি। পরদিন সে নাকি আবার ফিরে গেছে শ্রীরামপুরে। কুশানুকে রোজ আসতে হয় সন্ধ্যাবেলায় ইলাকে পড়াতে। তার তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত প্রত্যাখ্যান উপেক্ষা করেও আইভি জানিয়েছে তার ঔৎসুক্য। আলাপ করতে চেয়েছে, অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছে। স্বকোশলে এড়িয়ে গেছে কুশানু। যে নারী-ভীতিটাকে ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছিল বেচারি, সেটা যেন আবার ফিরে আসছে ওর মনে। আগের মতই ইলাকে পড়াতে পড়াতে জোড়া হাত-আঁকা শান্তিনিকেতনী পর্দার দিকে তাকিয়েছে চকিতে—তবে প্রত্যাশার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নয়—আতঙ্ক-তাড়িত চাউনিতে। আইভির সামনে দাঁড়ালেই কুশানু অনুভব করে সেই বিচিত্র অস্বাভাবিক অমুভূতি। পায়ের পাতা থেকে একটা সিরসিরানি শিরদাঁড়া বেয়ে যেন উপরে উঠতে থাকে। গলার ভিতরটা

শুকিয়ে ওঠে—জিবটা আঠা আঠা লাগে। ওর ভয় হয়—এই বুঝি মিলিয়ে যেতে শুরু করে ওর অজাবরণ! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে দুর্ঘটনা ঘটেনি একদিনও।

কুশানু আশা করেছিল, সে আইভিকে বিবাহ করতে রাজি এ কথা জানার পর আরও সহজ হয়ে পড়বে ইভা। তার রসিকতা হবে আরও চটুল। তা কিন্তু হয়নি। বেচারি কুশানু! কারণটা সে অনুমান করতে পারেনি।

ভবতারণবাবু তেমনিই আছেন। সংসারের কোন কথায় নেই। ফলে, পরিত্রাণের আর কোন পথ ছিল না কুশানুর। একদিন অবশ্য ভবতারণ শুকে জনান্তিকে বলেছিলেন, আমি ইভার কাছে শুনেছি সব কথা। উই নিড্‌ন্ট হারি। ও স্বভাবত স্বেচ্ছাচারী। আমবা যদি এই প্রস্তাবটা সাজেস্ট করি তাহলে ও রিভোল্ট করবে। অথচ আমার মনে হয় সে নিজেই একদিন তুলবে কথাটা। উই মাস্ট ওয়েট!

কুশানু কুণ্ঠিত হয়ে বলে, কিন্তু আমি ভাবছিলাম—

বাধা দিয়ে ভবতারণবাবু বলেন, জানি। তোমাদের স্বভাবে আসমান-জমিন ফারাক। কিন্তু কি জানি কুশানু, মানুষকে অত সহজে চেনা যায় না। আমি বলছি তোমাকে—সাপের খোলসের মতই আইভির এই চটুলতা একেবাবে বাইরের জিনিস। সংসারে ঢুকে ওর পক্ষে সে খোলস ত্যাগ করা মোটেই অসম্ভব হবে না।

কুশানু মনে মনে হাসে। ভাবতাবণবাবুর উপমাটা সার্থক। উপমান আর উপমেয়ের যতদূর সাযুজ্য টেনেছেন ভাবতারণ তার চেয়েও বেশী সার্থক। চটুলতা হয়তো নির্মোকেব মতই একদিন ঝেড়ে ফেলবে আইভি সংসারে প্রবেশ করে, কিন্তু খোলস ছেড়ে যে বেরিয়ে আসে সে তো কালনাগিনী!

কুশানু শুধু বলে, আমি ভেবে দেখেছি, আমার পক্ষে ওটা সম্ভব নয়।

জবাব দেননি ভবতারণ।

মেসে ফিরে এসে কুশানু দেখে তার চিঠির জবাব এসেছে। স্বাহা লিখছে, ‘পূজার ছুটি তো এসে গেল। এবার পাটনায় আসবে ছুটিতে? আমাদের কলেজও বন্ধ হবে আর দিন কুড়ির মধ্যেই। টুকলির বিয়েটা প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। হয়তো পূজার আগেই হয়ে যাবে বিয়ে। হলে কলকাতাতেই হবে।



তাহলে আমিই অবশ্য আগে যাব কলকাতায়, সেখানেই দেখা হবে দুজনের।  
যদি না হয় তাহলে আমি আর কলকাতায় যাব না। তখন তোমাকেই এখানে  
আসতে হবে কিন্তু। এখানে বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই। তোমাকে  
এখানকার সব কিছু দেখিয়ে দেব যত্ন করে। মিউজিয়াম, সেক্রেটারিয়েট,  
গোলঘর, গান্ধী ময়দান, শহীদ বেদী, স্মরণ হল রাজগীর, নালন্দাও।  
এতগুলো দেখবার জিনিস থাকতেও লোভ হচ্ছে না তোমার ?

আমার কিন্তু হচ্ছে। আমি অবশ্য একটি জিনিসই দেখতে চাই এই  
স্মরণে।

সত্যি কুশাল, আমি আশ্চর্য হয়ে যাই তোমার কথা ভেবে। এতদিনেও  
তুমি ঘুণাক্ষরে জানতে চাওনি আমি কালো না ফরসা, দীর্ঘাকী না খর্বকায়া।  
তোমার কোতূহল হয়নি জানতে, আমি ডীপ রঙের শাড়ি পরতে ভালবাসি,  
না হালকা রঙের। চোখে আমার চশমা আছে অথবা নেই। হয়তো আমার  
চেহারার সম্বন্ধে তোমার কোনও আগ্রহ নেই, কোতূহলের অভাব। আমার  
কিন্তু ও বিষয়ে ভীষণ ঔৎসুক্য। আমার ধারণা, তুমি বেশ লম্বা ; শার্ট-প্যান্টের  
চেয়ে ধুতি-পাঞ্জাবিতেই তোমাকে ভাল মানায়, যদিও তুমি সাহেবি পোশাকটাই  
পছন্দ কর। চুলগুলো তোমার পিছনে ফিরানো, সিঁথি আছে কি নেই।  
চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। গৌফ তুমি রাখ না ( গুঁফো-মানুষ  
আমি কিন্তু ছ'চক্ষে দেখতে পারি না। তার মানে এ নয় যে পাটনা আসার  
আগে তোমার গৌফ কামিয়ে আসতে হবে )।

অনেক আজীবাজে কথা লিখছি, তাই নয় ? কিন্তু সত্যি আজ যেন  
কেমন করে মনের বাঁধন ছুটে গেছে। বৃষ্টি-বাদল থেমে গেছে এ পাড়ায়।  
মেঘলা ভাঙা আশ্বিনের মিঠে মিঠে রোদ উঠেছে এখানে। মন-কেমনের  
একটা উন্মুখ হাওয়া বইছে সকাল থেকে। সত্যি, ভীষণ দেখতে ইচ্ছে  
করছে তোমাকে। আসবে তুমি পাটনায় কদিনের জন্যে ? নেহাৎ যদি না  
আসতে পার কোন কারণে তাহলে একখানা ফটো পাঠিও। আমিও তোমার  
জন্যে একটা সারপ্রাইজ তৈরি করেছি। কাল এখানকার একটা স্টুডিওতে  
নিজের একখানা ফটো তুলেছি। ছ'একদিনের মধ্যেই পাব ফটোটো।  
আমার বিশ্বাস, হয়তো আমার সম্বন্ধে তোমার কোতূহলও সমান—যা লাজুক  
তুমি, তাই হয়তো জিজ্ঞাসা কর না কিছু। সত্যি নয় ? ফটোখানা হাতে  
পেলেই বুঝতে পারবে তোমার মানসীর সঙ্গে তার কতদূর মিল, মানে অমিল !

বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথায় আসা যাক। তোমার চিঠিতে তুমি লিখেছ যে মাঝে মাঝে তুমি একটা ভিশান দেখতে পাও। জিনিসটা খুলে লেখনি তুমি। আমার ভীষণ কৌতূহল হয়েছে ঐ বিষয়ে। ব্যাপারটা কি? দৃষ্টিবিভ্রম হলে কী দেখতে পাও তুমি? তুমি লিখেছ দৃষ্টিবিভ্রমের মুহূর্তে কি দেখি সে কথা কাউকে বলা যায় না, বান্ধবীকে তো নয়ই। আমি তা বিশ্বাস করি না। আমাকেও বলা যায় না? চাক্ষুষ সম্পর্ক তো তোমার সঙ্গে নেই আমার। তাহলে আর আমার কাছে চক্ষুজ্জ্বা কিসের? আমার মনে হয় কোন একজনের কাছে কথাটা খুলে বলতে পারলে হয়তো তোমার ও রোগ সেরে যাবে। মনের গোপন কথা অনেক সময়ে মন খুলে প্রকাশ করতে পারলে মনটা হাল্কা হয়, মনের অস্থখ সেরে যায়। তুমি আমার বন্ধুত্ব স্বীকার করেছ; বস্তুত আমাদের সম্পর্কটা এখন ‘বন্ধুত্বের’ চেয়েও মধুরতর কোন শব্দের দ্বারা সূচিত করার সময় এসেছে। তাই আমি আন্তরিকভাবে আশা করব যে উত্তরে তুমি অকপটে জানাবে সব কথা। হয়তো সেক্ষেত্রে তুমি কয়েকটা সর্ত আরোপ করতে চাইবে। প্রথম কথা এর গোপনীয়তা, অর্থাৎ এ কথা আমি দ্বিতীয় কাউকে বলতে পারব না। সে সর্ত মেনে নিলাম। হয়তো আরও কঠিন (সত্যিই তোমার তরফে কঠিন নাকি? আমার তরফে তো নয়) কোন সর্ত আরোপ করতে চাইবে। জেনো, আমি সে সত্যেও রাজি। (এমন কি তোমার গোঁফ থাকলেও!)। একটু রোমাঞ্চিক হয়ে গেল, নয়? অনেকটা সেই ‘গোড়ায় গলদে’র বিনোদবিহারীবাবুর মত। রোমাঞ্চিক হলেও আমি শ্রদ্ধা করি ভদ্রলোকের দুঃসাহসকে। আমিও বলি : এস কুশানু, রাখ জীবনটা বাজী, তারপর হয় রাজা, নয় ফকির !

আবার পাগলের মত বাজে বকতে শুরু করেছি। মনটার যে আজ কী হয়েছে! মাঝে মাঝে কেন এমন হয় বল তো? আজ ইচ্ছে হচ্ছে আমার সব কথা তোমাকে ডেকে শোনাই, রেখে-ঢেকে নয়—একেবারে মন উজাড় করে।

এখানেই শেষ করছি। একটা কথা। পূজার ছুটিতে যদি না আস, ফটো যদি না পাঠাও, ভাল যদি না বাস—তাহলে নিশ্চয় রাগ করব, ঝগড়া করব, হয়তো বন্ধ করব পত্রালাপ; তবু তার আপোস হবে একদিন। কিন্তু উত্তরে যদি ‘দৃষ্টিবিভ্রম’ জিনিসটাকে না পরিষ্কার কর তাহলে সত্যিই আড়ি করে দেব চিরদিনের মত। আমার মনের অবস্থাটা তোমার পক্ষে

করনা করা শক্ত নয়। তোমার নিজেরও একদিন ঐ রকম দশা হয়েছিল। তাই তোমার ভাষাতেই বলছি, মনোবিকলনের মুহূর্তে তুমি যাকে দেখতে পাও তার পূর্ণ পরিচয় যদি এবার না জানাও, তাহলে এর পর থেকে ফুলেশ্বরী অশ্রু লিপিকারে কাছে যাবে চিঠি লেখাতে।

এতদিন প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে এসেছি পত্রশেষে। কিন্তু আজ এমন মিঠে মিঠে মন-কেমনের হাওয়া বইছে যে ও-কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। নতুন কথা বলব যে তার ভরসা তুমি দিচ্ছ কই? দেবে?’

চিঠিখানা পড়ে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়ে কুশাহু। এর আগের কোন চিঠিতে এত প্রগল্ভতা কখনও করেনি স্বাহা। কী হল ওর? স্বাহা কিছু ফুলের কিশোরী মেয়ে নয়, যে পরিণাম না বুঝে লুকিয়ে লেখার আনন্দেই প্রেমপত্র লিখবে। ভাল না বেসেই ভালবাসার ভান করবে আর গালভরা প্রতিক্রতির মালা গাঁথবে। তাব যথেষ্ট বয়স হয়েছে। মেডিকেল কলেজের ছাত্রী সে। তাহলে এ প্রগল্ভতার অর্থ কি? স্বাহা যে ইঙ্গিত করেছে চিঠিতে সে বিষয়ে সে কি সত্যি সিরিয়স? একটা মানুষকে না দেখে, না জেনে এমন চিঠি কেউ লিখতে পারে? পাশের বাড়ির মেয়ের গান শুনে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল বিনোদবিহারী—না দেখেই। ওসব নাটকে চলে, বাস্তবে নয়। স্বাহা তো আজও কিছু জানে না। যাকে সে এই চিঠি লিখেছে সে লোকটা কানা হতে পারে, খোঁড়া হতে পারে, দূরারোগ্য বংশানুক্রমিক রোগে ভুগতে পারে সে! সেন্টিমেন্ট কি এতদূর নিয়ে যেতে পারে একটি পরিণতমনা নাবীকে?

কিন্তু কুশাহু তো পাগল নয় তাই বলে। তার ধারণা, স্বাভাবিক মানুষের মত দাম্পত্যজীবন তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তার মন বিকৃত। এই অসুস্থ মন নিয়ে সে কোন্ অধিকারে গ্রহণ কববে স্বাহার মত অবস্থাপন্ন ঘরের একটি শিক্ষিতা মহিলাকে তার সেন্টিমেন্টালিটির স্বযোগ নিয়ে? এতটা অমানুষ নয় কুশাহু। তা ছাড়া তাব মনে এখনও সন্দেহ আছে, সে কি সত্যিই এই মেয়েটিকে ভালবাসে? নিঃসন্দেহে ঐ অদেখা মেয়েটিকে ঘিরেই সে স্বপ্ন দেখেছে এতদিন। আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন, আর পাঁচজন মানুষের মত স্বাভাবিক হবার স্বপ্ন। হয়তো এই মেয়েটিই পারত ওকে আবার স্বাভাবিক করে তুলতে। হয়তো এর কাছে মনের সব কথা উজাড় করে দিলে সে স্বস্তি পাবে, শান্তি পাবে। কিন্তু তারপর আর

সম্ভব নয় সেই মেয়েটিকেই গ্রহণ করা। ওর দৃঢ় ধারণা মেডিকেল কলেজের যে ছাত্রীটি স্বাহা মিত্রের রোল-নম্বরে উঠে সাড়া দেয় তাকে ও ভালবাসেনি। ও ভালবেসেছে ঐ নামের মাধ্যমে পাওয়া একটা মনগড়া মেয়েকে। সে মেয়ে বাস্তবে কোথাও নেই, সে ওর মানসী! সেই মানসী প্রতিমার সঙ্গে বাস্তব স্বাহা মিত্রের আসমান-জমিন ফারাক! সেই মনগড়া মানসী প্রতিমার প্রেমেই আকর্ষণ ডুবে আছে কুশানু। তাকে সে তিল তিল করে নিজে সৃষ্টি করেছে। ধূপছায়া রঙের শাড়ি পরে সেই মেয়েটি বাদলা-দিনের অপরাহ্নে ক্ষণিক রোদ্রে ছাদে উঠে চুল শুকায়, খয়েরের টিপ এঁকে যে বৈকালিক প্রসাধনের শেষ টাচ দেয়। কুশানুর দৃঢ় বিশ্বাস, স্বাহা মিত্রকে চাক্ষুস দেখলেই খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে ওর মনের রঙে রাঙানো সেই মানসীর প্রতিমাখানি। সে দুর্ঘটনাকে প্রাণপণ শক্তিতে রোধ করবে কুশানু।

জবাবে তাই সে লিখল—‘তোমার স্বরে স্বর মিলিয়ে আমিও বলতে পারতাম, স্বাহা, রাখ জীবনটা বাজী—তারপর হয় রাজা, নয় ফকির। কিন্তু তা বলবার আমার ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা নেই নয়, সম্মতি নেই, অধিকার নেই। রাজা হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে সেই-ই বাজী ধরতে পারে ফকির হবার মত মূলধন যার আছে। কিন্তু এখনই যে ফকির সে বাজী ধরবার মূলধন পাবে কোথায়?’

তাই তোমার লোভনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলাম না। জেনে-ওনে তোমাকে আমি ঠকাতে পারব না তোমার সরলতার সুযোগ নিয়ে। তুমি আমার সম্বন্ধে কোন কিছু না জেনে কি করে এমন কথা লিখতে পারলে ভেবে অবাক হই। তোমার দুঃসাহসের প্রশংসা করি।

স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনের ভাগীদার হওয়ার অধিকার আমার নেই। কেন নেই সে কথা তোমাকে বলব। তোমাকেই শুধু বলব। একটি সর্তে। তুমি বলেছ যে কোন সর্তে তুমি আমার জীবনের সে গোপনতম সংবাদ শুনতে চাও। তোমার সে ইচ্ছা অপূর্ণ রাখব না। সর্তটাও পত্র-শেষে জানালাম।

যে দৃষ্টিবিভ্রমের কথা তোমাকে আমি লিখেছিলাম সেটা প্রথম কবে হয়েছিল তা আজ আর মনে নেই। কখন তা হবে, কেনই বা হয় এবং কেন কখনও কখনও হয় না তাও আমি জানি না। কোন জ্বীলোকের, বিশেষ বয়সের জ্বীলোকের সঙ্গে আলাপ করতে করতে হঠাৎ আমার মনে হয় যেন তার



কোন বহিরাবরণ নেই। হঠাৎ তার নিরাবরণ দেহটি আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তখন আমার শরীর মনে অদ্ভুত একটা অসুভূতি হয়। আমার বাহ্যিক পরিবর্তন কি হয় তা অবশ্য আমি জানি না, কারণ এ পর্যন্ত কেউ সে কথা আমাকে বলেনি; তবে আমার চেহারায় নিশ্চয় কোন পরিবর্তন আসে। কারণ, লক্ষ্য করেছি, আমার চোখের সামনের সে মূর্তিটি তখন বিহ্বল হয়ে পড়ে। হয় কঁদে ফেলে, নয় ছুটে পালিয়ে যায়—একবার একজন আমাকে চড় মেরেছিল।

এই অদ্ভুত রোগের জন্ম আমি কোন মেয়ের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারি না। এই জন্মে তোমার বোন টুক্লির সঙ্গে আলাপ করতে যেতে পারিনি। আমাদের ক্রাশে যে কটি মেয়ে পড়ে, তাদের আমি কদিন আগেও চিনতাম না। চোখ তুলে দেখিনি কখনও। আলাপ করা তো দূরের কথা। শুধু বাস্তবে নয়, অনেক সময় যখন মনে মনেও আমি বিশেষ বয়সের কোন মেয়ের কথা ভাবি তখন আমার মানসনেত্রে অসুৰূপ চিত্র ফুটে উঠতে দেখেছি।

তুমিই একমাত্র ব্যতিক্রম। তোমাকে আমি নিত্য ধ্যান করি। যে তুমি আমার অতি-পরিচিত, সে তুমি কেমন জান? সে-তোমার পরনে ধূপছায়া রঙের ঢাকাই শাড়ি, পায়ে আলতা, কপালে সিঁদুরের টিপ। সে-তোমার গায়ে ভোরবেলাকার ঠাণ্ডা হাওয়ার মৃদু গন্ধ, সে-তোমার প্রতি পদক্ষেপ মাটি না-ছোঁওয়া; সে-তুমি পাখীর পালকের মত হালকা, নির্মল নদীর মত নিষ্কলুষ।

তোমার সেই মানসী মূর্তি আমি নিজের হাতে গড়েছি। সে আমার গ্যালাট্রিয়া...। আমি কোন মতেই সহ্য করব না আমার সেই মানসী প্রতিমার গায়ে একটি আঘাতের চিহ্ন। তাই কোনদিন জানতে চাইনি তুমি দীর্ঘাঙ্গী না খর্বকায়া, তুমি শ্যামা না শুভ্রা, তুমি গাঢ় রঙের শাড়ি ভালবাস না হালকা রঙের। যা ইচ্ছা পর তুমি, শুধু টেনে খুলে ফেল না আমার মানসীর ধূপছায়া রঙের শাড়িখানি।

তাই আমার সনির্বন্ধ অসুৰোধ তোমার ফটোখানি তুমি আমাকে পাঠিও না। আমার ফটোও আমি তোমাকে পাঠাব না। যদি এই বিপুল পৃথিবীর কোন প্রান্তে দৈবাৎ দেখা হয় তোমাতে আমাতে, তাহলে আমাকে যেন তোমার মনে হয় ও একজন মানুষ। না হলে, তুমি পারবে না আত্মসংবরণ

করতে, হঠাৎ পরিচয় দিয়ে বসবে আর সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে আমার স্বপ্ন।

আমার সব কথাই তোমাকে জানালাম। সাধারণ মানুষের জীবন আমার কাছে অলভ্য। একজন সাধারণ মানুষ যা চায়, যা পেয়ে খুশী হয়, হয়তো তা তৃপ্তি দিতে পারবে না আমাকে—কে জানে? কোন নারীর দেহকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে হয়তো নিঃশ্বাস গাঢ়তর হবে না। আমার শুষ্ক ওষ্ঠাধরে পাবে না সেই নারী মোহ-মদিরার কোন স্পর্শ এ অনুমান করার সপক্ষে যুক্তি আছে। লক্ষ্য কবেছি ক্লাশের আর পাঁচটা ছেলে চায় মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে, গল্প করতে, অন্তরঙ্গ হতে। আর আমি অনবরত স্বযোগ খুঁজি কি করে ওদের এডিয়ে যাওয়া যায়। মনে আছে, একদিন ছাবভাঙ্গা বিল্ডিংসে উপরে ওঠবার সময় সিঁড়ির দিকে না গিয়ে লিফটের দিকে গিয়েছি। শরীরটা ভাল ছিল না, জর নিয়েই ক্লাশে গিয়েছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য হল লিফটে একটি মহিলা আর লিফটম্যান ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি নেই। সিঁড়ির দিকে ফেরবার জন্য পা বাড়াতেই মেয়েটি বললে, ‘কি হল মিস্টার রাই, ক্লাসে যাবেন তো? আসুন।’ বুঝলাম আমাদের ক্লাসেরই কোন মেয়ে। ও আমাকে চেনে, আমি ওকে চিনি না। শুনতে না পাওয়ার ভান করে ফিবে আসতে আসতে ভাবছিলাম ও কি ভাবল?

তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে স্বাহা, আমি সিনেমা দেখিনি গত দশ বারো বছর। গল্প উপন্যাস অবশ্য পড়ি—না পড়লে পাস করতে পারব না, তবে প্রেমের দৃশ্য, মিলনের দৃশ্য, বিশেষ করে নাবীর রূপবর্ণনার পৃষ্ঠাগুলো অন্তমনস্কের মত উলটে যাই।

এমন অসম্পূর্ণ অসুস্থ মানুষ নিয়ে কেউ সুখী হতে পারে না। তোমাকে এত কথা লিখলাম, কারণ তুমি সব কথা খুলে লিখতে বলেছিলে। বিনিময়ে আমার একটি মাত্র সর্ত, তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়িও না কখনও। এই লিপি-বন্ধুত্বই হবে আমাদের ভালবাসার শেষ দিগন্ত।

পারলে ক্ষমা কর আমাকে। আর নেহাৎ অসম্ভব না হলে দু ফোটা চোখের জল ফেল বিধাতার এই বিচিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।’

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ভবতরণবাবুর বাড়িতে যেতেই ইলা চুপি চুপি এসে বললে, বডদি আজ এসেছে, মেজদিকে আজ দেখতে আসবে মাস্টারমশাই।

দেখতে আসবে! সংবাদটা চমকপ্রদ বইকি! ঘোষাল সাহেব রীতিমত অতি-আধুনিক সাহেব। সর্ববিষয়েই পশ্চিমবঙ্গের জীবনযাত্রার সুরে তিনি বেঁধেছেন তাঁর জীবনকে। চলনে বলনে সাজে পোশাকে তিনি ইঙ্গবঙ্গ সমাজের লোক। সুতরাং তিনি যে কণ্ঠার বিবাহে এই প্রাচীন প্রথার মাধ্যমে অগ্রসর হবেন এটা কুশালু স্বপ্নেও ভাবেনি। স্বাভাবিক হত, তাঁর মতে, যদি নিত্য কতকগুলি স্মৃতির আসত বাড়িতে। তাদের মধ্যে কারও সঙ্গে হত আইভির প্রণয়, কোর্টসীপ এবং পরে বিবাহ। ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার যে বিলাতি প্রবাদটা আছে—প্রণয়ের আগে বিবাহও তেমনি একটা অসম্ভব ব্যাপার নাকি ওঁদের মতে। পাণিপ্রার্থী অবশ্য কয়েকজন আসে মাঝে মাঝে। কুশালু লক্ষ্য করেছে, আইভি দার্জিলিং থেকে আসার পর তাদের যাতায়াতটা অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন হয়েছে। ওঁদের মধ্যে আছে সন্ত-ফেরা ব্যারিস্টার, বিলাতী ডিগ্রিধারী ইঞ্জিনিয়ার, ভূতপূর্ব রায়বাহাদুর রায়সাহেবদের অভূতপূর্ব নিকরমা সূপাত্র। এতদিন তারা আসত যেত মাঝে মাঝে, বলা উচিত কালে-কস্মিনে। দোষ দেওয়া যায় না তাদের, ইলুকে লক্ষ্যস্থল করলে বছর দশেক পরে আসতে হয়। ইভাকে করলে আসা উচিত ছিল অনেক আগে। অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝখানে যিনি বর্তমান, তিনি এ বাড়িতে সব সময়েই অবর্তমান, থাকেন দার্জিলিঙে। ফলে সশরীরে হানা দেওয়ার চেয়ে পাত্ররা পত্রযোগে যোগাযোগ-সূত্রটা জিইয়ে রাখতেন। এর ভিতর একমাত্র জয়ন্ত শীল ছিল অতি উৎসাহী। ইলুকে টফি আর ভরতারণকে দুস্পাপ্য পুরাতন বই এনে দিত সে। আইভি না থাকলেও ঘুরঘুর করত ভরতারণের বাড়িতে। বেচারী প্রেমের সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে প্রেমসীর অবর্তমানে তার ব্যবহৃত চেয়ার টেবিল, তার পড়াব বই, তার মাথার চিরুণীর স্পর্শেও মূর্খ প্রেমিক স্নেহের সন্ধান পায়।

সে যাই হোক, আপাতত ইলুর কাছে প্রাপ্ত লেটেষ্ট বুলেটিন হচ্ছে মেজদিকে দেখতে আসবে। সুতরাং ইলুকে আজ বেশীক্ষণ আটকে রাখা চলে না।

আসলে তার সকাল সকাল ফিরে যাবার আরও একটি কারণ ছিল। ইলুর খবরের সঙ্গে আরও একটুকরা সংবাদ ছিল—বড়দি আজ এসেছে! কুশালু ইলুকে নিয়ে পড়তে বসার অল্প পবেই এল তার জলখাবার কেঁটবেরায়ার হাতে। আর তৎক্ষণাৎ কুশালুর মনে হল মেজদিকে যখন দেখতে আসবে তখন ইলুকে আজ বেশীক্ষণ আটকে রাখা উচিত নয়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় অকারণেই ওর দৃষ্টি উঠে যায় দ্বিতলের ক্যান্টিলিনভার বারান্দাটার, দ্বিতলের জানলার, ত্রিতলের ছাদে। নেই, কেউ নেই সেখানে।

ইভা কিন্তু এসেছে। ওর ছোট বোনকে আজ দেখতে আসবে। ওদের মা নেই, সুতরাং ইভার দায়িত্ব আছে বইকি। জীবনানন্দবাবুর জীবনের আশা দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। সুকান্তর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। ভবতারণবাবুকে সে কথা বলেছে ইভা—সন্ধানের ব্যবস্থা তিনি করছেন। ইভাকে শশুরবাড়ি থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা ভবতারণই করেছেন। তিনি জানতেন ইভা ছাড়া এ কাজ হবে না।

কানপুর থেকে কোন চৌধুরী মশাই তাকে দেখতে আসছেন শুনে একেবারে ক্লেপে গিয়েছিল আইভি। বলেছিল: আয়াম নো কমডিটি, দেখতে আসবে মানে?

ইভাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। সে জানে কিভাবে আইভিকে শাস্ত করতে হয়। মা-হারা এই বোনটিকে সে ভালভাবেই চেনে—যদিও বয়সে সে এমন কিছু বড় নয়। বেশ তো, ওখানে যদি বিয়ে না করতে চায়, নাই করবে আইভি, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো এটা হতে পারে না। কিন্তু বাপি যখন এ ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করেছেন তখন তো তাঁদের সামনে যেতেই হবে আইভিকে। না হলে বাপির অপমান।

আইভি রেগে বলেছিল, হোক অপমান, আই কেয়ার এ ফিগ।

কথাটা রুট! অত্যন্ত রুট। বাপের অপমানের আশঙ্কায় অল্প কোন মেয়ে এমন তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে না। করলে বিস্মিত হবার কথা শ্রোতার। ইভা কিন্তু একটুও অবাক হয় না। হয় না, তার কারণ ইভা জানে পূর্ব-ইতিহাসটা।

সরমা যখন মারা যান ইভা তখন কিশোরী, ইলা শিশু আর আইভি বালিকা, কিন্তু বয়স অল্পপাতে আইভি বুঝতে শিখেছিল অনেক কিছুই। মায়ের তিল তিল করে মৃত্যুবরণের আসল কারণটা শুধু ইভাই যে বুঝতে পেরেছিল তাই নয়, বুঝেছিল আইভিও। সরমা ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেয়ে। শুধু রূপের কোলিগেই ঘোষাল-পরিবারে আজীবন থেকে যাবার ভিসা দেওয়া হয় তাঁকে এ তরফ থেকে। নিষ্ঠাবান প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ-পরিবার থেকে এলেও সরমা নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলেন



এ পক্ষিবারের নতুন পরিবেশের সঙ্গে। সংস্কারের সঙ্গে মনে মনে লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল তাঁর অন্তরদেশ। সে-কথা বাইরের কেউ জানত না। এমন কি ভবতারণের সন্ধানী গোয়েন্দা চোথকেও মাঝে মাঝে ফাঁকি দিতেন তিনি। পর্ক ধরতে না পারলেও ফর্ক ধরতে শিখেছিলেন ; যদিও লক্ষ্মী পূজাটা ছাড়েননি—তবু পক্ষিবিণেশের অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছেন আহারের টেবিলে, শেরী ধরতে না পারলেও পাটিতে যাবার কায়দায় শাড়ি পরতে শিখেছিলেন। এত করেও কিন্তু সবমা নাগাল পেলেন না ভবতারণের। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ করে ক্রমে তলিয়ে যেতে শুরু করলেন ঘোষাল সাহেব। সরমা তখন যৌবনের মধ্যগগন অতিক্রম করেছেন। সে উদ্যম তখন আর তাঁর নেই। সব ছেড়েছুড়ে অবরুদ্ধ করলেন নিজেকে পূজোর ঘরের চতুঃসীমায়। তাঁর সে দূরন্ত অভিমানকে দ্রব করতে এগিয়ে এলেন না ঘোষাল—শ্রোতের জলে ভেসেই চললেন সরমা কল থেকে দূরে আরও দূরে।

ইভা বাপিকে ক্ষমা করেছিল—তার ধারণা ভবতারণের চেষ্টার ক্রটি ছিল না, কিন্তু প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যাওয়া ছিল তাঁব সাধ্যাতীত। প্রবৃত্তির কাছে মাঝুয যে কতদূর অসহায় তা বুঝতে শিখেছিল ইভা সেই কিশোরী বয়স থেকেই। বোধ করি জীবনের সেই প্রথম পাঠই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে পরিণত জীবনে বিপথগামী উচ্ছ্বল স্বামীর বিমুখতাকে সহ্য করতে, তাই উপেক্ষিতা মেয়েটি আজও পুড়িং তৈরী করতে ভোলে না।

আইভি কিন্তু ক্ষমা করতে পারেনি তার বাপকে। তিল তিল করে বদলে গেল আইভি বয়ঃসন্ধীর কাল থেকেই। উদগ্র হয়ে উঠল সে মাথা চাড়া দিয়ে। বাপিকে আঘাত করবার জন্তু স্বেযোগ খুঁজত যেন। উচ্ছ্বলতায়, ঔজ্জ্বল্যে সে ছাড়িয়ে উঠতে চাইল বাপের যৌবনকালের রেকর্ড! তার আচরণে ভবতারণ আহত হচ্ছেন বুঝতে পারলে খুণী হত আইভি—যেন দেখিয়ে দেখিয়ে বাড়াবাড়ি করত। মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে যেন সে।

ভবতারণবাবু সব দেখতেন, শুনতেন, কিন্তু চুপ করেই থাকতেন তিনি—স্বাহস করে শাসন করতেন না মধ্যমা কন্যাকে। ইভা জানে আইভিকে তিনি মনে মনে ভয় পান। যেন কণ্টকিত হয়ে থাকেন, কখন আইভি বলে বসে—এ তো তোমারই শিক্ষা বাবা!

বাপকে সহ্য করতে না পারলেও দিদির ভীষণ ভালবাসত সে। ইতাকে অবশ্য দিদি বলে ডাকে না আইভি। নাম ধরেই ডাকে ; বাবুবীর মত ব্যবহার করে। কিন্তু দিদির জন্ত পারে না এমন কোন কাজ নেই তার।

শেষ পর্যন্ত দিদির অসুস্থতায় আইভি রাজী হল দেখেনেওয়ালাদের সামনে দেখা দিতে। গেল সে, কিন্তু উদ্ধত বিদ্রোহী মতই।

সন্ধ্যাবেলা এলেন ভদ্রলোকেরা। চৌধুরী সাহেব বৃদ্ধ মানুষ। কানপুরে মস্ত ট্যানারীর কারবার। বিলাত-ফেরত বিলাতী কেতার মানুষ। শোনা যায় তিনি নাকি ঘোষাল সাহেবের চেয়েও উগ্র পরায়ের সাহেব। এসেছেন কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবী পরে। সিল্কের চাদর কাঁধে। হাতীর দাঁতের ছড়ি হাতে, হরিণের চামড়ার চটি পায়ে। অগাধ সম্পত্তির মালিক। ছেলেটিকে বিলাতেই লেখাপড়া শিখিয়েছেন স্কুলপর্যায় থেকে। একটি সুন্দরী শিক্ষিতা আধুনিক পাণ্ডী খুঁজছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে এসেছে অল্পবয়সী একটি ছেলে। স্মার্টেডবুটেড। বরের বন্ধু।

ওঁদের দুজনকে ভবতারণ নিয়ে এসে বসালেন দ্বিতলের বড় ঘরে। অল্প পরে ইলুর হাত ধরে আইভি এসে বসল ঘরে। নিজে প্রশ্রয় করেনি, তা দেখলেই বোঝা যায়, কারণ সাজটা উগ্র হয়ে ওঠেনি মোটেই। ইতার নির্দেশমত বৃদ্ধকে সে প্রণাম করল, হাত তুলে নমস্কার করল পাত্রের বন্ধুকে। পর্দার আড়ালে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ইভা—যাক, তাহলে বিসদৃশ কিছু করবে না আইভি। পর্দার এ পাশে আসায় কোন বাধা ছিল না, বস্তুতঃ আসবেই ভেবেছিল ইভা, কিন্তু চৌধুরী সাহেব হঠাৎ চৌধুরীমশাই সঙ্গে মেয়ে দেখতে আসায় সে অন্তরালবর্তিনী হয়ে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করল।

চৌধুরী মশাই প্রশ্ন করেন, নামটা কি মা তোমার ?

এ অবধারিত প্রশ্নটা হবে জানা ছিল। ইভা বলেছিল, নাম জিজ্ঞাসা করলে বলবি শ্রীমতী আইভি ঘোষাল।

আইভি বলেছিল, কেন ? মিছে কথা বলব কেন ? ‘শ্রী’ আমার ত্রিসীমানায় নেই, চিরকাল যা বলোছ, তাই বলব—মিস আইভি ঘোষাল।

ইভা ওকে ছদ্ম তাড়না করে বলেছিল, দূর পাগলি। তা বলে না।

সে কথাগুলি মনে পড়ল আইভির। বলল, আমার নাম আইভি।

বৃদ্ধ একটু হেসে বলেন, আইভি ? আইভি মানে কি মা ?

আড়াল থেকে ইভা বুঝতে পারে মর্যাদাসিক চটেছে আইভি এই অপ্রাসঙ্গিক অসঙ্গত প্রশ্নে। বৃদ্ধকে আইভি আপাদমস্তক দেখে নেয় একবার, রিংয়ে

নামবার আগে যেমন করে তাকিয়ে দেখে যোদ্ধা তার প্রতিপক্ষকে। তবু  
বিচলিত না হয়ে বলে, আইভি হচ্ছে এক রকমের ক্রিপার, Ficus pumila !

বৃদ্ধ তাঁর টাকের ওপর হাত বুলিয়ে বলেন, ইংরাজিটা আবার আমি ভাল  
বুঝি না মা, যা বলার তুমি বাংলায় বল, কেমন ?

আইভি জানতো। ভদ্রলোক বার তিনেক ইয়োরোপ আমেরিকা ঘুরে  
এসেছেন। সে কোন জবাব দেয় না। জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

গান গাইতে জান ?

না। আইভি চোখে চোখ রেখে বলল।

নাচতে ?

না। স্বর চড়েছে এক পর্দা।

বৃদ্ধ একটিপ নশ্ত নেন। আইভি বলে, বাই দ্য ওয়ে, আপনার ছেলে  
নাচতে জানে ?

ভবতারণ সচকিত হয়ে ওঠেন। বরের বন্ধু ক্রমাল দিয়ে মুখটা মোছে। ইলু  
পর্যন্ত সাদা হয়ে যায়। চৌধুরী সাহেব, অর্থাৎ বর্তমানে চৌধুরী মশাই কিন্তু  
বিরক্ত হলেন না, হেসে বলেন, জানে। তোমার এক নম্বর হার হল।

আইভি নড়েচড়ে বসে।

আমার ছেলে খুব ভাল টেনিস খেলতেও জানে। কেম্ব্রিজ যুনিভার্সিটিকে  
রিপ্রেজেন্ট করেছে।

মানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে বলতে চান ?

বৃদ্ধ হেসে বলেন, ঠিক তাই। তুমি টেনিস খেলতে জান ?

জানি।

রাঁধতে ?

সামান্য।

চৌধুরী বলেন, এর হাতের লেখাটা একটু দেখতে চাই, একটু কাগজ কলম  
দেবেন তো ঘোষাল মশাই।

এবার ভবতারণও বিরক্ত হয়ে ওঠেন। চৌধুরী সাহেব সম্বন্ধে তিনি কি  
ভুল সংবাদ পেয়েছিলেন না কি ? শুনেছিলেন তিনি আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত  
লোক। কিন্তু এ কী ধরনের পরীক্ষা। মনে মনে কণ্টকিতও হয়ে ওঠেন।  
আত্মজাকে চিনতে তো বাকি নেই তাঁর। ইলু এনে দেয় কাগজ কলম।  
চৌধুরী বলেন—রবীন্দ্রনাথ থেকে যে কোন একটি পংক্তি লেখ তো মা।

আইভি লক্ষ্য করল, লাইন না বলে এবার সাবধানে পংক্তি বলেছেন তিনি। একটা আঙুরকাট স্ক্রকোশলে এড়িয়ে গেলেন চৌধুরী। বিনা-বাক্যব্যয়ে খসখস করে কি যেন লিখে কাগজটা ফেরত দেয় চৌধুরীর হাতে। চৌধুরী কাগজটা নিয়ে দেখেন। স্মিত হাসি ফুটে ওঠে ওঁর ওষ্ঠপ্রান্তে। কাগজখানা তিনি বাড়িয়ে ধরেন ভবতারণের দিকে; বলেন সুন্দর হাতের লেখা।

ভবতারণ দেখেন কাগজে লেখা আছে সংক্ষেপে বলতে গেলে হিংটিংছট!

মুখটা লাল হয়ে উঠল তাঁর। বুঝলেন এ অধ্যায়ের এখানেই যবনিকা। ছাব্বিশ খণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলীর মধ্যে থেকে মুহূর্তমধ্যে এমন একটি মোক্ষম লাইন যে খুঁজে নিয়ে তুলে ধরতে পারে বাপের বয়সী ভদ্রলোকের হাতে, তার নির্বাচন ফলাফল জানতে আর বাকি কি? ভবতারণ আশা করেন, আর কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজন হবে না নিশ্চয় চৌধুরী মশায়ের। কিন্তু তাঁর আশা নিমূল করে বৃদ্ধ মুহূর্তে প্রশ্ন করেন, মনে কর আমার ঘরে তুমি এসেছ। এখন একদিন আমার বাড়িতে, মানে তোমার বাড়িতে একজন অতিথি এসেছেন। ঘরে শুধু চাল ডাল আর তেল ছুন আছে। তুমি কি ভাবে অতিথি-সংকার করবে?

যেন স্থানটা হাজরা রোড নয় মুচকুন্দপুর গ্রাম, আর সময়টা উনবিংশ-শতাব্দীর শেষ পাদ। আইভি মর্মভেদী দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষকে একবার দেখে নিয়ে গম্ভীরভাবে বললে, চাকরকে হোটেল পাঠাব।

চৌধুরী হেসে বলেন, ধর, চাকর নেই।

তাহলে আপনার ছেলেকে বাজারে পাঠাব।

ধরা যাক ছেলেও বাড়ি নেই।

তখন আপনাকেই বলব।

আমাকে? হা-হা করে হাসেন চৌধুরী মশাই। বলেন, বেশ তুমি যেন আমাকে বললে বাজারে যেতে; কিন্তু ধর আমি জবাবে বললাম, আমি যে কপর্দকহীন মা, আমার কাছে তো একটি পয়সা নেই। আমি একেবারে দেউলে হয়ে গেছি।

আইভি হাসল। প্রতিপক্ষের ছিদ্র এতক্ষণে নজরে পড়েছে তার। এবার নিশ্চিত নক-আউট। বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে, আমি তখন চালে-ডালে মিশিয়ে খিচুড়ি রাখব। ডাল বেটে বড়া ভেজে অতিথিকে খেতে দেব।





একগাল হেসে বুদ্ধ বলেন, পাস্‌ড উইথ ডিস্টিংশন !

অর্থাৎ সম্মানে পাস করেছি ?

করেছ। এখন তুমি যেতে পার।

ইলু উঠে দাঁড়ায়। হাত ধরে আকর্ষণ করে আইভির। সে ওঠে না।

বলে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই আপনার ?

চৌধুরী বলেন, না মা, নেই। তুমি ভিতরে যাও।

এবার তা হলে আমার একটি প্রশ্নের জবাব দেবেন ?

ভবতারণবাবু উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। তাড়াতাড়ি বলেন, তুমি ভিতরে যাও আইভি।

যাচ্ছি, তবে যাবার আগে একটা কোতূহল চরিতার্থ না করে যেতে পারছি না। আপনি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন এবার ?

চৌধুরী সহাস্রো বলেন, বল।

আইভি এক নিঃশ্বাসে বলতে থাকে, অতিথি তো খুশী হয়ে চলে গেলেন। তারপর আমি বললাম - বাবা, ওবেলা কি রান্না হবে ? আপনি কি জবাব দেবেন ?

ঘরে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা।

আইভি শুধু মনে মনে গুনছে এক-দুই-তিন-চার।

আপনি গ্যাচারালি বলবেন আমবা যে দেউলিয়া মা। আমি বলব—আপনার এতবড় সম্পত্তি উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলেন কি করে ? আপনি কি জবাব দেবেন ? এবারও বাক্যস্ফুটি হয় না চৌধুরী মশাযেব।

পাঁচ ছয় সাত।

ভিতরের দবজা খুলে ঘরে আসে ইভা। আইভির বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করে। সে কিন্তু একগুঁয়ে জন্তুর মত মাটি কামড়ে ধরে বলে চলে, একদিনের অতিথিকে আপ্যায়ন করার দায় ছিল আমার। কিন্তু আমাকে যে আপনি চিরদিনের অতিথি কবে নিয়ে গেছেন সে দায় থেকে কিভাবে আপনি মুক্তি পাবেন দেউলিয়া হয়ে যাবার পর ?

ইভা জোর করে ওকে টেনে তোলে, কী পাগলামী করছিস আইভি।

পাগলামি নয় ইভা। ভদ্রলোককে আমি শুধু বুঝিয়ে দিতে চাই—নো প্রবলেম কুড বি সল্‌ভড্‌, ছাট্‌ স্টার্টস্‌ উইথ্‌ এ্যান্‌ এ্যাবসার্ড্‌ হাইপথেসিস্‌। পরীক্ষক যে অঙ্ক নিজে কষতে পারেন না, সেটি প্রশ্নপত্রে দেবার কোন

অধিকার তাঁর নেই, এটাই শুধু বুঝিয়ে দিতে চাই আমি। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

আট নয় দশ!

নক-আউট চৌধুরী সাহেব নির্বাক পড়ে রইলেন। দুই বোনকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল আইভি।

ভবতারণবাবু তাঁর আত্মজাকে ডেকে কোন কৈফিয়ত তলব করলেন না; ইভা জানতো তা তিনি করবেন না, করবার সাহস তাঁর নেই। ইভা কিন্তু তাই বলে তো চুপ করে থাকতে পারে না। মাতৃহীন ছোট বোনের দায়িত্ব যে তার। যৌবনচঞ্চল উচ্ছল প্রকৃতির এই ছোটবোনটির জন্তে তার মনে উৎকর্ষার অবধি নেই। তার নিজের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে। জীবনে চলার পথে যে সাথী এল তার সঙ্গে হাত ধরে চলার সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত। স্বামী তাকে নেয় না, এ যে কত বড় বঞ্চনা, কত বড় লজ্জার কথা সে কথা একমাত্র ইভাই বোঝে। তবু তাকে হাসতে হয়, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। মনের মত সাথী না পাওয়ার দুর্ভাগ্যের কথা মর্মে মর্মে জানে ইভা। তাই তার একান্ত ইচ্ছা অন্তত আইভির বেলা যেন আবার নির্বাচনে ভুল না হয়। আইভি যেন তার দ্বিতীয় সত্তা, সে যেন দ্বিতীয় ইভা। তাই আইভির জীবনের শান্তিতে যেন তারই অশান্ত আত্মার তৃপ্তি। কানপুরের সম্বন্ধটা ভেঙে গেছে, যাক, তাতে দুঃখ নেই। অজানাকে বড় ভয় ইভার, অচেনাকে বিশ্বাস করতে মন ওঠে না। চৌধুরী-তনয়কে সে চোখে দেখেনি, তাই বিশ্বাস করতে পারে না। সে যদি ভুল বোঝে আইভিকে, যদি না চিনতে পারে। কেমন ধরণের মানুষ সে তাই বা কে জানে? সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত—এসব বিশেষণের মূল্য কি? ও দিয়ে কি মানুষের মনকে যাচাই করা যায়? মনটাই তো সব। আরও দুটি সুন্দর, স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত মানুষকে কি দেখেনি ইভা? তারা কি ওর মনের রামধনুর উপর কালো মেঘের আস্তরণ টেনে দিয়ে উধাও হয়ে যায়নি কোন অলক্ষ্য দিগন্তে?

এ বরং ভালই হয়েছে। কুশানু রাজি আছে আইভিকে বিয়ে করতে। কুশানু। কুশানু রায়। ইভার জোড়া ভুরুতে জেগে ওঠে একটা কুঞ্চন। মনে পড়ে সব কথা। প্রথম দিন থেকে ওদের মেলামেশার ঘটনাগুলো রোমন্থন করতে থাকে। মনে পড়ে শেষ দিনের শেষের কথাটা। কুশানু বলেছিল—

আশনার বাবাকে বলবেন তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজি আছি। আরও মনে পড়ল ইভা প্রশ্ন করেছিল—কি করে বুঝলেন? কুশাহু উত্তরে বলেছিল—মা গঙ্গা আজ আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। শুনে তীব্র আঘাত পেয়েছিল ইভা। সে আঘাতের ক্ষতচিহ্ন আজও তার বুকে লেগে আছে। তারপর থেকে আর সে একদিনও কুশাহুর সামনে এসে দাঁড়াতে পারেনি। পারেনি হেসে কথা বলতে, কোতুক করতে, তার বন্ধুত্বের সখীত্বের স্বীকৃতি পাওয়ার পরেই সে মরে গেছে নেপথ্যে। কারণ ইভা ইভাই, পত্রলেখা নয়।

সংস্কৃতির ছাত্রী ছিল ইভা। কাদম্বরী তার ভালভাবে পড়া আছে। কবি বাণভট্টের অপূর্ব সৃষ্টি কাদম্বরী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ইভাও বলে, কবি অন্ধ!

যুবরাজ চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর সঙ্গে মিলনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন। কাদম্বরীর ধ্যানে তাঁর দিন যায়, রাত্রি যায় স্বপ্নে। এমন সময়ে কৈলাস নামে এক কঙ্কী রাজকুমারের পদপ্রান্তে এনে নামিয়ে দিল একটি অনতিষৌবনা নারীকে—পত্রলেখা। কবি বলছেন, তার মাথায় ইন্দ্রগোপকীটের মত রক্তাশ্বরের অবগুঠন, ললাটে চন্দনতিলক, কটিতে হেমমেখলা, কোমলতুল্লতার প্রত্যেক রেখাটি ঘেন সত্ত্ব নূতন অঙ্কিত। কঙ্কী রাজকুমারকে জানালেন—এই অপক্লপ নারীরত্নটি পরাজিত কুলুতেশ্বরের দুহিতা, বন্দিনী, পত্রলেখা এর নাম। এই অনাথা রাজদুহিতাকে রাজকুমারের তামূলকরকবাহিনীভূক্তা করা হয়েছে। কঙ্কী আরও বললেন—ইহাকে সামান্য পরিজনের মত দেখিও না, শিষ্যার গায় দেখিও, অস্তরঙ্গ সুরূদের গায় তোমার নর্মসহচরী করিও।

পত্রলেখা হল রাজকুমারের অস্তরঙ্গ বান্ধবী। চন্দ্রাপীড় তার সঙ্গে কাদম্বরীর কথা বলতেন, কাদম্বরীর প্রতি তাঁর মনের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করতেন। পত্রলেখা হাসত, গল্প করত, রাজকুমারকে নানাভাবে সেবা করত। রাজকুমার যখন দিগ্বিজয় যাত্রা করেন তখন একই হস্তীপৃষ্ঠে সে তাঁর কোল ঘেঁষে বসে, তিনি যখন শিবিরে রাত্রিকালে নিজ শয্যায় শায়িত তখন ‘ক্ষিতিতলবিগ্ৰহ কুথার’ উপর সখী পত্রলেখা প্রসুপ্তা থাকে। ঋণকালের জন্তও এই সেবাপরায়ণা প্রিয়সখীর প্রতি কোন চিত্তচাঞ্চল্য বোধ করেছেন রাজকুমার চন্দ্রাপীড়, এমন কথা ঘুণাক্ষরেও ইঙ্গিত করেননি কবি বাণভট্ট। পত্রলেখা কিছুদিন কাদম্বরীর সঙ্গে একত্র বাস করে যখন রাজকুমারের কাছে ফিরে এল দূতী হিসাবে খবর

দিতে, তখন রাজকুমার আনন্দের আতিশয্যে প্রিয়বাক্যী পত্রলেখাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন।

আশ্চর্য! পত্রলেখার মত পূর্ণযৌবনা প্রিয়সখীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করেও কি রাজকুমারের বুকের মৃদঙ্গ বেজে ওঠেনি? শিরায় শিরায় রক্তস্রোত দ্রুততর হয়নি? তপ্তযৌবনের তাপটুকু কি তাঁর কপাটবক্ষে স্পর্শ করেনি? সেই আলিঙ্গনবদ্ধ মুহূর্তটিতেও কি কাদম্বরীর আলোখ্যের উপরে পত্রলেখার বাস্তব উপস্থিতিটা উপলব্ধি করতে পারেননি যুবরাজ! তবে সে কথা কেন লিখলেন না বাণভট্ট?

কাদম্বরী পড়তে পড়তে, মনে আছে ইভার, সে বলেছিল, ঠিকই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, কবি অন্ধ!

আজ তার মনে হয়, কবি অন্ধ নন। পত্রলেখার চিত্তচাক্ষুণ্যের কথা কবি লেখেননি—কারণ সে কথা তাঁকে বলেনি পত্রলেখা। কবির কানে কানে এসে নায়ক-নায়িকার কথা বলে যায়, উপন্যাসিকের নিদ্রাহীন রাত্রে তার উপন্যাস-বর্ণিত পাত্র-পাত্রীরা এসে হানা দেয়। তারা দাবী করে—লেখককে তার আধোতন্দ্রার ঘোর থেকে টেনে তুলে বলে, কই, আমার কথা কই বলছ? আমাকে সৃষ্টি করেছে তুমি, তাই আমার প্রাপ্য কড়ায়গলয় মিটিয়ে দিতে হবে তোমাকে।

ইভা নিজে কবি নয়, লেখক নয়—তবে এটা সে জানে। দুঃখের বিষয়, পত্রলেখা কোনদিন কবি বাণভট্টের কাছে গিয়ে তার দাবী জানায়নি কখনও। তার ইতিকথা যে বড় সঙ্কোচের, বড় লজ্জার। কোন লজ্জায় সে বলবে—ওগো কবি, তুমি লেখ আমার কথা। ঐ তোমার গল্পের নায়ক—যে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেও তোমার নায়িকার চিন্তায় বিভোর থাকে, তাকে আমি ভালবাসি—এই কথা কটা লিখে রেখ তোমার কাব্যে।

কোন নারী এ কথা বলতে পারে না। আর কেউ না জানলেও ইভা জানে!

রবীন্দ্রনাথ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, হতভাগিনী বন্দির প্রতি কবির ইহা অপেক্ষা উপেক্ষা আর কী হইতে পারে? একটি সূক্ষ্ম যবনিকার আড়ালে বাস করিয়াও সে আপনার স্বাভাবিক স্থান পাইল না। পুরুষের হৃদয়ের পার্শ্বে সে জাগিয়া রহিল, কিন্তু ভিতরে পদার্পণ করিল না। কোন দিন



একটা অসতর্ক বসন্তের বাতাসে এই সখীস্ব-পর্দার একটি প্রান্তও উড়িয়া পড়িল না।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—‘আমরা বলি, কবি অন্ধ।’

ইভাও ঐ সুরে সুর মিলিয়েছিল একদিন। আজ বোঝে ভুল করেছিল সে। কবি অন্ধ নন। কবিই চক্ষুমান, কবিই দ্রষ্টা, মূর্খ পাঠকপাঠিকাই অন্ধ। কবি ঠিকই চিনেছিলেন চন্দ্রাপীডকে। পুরুষ জাতটাই অমনি। হয়তো পত্রলেখাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাদম্বরীকে কল্পনা করেছিল সে; পত্রলেখার দেহে কাদম্বরীর স্পর্শ কল্পনা করেই মনে মনে তৃপ্ত হয়েছিল চন্দ্রাপীড। ভেবেছিল, পত্রলেখা আজ চোখে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিয়েছে আর পাঁচজনের মতই স্বাভাবিক সে।

দুঃখ নেই তাতে, কাব্যে উপেক্ষিতা হয়েই থাকবে ইভা। সে যদি কোন ঔপন্যাসিকের একটি চরিত্র হত তাহলে সেই লেখকের বিনিদ্র রজনীতে সে কোন দাবী নিয়ে উপস্থিত হত না। পত্রলেখার মতই সে নীরব উপেক্ষা সয়ে সয়ে থাকত। চন্দ্রাপীড-কাদম্বরীর মিলনদৃশ্যটিকে এগিয়ে আনত শুধু।

এতদিনে মনকে জয় কবেছে সে। আর ছেলেমানুষী করবে না বখনও। ছেলেমানুষী বইকি। সেদিন তো বরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। কেন বোকাব মত বলে বসেছিল কুশান্নকে, আমি আপনার মনের কথা জানি।

কি জানত সে? কি জানে? যা জানত তা তো সব ভুল। ইভা অন্তর্পূর্ণ, তার প্রতি দৃষ্টিই নেই কুশান্নর। সে ঘর বাঁধতে চায়—জীবনের পাঠ নিতে চায়। ইভাব কথা সে চিন্তাও কবে না। অলস প্রণয়ের অহেতুক উচ্ছ্বাস নেই তার। আইভিকেই সে সাথী হিসাবে চায়, শুধু মনে তার কী একটা সংশয় আছে বলে বাধা। কুশান্ন নারীভীত, তাই বিয়ে করতে তাব ভয়। মা গঙ্গা তাকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সে আর পাঁচজনের মতই সাধারণ মানুষ।

কাব্যপাঠের আগে ব্যাকরণ পড়তে হয়, না হলে কাব্যের বসাস্থাদন করা যায় না। কাব্যটাই লক্ষ্য, ব্যাকরণটা অপরিহার্য একটা উৎসর্গ মাত্র। কুশান্ন আইভিকাব্য পড়তে উন্মূখ। ইভার ব্যাকরণ নয়। কাব্যই হবে তার শয্যাসজিনী, চিত হয়ে পড়বে সে কাব্যগ্রন্থ—বারে বারে ফিরে ফিরে। তাই কাব্য চিরকাল থাকবে তার বুকে। আর ব্যাকরণ বুক-কেসে।

তা হোক, তাই চায় ইভা। কাব্যে উপেক্ষিতাই সে থাকবে চিরকাল।

নায়ক নায়িকার মিলনদূতীর ভূমিকা তার। কুশাঙ্গুর সম্মতি তো আছেই, ভবতারণও রাজি হয়েছেন। সমস্তা এখন একমাত্র আইতিকে নিয়ে। আইতিকে আকৃষ্ট করতে হবে কুশাঙ্গুর দিকে। এটা সে করবে।

আইতিকে ডেকে ইভা প্রশ্ন করল, তুই এভাবে ভদ্রলোককে অপমান করলি কেন?

আইতি উদ্ধতভাবে বলে, অপমান তো আমি করিনি, তিনি অপমানিত হয়ে থাকতে পারেন।

ইভা ও প্রসঙ্গ এডিয়ে বলে, তুই কি চাস? তোব বিয়ের কথায় আমরা না থাকি?

সেটাই তো স্বাভাবিক।

অর্থাৎ তুই নিজে পছন্দ করে বিয়ে করবি?

যদি কবি কখনও।

তার মানে বিয়ে করাব ইচ্ছেই নেই তোর? তোর সেই থিয়োরী তো?

শুধু থিয়োরী নয় ইভা। আর পাঁচটা মেয়ের মত আমি কারও হেঁসেলে গিয়ে খোঁকাব মা সাজতে পারব না। তার মানে এ নয় যে পুরুষ আমার জীবনে আসবে না, কিন্তু এমনভাবে আসবে না যাতে আমি ঘাড় গুঁজড়ে পড়ে মরি।

ইভা বলে, শুধু থিয়োরীকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে কাঁটে ভেবেছিস তোর জীবন?

আইতি হেসে বলে, ছেলেমানুষের মত কথা বলিস না ইভা। আমি কি তাই বলছি। শুধু থিয়োরীকে জড়িয়ে ধরব কেন? যখন যাকে ভাল লাগবে তখন তাকেই জড়িয়ে ধরব, শুধু দেখতে হবে তাতে জড়িয়ে না পড়ি যেন।

ইভা একদৃষ্টি ওর দিকে তাকিয়ে বলে, আমার কাছেও চাল মারবি?

চাল আবার মারলাম কোথায়?

তুই ভাব দেখাস যেন ডজন ডজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে তোব খুব ভাব— যেন তাদের সকলের কাছেই তুই সুলভ। বিশ্বাস করতে বলিস আমাকে তাই?

বিশ্বাস অবিশ্বাস অবশ্য তোমার কথা। আমি তো এ কথা বলিনি যে সকলের কাছেই সব সময়ে আমি সুলভ, আমি শুধু বলতে চাই প্রত্যেকের কাছেই ক্ষেত্রবিশেষে আমি অলভ্য নই।

মিথ্যা কথা !

মিথ্যা কথা মানে ?

মিথ্যা কথা মানে মিথ্যা কথা ! আমি কি তোকে চিনি না ? তুই  
মায়ের মতই পিউরিটান । ধরা দিবি তুই ?

খিলখিল করে হেসে ওঠে আইভি, বলে, তুই পুরুষমানুষ হলে তোকেই  
বিয়ে করতুম । স্বীয় প্রেমের একনিষ্ঠতা সঙ্কে এতবড় অন্ধ পুরুষ আর পাব  
কোথায় । চোখের উপর পরপুরুষ কণ্ঠস্বর দেখেও তুই ভাবতিস স্বপ্ন দেখেছি ।

ইভা জবাব দেয় না ।

কি ? রাগ করলি ?

না রাগ করিনি । বেশ, মেনে নিলাম দেহের ক্ষুধা মেটাবার ব্যবস্থা তোর  
আছে । কিন্তু দেহই কি সব ? তাতেই কি মানুষ শান্তি পায় ?

আইভি বলে, অন্ধের সঙ্গে আলোর বর্ণালী নিয়ে কি আলোচনা করব  
ইভা ? দেহ মন—কোন কিছুকেই কখনও খাওয়া তুলে দিয়েছিঁ তুই যে  
বোঝাব ?

ইভা ধমক দিয়ে বলে, আমার কথা থাক । তোর কথা বল । মনটা কি  
কিছুই নয় ? স্বামীস্বীর একনিষ্ঠ প্রেমের কি কোন মূল্য নেই ?

মূল্য নেই ? বলিস কি ? সে প্রেম তো স্বর্গীয় ! আমাদের এই  
বাড়িতেই দু-দুটো উদাহরণ চোখের উপর দেখেও অস্বীকার করতে পারি  
প্রেমের একনিষ্ঠ মাহাত্ম্য ?

ইভা জবাব দিতে পারে না ।

আইভিও বুঝতে পারে কথাটার আঘাত পেয়েছে ইভা । তাই  
তাড়াতাড়ি লম্বু করে বলে, মনের ক্ষুধাও মেটাতে হবে বইকি । তবে সে  
ক্ষুধা মেটাতে তুই পথ্যের কোন বৈচিত্র্য বরদাস্ত করিস না । নিত্য ত্রিশদিন  
একই মেনু বরাদ্দ তোর আইনে । আমি সেটা মানি না । মনকে আমিও  
খেতে দেব । তবে নিত্যনতন খাদ্য । জয়ন্ত শীল যদি ফার্পোতে নিয়ে গিয়ে  
আমার মনকে বিরিয়ানি পোলাও খাওয়ায় তো খাওয়াক, তাই বলে খালের  
ধারে পা ছড়িয়ে বসে কুশাহু রায় যদি আমাকে কৌচড়-ভরা মুড়ির মোয়া  
অফার করে—

বাধা দিয়ে ইভা বলে, কার নাম বললি ? কুশাহু রায় ? ইলুর মাস্টার  
মশাই ?

হ্যাঁ ; কেন, আপত্তি আছে তো ?

ইভা বলে, না, আমার আর আপত্তি কিসের ? সাবালিকা হয়েছে এখন তখন যা ইচ্ছে করতে পার। তবে এ বিষয়ে বড় বোন হিসাবে তোমাকে সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য মনে করি আমি।

ইভার গাঙ্গীরে, তার হঠাৎ ‘তুই’ ছেড়ে ‘তুমি’ বলার ভঙ্গিটায় আইভির ভুরু কঁচকে ওঠে, বলে, কেন ? সাবধান করার কি আছে ?

আছে। দু’ তরফ থেকেই সাবধান করার প্রয়োজন আছে। কুশালুবারুকে আমি খুব ভালোভাবে স্টাডি করেছি। তাকে জয় করা যায় না। মেয়েমানুষের দিকে চোখ তুলে তাকায়ই না সে।

কেন ? নারী নরকের দ্বার বলে ?

হয়তো তাই। লোকটা ভীষণ রকমের পিউরিটান। নিজের চারদিকে একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ তুলে রেখেছে যেন। আজ সাত-আট মাস পড়াচ্ছে ইলুকে অথচ এখনও মুখ তুলে কথা বলে না আমার সঙ্গে। জানিসই তো, আমি একা একা থাকি, ভাব করতে চাইলাম ওর সঙ্গে। ও এগিয়ে এল না। ওর ছবি আঁকার হবি আছে। স্কেচবুকটা ইলুর মারফত দেখেছিলাম একদিন। একটাও ফিমেল ফিগার নেই তাতে। জিজ্ঞাসা করলাম কারণটা। হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

আইভি উত্তেজিত হয়ে বলে,—‘স্বব’।

হয়তো তাই আমার বন্ধুত্ব সে অস্বীকার করল, কলক কতি নেই। আমি খোলা মনেই এগিয়ে গিয়েছিলাম। আঘাতটা আমার বাজেনি। তাই তোকে সাবধান করে দিতে চাই। শুধু শুধু অপমানিত হতে যাবি কেন ?

আইভি মুখ টিপে হাসলে।

হাসলি যে ?

তুই জানিস না তাই। এসব তথাকথিত পিউরিটান ভালো ছেলেগুলো হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল। আমার তো আর চিনতে বাকি নেই কাউকে। অস্ট্রিচের মত ওরা বালির মধ্যে মুখ গুঁজে শত্রুর আক্রমণ এড়াতে চায়। মনের চারিদিকে বালির বাঁধ বেঁধে ওরা কামনার বন্যাকে রুখতে চায়। কিন্তু তুই বলেছিলি সাবধান করার দুটো কারণ। দ্বিতীয়টা কি ?

ইভা গম্ভীর হয়ে বলে, বাবা জানতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এ তোমার



জয়ন্ত শীল নয়। এ বড় মারাত্মক খেলা আইভি। হয়তো কখনও খেলা করতে করতে সত্যিই ভালবেসে ফেলবি ওকে। কিন্তু বিয়ে তোদের হবে না কিছুতেই।

বিয়ের কথা উঠছে কি করে? অসহিষ্ণু হয়ে বলে আইভি।

এখন উঠছে না, কিন্তু যদি কোনদিন তুলিস তুই নিজেকে থেকে তাহলে বাপি প্রচণ্ড বাধা দেবেন।

অনেকক্ষণ কোন জবাব দেয় না আইভি।

ইভা মনে মনে হাসে। আবার বলে, এ তোমার জয়ন্ত শীল নয়।

এবারও চুপ করে থাকল আইভি।

ইভা বুঝতে পারে, ওষুধ ধরছে একটু একটু কবে। তিল তিল করে যে ওষুধ প্রয়োগ করেছে ইভা, তিল তিল করেই তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকে রোগিণীর উপর। জয়ন্ত শীল ছিল একদিন আইভির প্রেমাকাশে অগুনতি নভোচারীর অন্ততম। প্রথম প্রথম তাকে মনে হত আইভির ভাগ্যগগনে সে একটি উজ্জল নক্ষত্র মাত্র। ক্রমে দেখা গেল উজ্জলতায় অগ্ন্যাগ্ন আকাশচারীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে জয়ন্ত শীল—সেই একদিন হল আইভির আকাশের একমাত্র চন্দ্র! আইভির বিশ্বাস ছিল ভবতারণ ঘোষাল যতই প্রগতিপন্থী আধুনিক হন না কেন, তিনি জ্ঞাত মানেন। দাদুর মৃত্যুর পর যথারীতি শ্রাদ্ধতর্পণ করেছিলেন তিনি। ইভার সম্ভাব্য একটি পাণিপ্রার্থীকে শুধু অত্রাঙ্গণ বলেই নাকচ করেছিলেন একদিন—আর সব দিক থেকে বাঞ্ছনীয় হাওয়া সত্ত্বেও। পৈতাগাছটা এখনও ভবতারণের বুক-পিঠকে আঠে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে প্রাচীনপন্থী সংস্কারের মতই। মদ খান, তবে মহালয়াতে উপবাস করে তর্পণও করেন। তাই আইভির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শীলের ছেলের সঙ্গে কন্যার বিবাহ কিছুতেই অনুমোদন করবেন না ঘোষাল সাহেব। সেই বিশ্বাসের জোর ছিল তার, গিয়েছিল বিদ্রোহীর মতই মাথা সোজা রেখে বাপের দরবারে জয়ন্তকে সঙ্গে নিয়ে। জানিয়েছিল জয়ন্তকে সে বিবাহ করতে চায়। অশ্বমেধ ঘোড়া আটকে লবকুশ যে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে, ভঙ্গিটা ছিল তার ঠিক তেমনি উদ্ধত। রামচন্দ্রের মতই যুদ্ধদান করেন নি ভবতারণ, আদর করেছিলেন, আশীর্বাদ করেছিলেন দুজনকে। জয়ন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। ভবতারণের বাধাটাকেই সবচেয়ে বড় বাধা বলে মনে হয়েছিল

তার। বেচারি চিনতে পারে নি আইভিকে। বাবা রাজি হলেন, বেকে বলল মেয়ে। কিছুতেই রাজি হল না জয়স্তুকে বিয়ে করতে। জয়স্তু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল—কার্যকারণে কোন সূত্র খুঁজে পাইনি সে। ইভা কিছু অবাক হয়নি। সে আইভিকে ঠিকই চিনেছিল। আর চিনেছিল বলেই আরও জোর দিয়ে বলল, বাপি কিছুতেই এ বিয়ে অনুমোদন করবেন না। এ তোঁর জয়স্তু শীল নয়।

ওষুধ ধরল। আইভি কুঞ্চিত ক্রান্তি বলে, এ জয়স্তু শীল নয় মানে?

মানে বাপি জাত মানেন। তবে সে জাত অর্থনৈতিক জাতিভেদ, জন্মগত নয়। বাপির মনুসংহিতায় জয়স্তু শীল আর আইভি ঘোষাল এক জাতের মানুষ; তারা ধনীর ছাল। কুশালু রায় ব্রাহ্মণ হলেও অসবর্ণ, সে দরিদ্র!

আইভি এ বিশ্লেষণের কোন জবাব দিল না।

মনে মনে হাসল ইভা।

স্বাহার চিঠি পড়ে কুশালু বুঝতে পারে, সে মর্যাস্তিক চটেছে।

স্বাহা লিখেছে, ‘আমার দুঃসাহসকে অভিনন্দন জানাবার কিছু ছিল না। আমি তোমার মত ভাববিলাসী সেন্টিমেন্টাল কবি নই। জীবনদর্শনে আমি পুরোপুরি প্র্যাগম্যাটিক। ভাল—কতটা ভাল তা যাচাই করি, মন্দ—কতটা মন্দ পরখ করি। ভালমন্দ বিচার না করে বাজি ধরার ভান করি না! তোমার মত মনে মনে কোন মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করা আমার কাছে পাগলামি; অবাস্তব একটা মনগড়া ছবিকে মানুষের চেয়ে বেশী মর্যাদা দেওয়া আমার মতে শুধু অশ্রায় অপরাধ নয়—পাপ! তাই তোমার সব খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আছে, এবং সে কৌতূহল কি করে চরিতার্থ করতে হয় তাও জানা আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেজেট হাতড়ে বি. এ.তে ফার্স্ট ক্লাশ সেকেন্ড, ইন্টারমিডিয়েটে নাইট এবং ম্যাট্রিকে চারটে লেটার পাওয়ার সংবাদ পেয়েই তৃপ্ত হইনি। তোমাদের ক্লাসের একটি মেয়ের বোন আমাদের কলেজে পড়ে, তার কাছ থেকে তোমার যাবতীয় সংবাদও পেয়েছি। তুমি না লিখলেও আমি জানি—তোমার চোখে চশমা নেই, হাতে নেই আংটি, ঘড়ি পর না তুমি। কানা-খোঁড়া নও জেনেই সন্তুষ্ট হইনি, এ কথাও জানি চিন্তা করবার সময় তুমি মাথার সামনের

চুলগুলো টানতে থাক। তোমার সহপাঠিনীর মতে অবিগ্ৰস্ত চুলে নাকি তোমায় আরও ভাল মানায় !

কে তোমার সেই সহপাঠিনী ? কি হবে নামটা বলে ? তুমি তো শুধু নামটাকেই চিনবে। মানুষটাকে তো চিনতে পারবে না। তাই নামটা জানানো অর্থহীন।

তোমার যুক্তি আমি মানি না। তোমাব মূর্তির কাছে আমি হার মানতে পারব না। আমার সমস্ত অপূর্ণতা নিয়েই আমি তোমার সেই মানসী মূর্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। এভাবে তোমাকে এড়িয়ে যেতে দেব না, আমার নারীসত্তাকে এ ভাবে অপমান করতে দেব না তোমাকে।

তুমি ভেবেছ কি ? এতই যদি মানসীমূর্তির প্রতি দরদ তোমার, তা হলে আমার উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ফেলতে কেন ? চিঠিগুলি পূবে হাওয়ায় ছেড়ে দিলেই তো কবিতাটা ভালমত জন্মত। চিঠি না লিখে কবিতা লিখলেই পারতে। বাঁধানো খাতায় তুলে বাথলে পারতে মানসী প্রতিমার উদ্দেশ্যে লেখা কবিতা।

শোন। টুকলির বিয়ে স্থির হয়েছে। পার্টনায় নিয়ে এসে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু মাসীমাব আগ্রহাতিশয্যে তাঁর ওখান থেকেই বিয়ে হচ্ছে। অনেক দিন ধরেই বিয়ের কথা হচ্ছিল—হঠাৎ দিন স্থির হয়েছে। ১৭ই আশ্বিন। ছেলে স্কলারসীপ নিয়ে আগামী নভেম্বরে বিলাত যাচ্ছে তাই আশ্বিনেই বিয়েটা দিতে হচ্ছে তাড়াহুড়া করে। আমি ১৩ই আশ্বিন অর্থাৎ পয়লা সেপ্টেম্বর বুধবার ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেসে কলকাতা পৌছাব ভোর পাঁচটা-দশে। তুমি স্টেশানে আসবে। কোন কারণেই যেন ভুল না হয়। ধুতি পাঞ্জাবি পরে এস। একডজন রজনীগন্ধার একটা তোড়া নিয়ে এস, যাতে তোমাকে চিনতে পারি আমি। আমার পরনে থাকবে—না ধূপছায়া রঙের ঢাকাই শাড়ি নয়, ডীপ নীল রঙের একটা ক্রেপ সিক। আমারও হাতে থাকবে একটা রজনীগন্ধার তোড়া। আমি সেকেণ্ড ক্লাস মেয়েদের গাড়িতে যাব। ট্রেন থেকে নেমে যদি তোমাকে না চিনতে পারি তাহলে ছইলারের স্টলের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করব আমি। তুমি নিশ্চয় আসবে। অন্যান্য কথা সাক্ষাতে হবে।’

চিঠিখানা কুশানু পেয়েছে আগস্টের বাইশ তারিখে। যথেষ্ট সময় হাতে রেখেই চিঠি লিখেছে স্বাহা। অর্থাৎ কুশানুকে একটা জবাব লেখবার সুযোগ

ও সময় দিয়েছে। জবাব লিখতে বসেও ছিল কুশাঙ্গ। কিন্তু কি লিখবে স্থির করে উঠতে পারে না। মনটা তার চঞ্চল হয়ে আছে।

কাল ইলাকে পড়িয়ে ফেরবার সময় ড্রইংরুমে সাক্ষাৎ হয়েছিল ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে। বসে বসে কি একটা রিপোর্ট পড়ছিলেন তিনি। কুশাঙ্গর সঙ্গে চোখোচোখি হতে হাত তুলে নমস্কার করেছিল কুশাঙ্গ। ভবতারণ ফাইলের দিকে তাকিয়েই বলেন, তোমার ছুটি হতে আর কতদিন বাকি ?

এখনও দিন সাতেক।

চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচটা মুছতে মুছতে ভবতারণ বলেন, সাপোস, ইউ টেক এ প্লেসার ট্রিপ টু দার্জিলিং।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কুশাঙ্গ। ওঁর কথা বলার ধরণই ওই। সোজা কথা সহজভাবে বলতে পারেন না। হয় শেষটা আগে বলেন, গুরুটা পরে, না হয় মাঝখান থেকে আরম্ভ করে সমাপ্ত করেন প্রারম্ভ দিয়ে। সমস্ত বক্তব্যটা না শুনলে ওঁর কথাবার্তা খাপছাড়া মনে হয়। এতদিনে ওঁর এ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কুশাঙ্গ সম্পূর্ণ অবহিত হয়েছে। ও অপেক্ষা কবে।

ভবতারণ নিজেই পরিষ্কার করেন তাঁর বক্তব্য—আইভিকে দার্জিলিং পাঠাতে হবে। ও অবশ্য একাই যেতে পারে কিন্তু আমি ঠিক তা চাই না। তুমিও যেতে পার। দার্জিলিং থানার ও সি জগদীশ আমার পরিচিত, তাকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। তার বাসাতেই উঠতে পার তুমি। আইভিকে পৌঁছে দিয়ে দিনকতক দার্জিলিং বেড়িয়ে ফিরে আসতে পার তুমি।

কুশাঙ্গ বুঝতে পারে এক্ষেত্রে তার ভ্রমণের যাবতীয় ব্যয়ভার ঘোষাল-সাহেবই বহন করবেন। ওর ভিতরে একজন ভবঘুরে আছে। বেড়াতে পারলে ও আর কিছু চায় না। ওর পক্ষে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা শক্ত। এদিকে পার্টনা থেকে স্বাহাও কলকাতায় আসছে। তাকে এড়ানোর এ এক অপূর্ব সুযোগ। স্বাহা যে ধরণের মেয়ে, হয়তো ওর মেসে এসেই হানা দিয়ে বসবে। সেটা সে চায় না। স্বাহার চিঠিতে কেমন যেন একটা চ্যালেঞ্জের সুর আছে। সেটা বরদাস্ত হয়নি কুশাঙ্গর। দৃষ্ট ভঙ্গিতে স্বাহা ওকে ছকুম করেছে হাওড়া স্টেশনে যেতে। যাবে না স্থির করেছিল মনে মনে। কিন্তু মনের উপর ওর জোর নেই। তাছাড়া স্বাহা যদি এসে মেসে হাজির হয়? তখন? সাময়িক পশ্চাদপসরণ মন্দ নয়। এই সুযোগে কলকাতা



ত্যাগ করাই সবচেয়ে নিরাপদ। সুতরাং সব দিক থেকেই ভবতারণের প্রস্তাবটা লোভনীয়, একমাত্র বাধা যাত্রাসঙ্গিনী হবে আইভি। কিন্তু অবিস্মিত ভাল কি আছে কিছু ছুনিয়ায় ?

ভবতারণের উদ্দেশ্যটা আন্দাজ করতে পেরেছে সে। কানপুরের সেই ভদ্রলোকের মেয়ে দেখার ব্যাপারটা শুনেছিল কুশানু ইলুর কাছে। মনে মনে খুশীই হয়েছিল। খুশী হয়েছিল অবশ্য অন্য কারণে—ভদ্রলোকের নাকে বামা ঘষে দিয়েছিল আইভি। বেশ করেছিল। কুশানু বুঝতে পারে যে ভবতারণ আন্দাজ করেছেন কানপুরের পাত্র এখন আকাশকুসুম। তাই কুশানুর দিকে নজর পড়েছে এবার। ওদের দুজনকে একটা স্বেযোগ দিতে চান তিনি। দেখতে চান কুশানু এবং আইভি পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে কি না। ভবতারণের মনোবিশ্লেষণ ঠিক হয়েছে কিনা যাচাই করতে বলে, পূজার ছুটির তো আর মাত্র সাতদিন বাকি। এখন যে আবার যাবেন আইভি দেবী ?

ভবতারণ গম্ভীর হয়ে বলেন ওদের পূজার ছুটিটা বড় নয়, তাছাড়া ও ছুটিতে দার্জিলিঙেই থাকবে বলছে।

কারণটা জিজ্ঞাসা করা যায় না। তাই এবার ঘুরিয়ে বলে, তাহলে ইলুকেও নিয়ে যাই না।

ওর হাফ-ইয়ালি হয়ে গেছে ?

কুশানুর মনে পড়ে, হয়নি। পরীক্ষা শেষ হলেই ছুটি হবে ওদের স্কুলের। ভবতারণকে যতটা এলোতুলো মনে হয় আসলে তো তিনি তা নন। এমনভাবে জবাবগুলি দিয়ে গেলেন যাতে ওদের যুক্তভ্রমণের উদ্দেশ্যটাকে বুঝতে দিলেন না কুশানুকে। তবু ও বুঝল ঠিকই।

কবে যেতে বলেন ?

শুক্রবারে আসাম-লিঙ্কে। শালিগুডি থেকে ট্যাক্সি নিয়ে চলে যেও বরং।

ভবতারণবারু নিজেরই এসেছিলেন ওদের তুলে দিতে। প্রথম শ্রেণীর একটি ছোট কামরা। চারটি বার্থ। পূজার ছুটির ভিড় এখনও শুরু হয়নি। কুশানুকে তাই নিরাশ হতে হল। ওরা দুজন ছাড়া তৃতীয় যাত্রী নেই কেউ ও কামরায়। মালপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে কুশানুর নজরে পড়ে ইভাও এসেছে স্টেশনে। সে এসেছে একেবারে শ্রীরামপুর থেকে সোজা—ওদের তুলে

দিতে। আইভির পাশে গিয়ে ইভা বসল। অন্তরঙ্গ সখীর মত কি কলবল করতে থাকে দুজনে নিঃশব্দে।

কুশানুর মনে পড়ল সেই শ্রীরামপুরের অভিযানের পর থেকে এ দীর্ঘ তিন চার মাস ইভা তার সামনে আসেনি একবারও, কথাও বলেনি একটিও। এর কারণটা কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। ইভাই একদিন আইভির সঙ্গে তার বিবাহপ্রস্তাব তোলে। ইতস্ততঃ করেছিল কুশানু, বিচলিত হয়েছিল ইভা। এখন সে সম্মতি দিয়েছে, কোথায় চটুল কৌতুকময়ী হয়ে উঠবে, না সরে গেছে নেপথ্যে। বুদ্ধিমতী ইভা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে কেন হঠাৎ কুশানুর উপর এই দায়িত্বটা দিয়েছেন ভবভারণ। ও শুধু রক্ষক হিসাবেই যাচ্ছে না, আইভির সঙ্গে একটা সম্ভাবনার সূত্রটা ষাটাই করতেই যাচ্ছে। স্তব্ধ যাত্রার পূর্বক্ষেণে ইভার একটা শুভেচ্ছাবাণীর প্রয়োজনীয়তা আন্তরিক ভাবে অনুভব করল সে।

কুশানু বাকের উপরকার মালপত্র ঠিক মত গুছিয়ে রেখে ইভার মুখোমুখী এসে দাঁড়ায়। হাত দুটি বুকের কাছে জড় করে ধবে বলে, নমস্কার। আমাকে একেবারে চিনতেই পারছেন না মনে হচ্ছে।

ইভা চকিতে একবার মুখ তুলে তাকায়। প্রতিনমস্কার করে না। বলে, চিনতে পারলেই যে সবসময়ে চিনতে হবে তার মানে কি?

পরমুহূর্তেই আইভির মাথাটা কাছে টেনে এনে নিম্নকণ্ঠে কি যেন বলতে থাকে। কুশানু সামলে নেয় নিজেকে। রীতিমত অপমানিত বোধ করে সে। আর কোন কথা বলার চেষ্টা না করে ও পাশের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে একলা।

ওর সৌভাগ্য—সময় হয়ে গিয়েছিল। অল্পক্ষণেই মধ্যেই গাড়ি ছাড়ল। একবার ইভার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে কুশানু, সে একদৃষ্টে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে।

অপম্রয়মান শিয়ালদহ স্টেশানের দিকে মুখ ফিরিয়ে আইভি একটা রেশমী ক্রমাল নাড়তে থাকে। কুশানুর কিন্তু কিছু ভাল লাগে না। ও পাশের বেঞ্চির একেবারে একপ্রান্তে চুপটি করে বসে থাকে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে।

এই মাত্র যে ঘটনাটা ঘটল, কুশানুর মনে হচ্ছে সেটা ইতিপূর্বেও ঘটেছিল তার জীবনে। এমন মাঝে মাঝে হয়। মানসিক রোগমুক্তির সন্ধানে কিছু

কিছু মনস্তত্ত্বের বই এনে এককালে পড়েছিল কুশানুর। তাই জানত এই জাতীয় ‘স্মৃত্যাভাস’ বা paramnesia-র পিছনে একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা সব সময়েই থাকে। যে ঘটনা প্রকৃতপক্ষে প্রথম শুনছি বা দেখছি, এরকম স্মৃতিবিভ্রমের ফলে হঠাৎ মনে হয় যেন পূর্বেই এ ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি। কেন এ ধরনের স্মৃত্যাভাস হয় তা বলা কঠিন অবশ্য। এক এক মনোবিদ পণ্ডিত এক এক কথা বলেন। অবশ্য বার্গিস প্রমুখ অধিকাংশ বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদের মতে এ রকম মনে হওয়ার পিছনে বাস্তব কোন অভিজ্ঞতা থাকেই। কুশানুর মনে হল একটি মেয়ের সামনে ঠিক এই ভঙ্গিতে আগেও একবার সে এসে দাঁড়িয়েছিল, যুক্তকরে নমস্কার করে চিনতে না পারার জ্ঞান অভিযোগ করেছিল। আর অতি পরিচিতা মেয়েটি হবু এই ভঙ্গিতে মুখ ঘুরিয়ে নিষে বলেছিল চিনতে পারলেই যে সব সময়ে চিনতে হবে তার মানে কি ?

কথাটা এই মাত্র শুনেছে সে, কিন্তু যেন এই প্রথমবার নয়। ইভার এই দেখেও-দেখতে-না-পাওয়ার উপেক্ষাভরা ভঙ্গিটি যেন তাব অতি পরিচিত। কোন একজনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বেদনাহত, অপমানিত হয়ে ফিরে আসার অভিজ্ঞতা যেন এই প্রথম নয় ওর। জানা গানের বেদনাবিধুর কলির মত, প্রথম শ্রবণের অনুভূতিটাকেই আর একবার নতুন করে আঘাত করল যেন।

কিন্তু কেমন করে তা হবে ? ইভার সঙ্গে ওর আলাপ মাত্র ছয় সাত মাসের। এর ভিতর এ ঘটনা আর ঘটেনি। এই কয়মাসের ঘটনা পরিষ্কার মনে আছে তার। সে স্মৃতি এত সহজেই বাপসা হয়ে যায়নি। এর ভিতর কোনদিন সে ইভাকে চিনতে না পারার অভিযোগ করেনি, ইভাও চিনতে পারা সত্ত্বেও এমন মুখ ঘুরিয়ে বসেনি কখনও। তা হলে ? অথচ ইভা ছাড়া দ্বিতীয় কোন মেয়ের সঙ্গে এ জাতীয় কথোপকথন ওর পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব।

কিন্তু তাহলে কেন মনে হচ্ছে ঠিক এ ঘটনা আগেও ঘটেছে ওর জীবনে ?

একটা গল্প মনে পড়ল কুশানুর। গল্প নয়, সত্য ঘটনা। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের জীবনের একটা ঘটনা। তিনি তাঁর এই কেস-হিস্ট্রিটা দিন-পঞ্জিকা থেকে প্রকাশ করে গেছেন। কোথায় পড়েছে মনে নেই, তবে কেস-হিস্ট্রিটা মনে আছে।

ডাক্তার বসু একবার একটি ভূতে পাওয়া রোগিণীর চিকিৎসা করতে

যান। মেয়েটির বয়স অল্প, ফিটের সময় ‘বক্তার’ হত—অর্থাৎ অনর্গল আবোল-তাবোল বকে যেত। সে বলত, তার নাম অমুক, তার গ্রাম তমুক, ইত্যাদি। একদিন ফিটের মধ্যে সে চীৎকার করে বলে ওঠে : তোদের বাড়ির মেয়ে এমন অশুচি হয়ে থাকে কেন? তাই তার উপর আমি ভর করেছি। আমি কে? কেন, রোজ বলি তবু শুনতে পাস নে। আমি অমুক গাঁয়ের অমুকের বউ গো! ভাতারের সঙ্গে ঝগড়া করে গলায় দড়ি দিয়েছিলুম। মাগো! শূন্যে ঝুলছিলুম গলায় ফাঁস আটকে। এ্যাদিনে তোদের মেয়ের দেহে এসে ভর করে বেঁচেছি।

রোগিনীর বাবা পোস্টাল গাইড দেখে গ্রামটির হৃদিস পান, আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, সেখানকার পোস্টমাস্টারকে চিঠি লিখে জানতে পারেন যে চার পাঁচ মাস আগে গাঁয়ে সত্যি সত্যি ঐ নামেব একটি জ্বীলোক স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া কবে আত্মহত্যা করেছিল। রোগিনীর পক্ষে সেই আত্মঘাতিনীর নামধাম জানার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কুশাহুর মনে আছে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু তাঁর কেস-হিস্ট্রিতে লিখেছিলেন, “রোগিনীর এক আত্মীয় ভূতে অগাধ বিশ্বাসী, তিনি আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যদি ইহা হিষ্টরিয়া বলেন, তবে এই সকল আশ্চর্য ঘটনা কিরূপে ঘটিল? আমি রোগিনীকে সুস্থ অবস্থায় অনেকবার প্রশ্ন করিয়াও কিছুই ধরিতে পারি নাই। সত্য কথা বলিতে কি, অনেকদিন পর্যন্ত আমি এই ব্যাপারের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারি নাই। হঠাৎ একদিন রোগিনীর ফিটের সময় উপস্থিত হই। ফিট না ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিলাম। ঘরের দেওয়াল-আলমারির একটা তাকে ‘বঙ্গবাসী’র কতকগুলি পুরাতন সংখ্যা ছিল। সময় কাটাইবার জন্য সেগুলি উন্টাইতেছি, এমন সময় রোগিনীর মুখে শোন। সেই গ্রামটির উল্লেখ দৈবাৎ দেখিয়া কোতূহলাবিষ্ট হইলাম। পাঠ করিয়া দেখি, ‘বঙ্গবাসী’র সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, ‘অমুক নাম্নী জ্বীলোক স্বামীর সহিত কলহ করিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছে।’ এইটুকু পড়িবামাত্র সমস্ত ব্যাপারটা আমার নিকট জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। হিষ্টরিয়াগ্রস্ত রোগিনী কোন না কোন সময়ে সেই সংবাদ পাঠ করিয়াছে, আর অজ্ঞাতসারে ঘটনাটি তাহার মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ফিটের সময় কল্পনায় সে নিজেকে ঐ আত্মঘাতিনী প্রেতাত্মা দ্বারা অভিভূত মনে করে। ফিট ছাড়িয়া গেলে



যোগিনীকে ‘বঙ্গবাসী’খানি দেখাইলাম। তাহার পর আর কখনও তাহার ফিট হয় নাই।”

কুশানুর মনে আছে ডাক্তার বন্থ মস্তব্য করেছিলেন : দৈবক্রমে কাগজখানি হস্তগত হইয়াছিল বলিয়াই প্রকৃত রহস্য প্রকাশ পাইল, নতুবা অন্য কোন প্রকারে ঘটনাব সঠিক তথ্য নির্ণীত হইত কিনা সন্দেহ।

কুশানুর মনে হল এই যে ওর মনে হচ্ছে এ ঘটনা তার জীবনে ইতিপূর্বেও ঘটেছে, এও হয়তো অমনি কোন একটা অভিজ্ঞতার ফল।

গাড়ি উইলিংডন ব্রীজ পার হয়ে গেল। আডচোখে একবার তাকিয়ে দেখে সামনের বেঞ্চিতে বসে আইভি একখানা ইংরাজি সিনেমা সাপ্তাহিক দেখছে। গাড়িতে ওঠার পূর্বে একটা কথাও হয়নি তার সঙ্গে। কামরার ভিতরের চেয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েই যেন স্বস্তি পেল। জানলা দিয়ে দেখা অপস্রয়মান দৃশ্যগুলির মধ্যেই অবগাহন করল কুশানু।

ট্রেনে যেতে যেতে এই একটা চিন্তা ওকে প্রায়ই অভিভূত করে। দৃশ্যপট অনববত বদলে যাচ্ছে। কোথাও ছোট ছোট গ্রাম, ছেলেরা খেলা করছে, খাটিয়ায়-বসা মেরজাই-গায়ে প্রোট মানুষটি ছঁকার কলকেতে ফুঁ দিচ্ছে। কোথাও ফাঁকা মাঠের মাঝখানে রাখাল-ছেলে নির্জন বিরলপত্র বাবলা-গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। পাচনবাডিতে ঠেস দিয়ে পিচুটিভরা দুচোখ মেলে দেখছে অপস্রয়মান গাড়িটাকে। কোথাও স্টেশান স্টাফ-কোয়ার্টারে মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য-জীবনের একটা খণ্ডচিত্র। হয়তো বারান্দায় বসে কেউ তেল মাখছে, নষতো বাগানে গাছের গোড়া খুঁড়ে দিচ্ছে। অথবা জানলার পর্দা একটু সরিয়ে, কাজলকালো দুটি নয়ন মেলে রেলবাবুর সত্ত্ববিবাহিতা বধু দেখছে ওর বাপের বাড়ির দেশের দিকে ছোট্টা রেলগাড়িটাকে। কুশানু দেখে আর ভাবে এই যে ছোট ছোট দৃশ্য আমরা দেখছি আর ভুলছি, অথচ একবারও মনে নিচ্ছি না যে এইসব দৃশ্যগুলিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে কুশানুর অজানা এক একটা সৌরজগৎ। সেখানে হাসি আছে, অশ্রু আছে, আছে বিরহ-মিলন, কলহ-অভিমান। ওদের ঐ জীবনচক্রের পরিক্রমায় কুশানুর কোন ঠাই নেই। ওদের সেই ঠাসবুনোট জীবনে কুশানু রায়ের পক্ষে একান্ত স্থানাভাব। সেখানে সে হাসিঅশ্রু বিজড়িত কুশানু রায় নয়—সে শুধু ট্রেনের কামরার একজন লোক। তার কাছে ওরা যেমন মাঠের মাঝখানে দাঁড়ানো রাখাল-ছেলে, খাটিয়ায় বসা একজন প্রোট অথবা রেলবাবুর সত্ত্ববিবাহিত একজন

নববধু । ওকে ওরা কেঁউ মনে রাখবে না । ট্রেনের কামরায় দেখা হাজারটা মুখের মধ্যে ওদের কাছে তার কোন বিশেষ নেই । কুশাহুও নিঃশেষে তুলে যাবে ঐ লাঠি ঠেকে দেওয়া রাখাল ছেলেকে, ঐ উচ্চান-বিলাসী রেলবাবুকে, কিংবা বাপের বাড়ির জন্তে মন কেমন করে ওঠা ঐ ডাগোর-চোখো নতুন বোকে ।

ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল কি একটা বেজগি-স্টেশনে । সিগন্যাল পায়নি বোধ হয় । জনশূন্য প্ল্যাটফর্ম । ডাকগাড়ির এ দুর্মতি হবে তা কি করে জানবে ঐ ঝিমসু মেঠাইওলা, আর নলীকোর্তা রেলকুলি ? আশপাশের কামরা থেকে কয়েকজন নেমে পড়েছে প্ল্যাটফর্মে । অর্ধৈর্ষ্য হয়ে উঠেছে দেড় মিনিটেই—যেন গন্তব্যস্থলে দেড় মিনিট পরে পৌঁছলে ওয়াটারলু যুদ্ধ জেতা সম্ভব হবে না ওদের । উকিরুঁকি মেরে দেখছিলেন ডিসট্যান্ট সিগন্যালটা দেখা যায় কিনা । কারও মতে সামনে একটা মালগাড়ি আছে, কারও মতে চেন টেনেছে কেউ, কেউ বলছেন লাইন মেরামত হচ্ছে । ওদের ভাষা ভাষা সংলাপ ভেসে আসছে । অনেকে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়ার অপরাধে অস্তিম ফতোয়া জারি করলেন—শালাব গভরমেন্ট না পালটালে আর কিছুটি হবে না ।

হঠাৎ ওদের কামরার ওপাশ থেকে কে যেন কাকে আচমকা ডেকে উঠল—নরু । এ, নরে—ন ।

কুশাহু এমন জোরে চমকে উঠেছে যে আইভি পর্যন্ত চকিতে মুখ তুলে ওর দিকে একবার তাকায় । কুশাহু লজ্জিত হয়ে আবার জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলে বসে থাকে । আইভি আবার ডুবে যায় সিনেমা সাপ্তাহিকে ।

সমস্তাটার আকস্মিক সমাধান হয়ে গেছে হঠাৎ । ঐ অচেনা লোকটা অকস্মাৎ ঐ ভাবে ডেকে ওঠায় ওর লুপ্ত স্মৃতি ফিবে এসেছে । ও এমন ভাবে চমকে উঠেছিল যেন ওকেই নাম ধরে ডেকেছে কেউ ।

ঘটনাটা ওর জীবনে ঘটেনি । ঘটেছে শরৎচন্দ্রের ‘দত্তা’ বইতে । বইটা কবে, কখন, কোথায় পড়েছিল তা আর আজ মনে নেই, কিন্তু পড়বার সময় নিশ্চয়ই সে নায়কের সঙ্গে একটা একাত্মবোধ অনুভব করেছিল । তাই দয়ালের বাড়িতে বিজয়া যখন নরেনকে চিনতে না পেয়ে বলেছিল—‘চিনতে পারলেই যে সব সময় চিনতে হবে, তার মানে কি ?’ তখন নরেনের বুকে যে বেদনাটা বেজেছিল সেটা বুক পেতে গ্রহণ করেছিল কুশাহু রায় ।

সব ভুলে গেলেও সেই বেদনার স্মৃতিটা নিশ্চয় আজও অমান হয়ে বিঁধে আছে ওর বুকে। তাই ইভার কথাটা শুনে ওর মনে হয়েছিল তার একটা পুরাতন ক্ষতেই বুঝি নতুন করে আঘাত পেল সে।

নতুন করে ভাবতে বসে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে কুশাহুর কাছে। বিজ্ঞান যে কারণে সেদিন চিনেও চিনতে পারেনি নরেনকে, আজ ইভাও কি সেই একই কারণে চিনতে পারল না তাকে? তার মানে ইভা তাকে ভালবাসে? চমকে ওঠে কুশাহু আপন মনেই। হয়তো তাই ঠিক, ইভা তাকে ভালবাসে, আর কুশাহু অজান্তে কখন মাড়িয়ে দিয়ে বসে আছে সেই নিভৃত প্রেমকে।

মাথাটা ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে আসছে কুশাহুর। ইভা নিশ্চয় তাকে ভালোবাসে। প্রথম দিন থেকে সব কথা খুঁটিয়ে মনে পড়তে থাকে তার। খাবারের থালা নিয়ে অন্নপূর্ণার মূর্তিতে তার নিত্য আবির্ভাব—বাড়ি থেকে বের হবার সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও ময়ূরকণ্ঠি রঙের মাইশোর সিঁক শাড়ি পরে থাকা, হঠাৎ কুশাহুর আগমনে ‘স্বপ্নোহু, মায়াহু, মতিভ্রমহু কণ্ঠঃ হু তাবৎ কলমেব পূর্ণ্যঃ’ উদ্ধৃতি মনে পড়ার কারণগুলি বুঝতে পারে। ইভা বলেছিল—আমি জানি আপনার মনের কথা। আপনি একটি মেয়েকে মনে মনে ভালবাসেন; আর এও জানেন তাকে দূর থেকেই শুধু ভালোবাসা যায়, তাকে ঘরে আনা যায় না।...এ কথা কেন বলেছিল ইভা? সে তো জানে না কুশাহুর মনের মাধুরী দিয়ে গড়া মানসী প্রতিমার কথা! তাহলে কাকে সে ‘মীন’ করেছিল?

কার কথা যে সে বলেছিল বুঝতে এবার আর ভুল হল না কুশাহুর। ইভা শুধু ভালবেসেই থামেনি, সে বিশ্বাস করেছে সেও ভালবাসা পেয়েছে। ওর আরও মনে পড়ে সেই মৃত্যুভয়তাড়িত বিহ্বল একটি মুহূর্তের কথা। ইভা যখন আশ্রয় খুঁজেছিল ওর বুকে! স্বামীসান্নিধ্যবঞ্চিতা অনাদৃত্য একটি পূর্ণযৌবনা নারী ক্ষণিক নিরাপত্তার সন্ধানে এসে পড়েছিল কুশাহুর বুকে। ওর দ্রুতস্পন্দিত নরম বুকের যে অম্লরগন শুনেছিল কুশাহু বুক পেতে সেখানে শুধুই কি ছিল মৃত্যুভয়ের আর্তি? আর কিছুর আভাস কি সে পায়নি? মৃত্যুবিভীষিকা দূরে চলে যাবার পরেও কয়েকটি মুহূর্ত দেরি হয়েছিল ইভার নিজের অবশ দেহটা আলিঙ্গনমুক্ত করে নিতে। সে অবশত কি শুধুই মৃত্যুভয়জনিত—সে বিলম্বের কি আর কোন ভাষ্য হতে পারে না? ওর উষর



জীবনের অযুত মুহূর্তের ভিতর থেকে সেই আট-দশ সেকেন্ড কি চুরি করেনি ইভা? ওর জীবনের লক্ষ কোটি মুহূর্তের ঐ আট দশটি সেকেন্ড কি শাখত আসন পাতেনি ওর স্মৃতিব যাদুঘরে!

আর নির্বোধ কুশানু তাকে আত্মসংবরণের স্বেযোগ মাত্র না দিয়েই হানল নতুন আঘাত : আপনার বাবাকে বলবেন, তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজি আছি।

মরমে মরে যায় বেচারি। বুঝতে পারে কেন সেই দিনের পর থেকে ওর সামনে এসে দাঁড়ায় না ইভা। কেন আজ তাকে চিনতে পারার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি। কুশানু যে তার সলজ্জ প্রেমকে পদদলিত করে ছুটে চলে এসেছিল আইভির মদিরারস্ত্রিম উষ্ণ প্রেমের সন্ধানে।

আইভি। চোখ তুলতেই চোখোচোখ হয়ে যায় তার সঙ্গে। হয়তো চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে নানা অভিব্যক্তি ফুটে উঠছিল ওর মুখে—একদৃষ্টে তাই লক্ষ্য কবছিল আইভি। ও চোখ তুলে তাকাতেই আবার দৃষ্টি নত করে বইতে। কুশানু এদিকে ফিরে বসে। এভাবে নীরব যাত্রাটা বিসদৃশ, দৃষ্টিকটু—কিন্তু ওর একেবারেই ইচ্ছা করছে না এখন আইভির সঙ্গে কোন বাক্যালাপ। ওর মনটা ভরে রেখেছে ইভা, দেহটা আটকা পড়েছে আইভির সান্নিধ্যে।

আপন মনেই আত্মবিশ্লেষণ কবে চলে কুশানু। একটা অদ্ভুত মানসিক রোগে সে ভুগছে আকৈশোর। কোন ডাক্তারের পরামর্শ নেবার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই—চেপ্টাও করেনি কখনও। এটা কি রোগ তা সে জানে না। ডাক্তারী শাস্ত্রে যদি এর নামকরণ না হয়ে থাকে তবে কুশানু নিজেই তার নামকরণ করতে পারে উইমেনোকোরিয়া। রোগনির্ণয় অর্থাৎ ডায়াগনসিস তো হল, এখন জানতে হয় রোগের উৎপত্তিস্থল। কেন হল এ রোগ, আর কি ভাবে সারবে।

কুশানুর বিশ্বাস রোগেব কারণটা হচ্ছে ওর জীবনের বিচিত্র পরিবেশ। শৈশব থেকেই নারী সাহায্য পায়নি সে। মাকে হারিয়েছে জ্ঞান হবার আগে। বিমাতাকে পায়নি কোনদিন। বিমাতার কন্যা ছিল না একটিও। মাসী, পিসি, দিদি, বউদি—কিছুই জোটেনি ওর বরাতে। পাড়াপ্রতিবেশীর কোনও অস্থঃপুরচারিকার সঙ্গেও যদি দৈবাৎ ঘনিষ্ঠ হওয়ার স্বেযোগ হত তাহলে এ দশা হত না। ওর বাবা ছিলেন ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী। যেখানেই বদলি হয়েছেন সেখানেই ও দেখেছে আরণ্যক জীবনকে। শৈশব পার করে কৈশোরে পদার্পণ করল যখন, তখন বাবা বদলি হয়ে এসেছেন



একটা আধা শহরের সাব-অফিসে। তখন প্রতিবেশী ভদ্রলোকদের মেয়ে-বউ-গৃহিণীদের যে না দেখেছে তা নয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে বোন-বউদি-মাসীমার সম্পর্ক পাতাবার মত মনটা গেছে জঙ্গলে হারিয়ে। সেই যুগ থেকেই নত হয়ে গেছে ওর দৃষ্টি।

ঋগ্বেদ মূনির মত নিষ্কলুষ হলে ভাবনা ছিল না—তার একটা গতি হতে পারত, কিন্তু অভিজ্ঞতা না থাকলেও অজ্ঞ ছিল না সে। তাই ঋগ্বেদের মত চোখ তুলে তাকাতে পারত না। মিরান্দার মত নির্জন দ্বীপে পিতার সান্নিধ্যে নরনারীর যৌনবোধের সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকেই বেড়ে ওঠেনি। শকুন্তলার মত তপোবনের ছায়া পড়েনি ওর জীবনে—কপালকুণ্ডলার মত কাপালিক-প্রভাবিত জীবন নয় ওর। ওরা সবাই সমাজ সংসার থেকে ঘটনাচক্রে দূরে সরে গিয়ে মাহুষ হয়েছে—পূর্ণযৌবনের মাঝখানে হঠাৎ আবিষ্কার করেছে জীবনের আদি সত্যকে। তারপর কাব্য-উপন্যাসের ঘাত-প্রতিঘাতে ভেসে গেছে তারা। কিন্তু কুশাহু তো জীবনরহস্যের আদি সত্যকে মধ্য যৌবনে প্রথম জানে না—আর সে তো ওদের মত একটা লেখকের মনগড়া কিছু নয়, সে যে রক্ত-মাংসের মাহুষ।

মোট কথা এতদিনে ও বুঝতে শিখেছে নারীভীতিটা তার স্বকপোল-কল্পিত। একজন সাধারণ পুরুষমাহুষের যে জৈবিক বৃত্তি আছে—তারও তাই আছে। সেদিন গজাবক্ষে একটি এক-তারা-জ্বলা সন্ধ্যায় ও প্রথম বুঝতে শিখেছে এই সত্যটা। দ্রুতস্পন্দিত একটি বুকের ট্রে-টর্কায় ও শুনেছে সেই গোপনবার্তা বুক পেতে। হয়তো দৃষ্টিবিভ্রমটাও একটা সাময়িক রোগ—চিকিৎসাযোগ্য মানসিক বিকারমাত্র। সেই হিষ্টিরিয়া রোগিণীর মত তার রোগমুক্তির বিশল্যকরণীও হয়তো লুকিয়ে আছে লাইব্রেরীর কোন এক তাকে। কেউ যদি সেই বিশেষ পৃষ্ঠাটি খুলে ধরে ওর চোখের সামনে—দেখিয়ে দেয় এই রোগের প্রকৃত উৎপত্তিস্থলের আদি উৎসমুখ—তাহলেই হয়তো রোগমুক্তি হবে ওর। কিন্তু গ্রাশনাল লাইব্রেরীর গন্ধমাদনের কোন তাকের কোন গ্রন্থের কোন পৃষ্ঠায় লুকিয়ে আছে সেই বিশল্যকরণী—কে তার সন্ধান এনে দেবে? হয়তো এবার ‘বঙ্গবাসী’র পৃষ্ঠায় নয়, বঙ্গনারীর দেহেই পাঠ করতে হবে সে সংবাদ। মনের নিরুদ্ধ কামনাই নাকি এ জাতীয় রোগের উৎপত্তিস্থল। অন্তত বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদ তাই বলে থাকেন। কি সেই নিরুদ্ধ কামনা, কেমন করে তা চরিতার্থ হবে তা কুশাহু জানে না। আনাজ করে,

হয়তো বিবাহই ওর রোগমুক্তির একমাত্র রাজপথ ; কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে না। যদি তা না হয়, তাহলে সে ভুলের মাশুল যে দিতে হবে দুজনকে ! এখন কোন কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে না কাউকে, কিন্তু তখন ?

ইভা ওর জীবনে প্রথম নারী। ইভা তাকে ভালোবাসে। সে ? হ্যাঁ, এতক্ষণে স্বীকার করতে বাধ্য হয় কুশানু। সেও ইভাকে ভালবাসে। মনটা একটা স্বাস্থ্য নিঃশ্বাস ফেলে। নিজের মনকে সে চিনতে পারেনি এতদিন। মনের গোপনলোকে তিল তিল করে গড়ে উঠে ছিল ওর প্রেমের তাজমহল। না হলে সেদিন কিছুতেই জিজ্ঞাসা করতে পারত না ইভাকে—চেষ্টা চেষ্টা না বলে যদি চুপি চুপি কথা বলে তখন কি বলবে সে, তুমি না আপনি ! আর এ প্রশ্নের জবাব দিতে বেধে যেত না ইভার। না হলে, সেই চরমতম মুহূর্তে কিছুতেই সে বলতে পারত না—ভয় কি ইভা, আমি তো আছি !

কুশানুর উপেক্ষিত যৌবনের ইতিকথায় তার অজান্তেই এনেছে ইভা প্রথম প্রেমের স্পর্শ—ওর প্রাণপন্দের পাপড়ি দল মেলেছে সূর্যোদয়ের প্রথম আলোকস্পর্শের ছোঁওয়ায়।

শুধু কি তাই ? কে বলতে পারে হয়তো ঐ স্বামীত্যাগী মেয়েটির অনাদ্রিতা যৌবনের পূর্বাকাশে সেও প্রথম উদয়ভানু। সূর্যাস্তের সঙ্গে হয়তো তার মিলনই হয়নি কখনও— ! কে জানে।

তবু !

হ্যাঁ, ইভা অগ্রপূবা ! আজও সে লুকিয়ে লুকিয়ে পুড়িং তৈরী করে। ইভা আইভি নয়। সে তার নিষ্ঠাবান মাতামহীর দোহিত্রী, তার একনিষ্ঠ মায়ের কন্যা। তাই বিন্দুমাত্র পদস্থলন সে নিজেই সহ্য করবে না। তাই আজও সে শবরীর প্রতীক্ষায় দিন গুনছে—যদি ফিরে আসে সূর্যাস্ত। শ্রীরামপুরের বনেদী জমিদারবাড়ির সেই লাজনত্র বধুটিকে—ঠিকই বলেছে ইভা—শুধু দূর থেকেই ভালোবাসা যায়। কুশানুর নিরুদ্ব কামনাসিকু মন্থনে যে হলাহল উঠে আসবে তার প্রতিষেধক অমৃতের ঝারি হাতে ইভা কখনও উঠে আসতে পারে না। ওর রোগমুক্তির বিশল্যকরনী আর যেই এনে দিক ওকে—সে ইভা নয়। ইভা অস্তিত পারবে না, পারা সম্ভব নয়। তার চেয়েও বড় কথা পারা উচিত নয় !

গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে আসে।

বর্ধমান।

অর্থাৎ প্রায় দু ঘণ্টা কেটে গেছে। গাড়ি এসে প্রবেশ করে সীতাতোপ মিহিদানার ছায়াতলে। কুশানু মুখ বাড়িয়ে একটা চা-ওয়ালাকে ডাকে। বেলা এগারটা। কিন্তু চায়ের নাকি কোন সময় নেই। অর্থাৎ সব সময়ই চায়ের সময়। দু ভাঁড় চা কেনে। ওর কার্যাবলী আইডি লক্ষ্য করছে ঠিকই পত্রিকা পড়তে পড়তে।

চা খাবেন তো? আহ্নন।

চায়ের ভাঁড়টা বাড়িয়ে দেয় কুশানু।

আমায় বলছেন? অবাক হওয়ার ভান করে আইডি।

কুশানু হেসে বলে, ঘরে যখন তৃতীয় ব্যক্তি নেই, তখন আপনাকে ছাড়া আর কাকে বলব?

আইডি তেমনি অবাক দৃষ্টি মেলে বলে, বলেন কি! গত দু ঘণ্টা ধরেই তো ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। এতক্ষণ ধরে সব কথা আমাকেই বলছিলেন নাকি? কী কাণ্ড! আমি তো মন দিয়ে এতক্ষণ একটা কথাও শুনিনি।

এবার অবাক হওয়ার পালা কুশানুর: গত দু ঘণ্টা ধরে আমি কথা বলেছি?

বলেন কি? বিড়বিড় করে কত কিছু বলে চলেছেন। কখনও ধমক দিচ্ছেন, কখনও হাসছেন, কখনও ছোটছেলেরা যেমন দেয়াল দেখে চমকে চমকে ওঠে তেমনি চমকে উঠছেন।

কুশানু লজ্জা পায়, বলে, আপনি এতক্ষণ তাহলে কিছু বলেননি কেন?

নিজের ঘরে কোন অনাখীয়া মহিলার সঙ্গে বাক্যালাপ আপনি হয়তো পছন্দ করবেন না ভেবে।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, ওর দুর্বলতার কথা কিছুটা জেনেছে আইডি। সম্ভবত তার দিদির কাছ থেকে। কতটা বলেছে ইভা? ইভাই বলেছে তো? না কি আইডি আন্দাজে একটা টিল ছুঁড়েছে ওর লাজুক প্রকৃতিকে ব্যঙ্গ করে? তাই নিঃসংশয় হবার জন্য বলে, আমার সম্বন্ধে এমন ধারণা হল কেন আপনার?

আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে-আসা কোন এক হতভাগিনীর কাছেই শুনেছিলাম মনে হচ্ছে।

তিনি কি এ কথা বলেননি যে তাঁর বন্ধুত্ব আমি স্বীকার করে নিয়েছি?

এবার আর অভিনয় নয়। সত্যিই অবাক হয়ে আইভি বলে, কই, না তো!

হেসে কুশামু বলে, ভাগ্যে আপনি জুজসাহেব হননি। যে ভাবে এক পক্ষের সওয়াল শুনে রায় দেওয়ার অভ্যাস আপনার, তাতে সব মামলাই ফেসে যেত। নিন, ধরুন।

আইভি হাত বাড়িয়ে চায়ের ভাঁড়টা নেয়। একটা নয়, দুটোই। জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। বলে, কি বলে এই অখাতি পাঁচনগুলো খেতে চাইছেন আর খাওয়াতে চাইছেন আমাকে?

নিজেই সে উঠে যায় দরজার কাছে। রেলওয়ে ক্যাটারিঙের একজন তকমা-আটা বয়সকে ডেকে এক পট চা আর দুটো টোস্ট অর্ডার করে। একটু পরেই ঝকঝকে প্লেটে করে চা-খাবার দিয়ে যায় বেয়ারা। বোলপুরে নিয়ে যাবে এসে। তখন লাঞ্চ সার্ভ করার অগ্রিম অর্ডারও লিখে নিল। নিপুণ হাতে টোস্টের ওপর মাখন লাগাতে লাগাতে চটুল ভঙ্গি করে আইভি বলে, বেশ, আপনার তরফের সওয়ালটাও শুনি।

কুশামু কোন কথা বলে না। এই সামান্য ঘটনাটায় সে যেন বেশ বড় রকম একটা ধাক্কা খেয়েছে। খোলা মন নিয়ে সে এসেছিল আইভির সঙ্গে আলাপ করতে, বন্ধুত্ব করতে। কিন্তু সে মন ওর ভেঙে গেল এই ছোট ঘটনাটায়। ওর মনে হল এই মেয়েটি কোনদিন এসে দাঁড়াতে পারবে না ওর পাশে। জোর করে ওদের মেলানো যাবে না। সে মিলের মধ্যে লেগে থাকবে নিত্য অশান্তি। ওরা ভিন্ন ধাতুতে গড়া, দেখতে একরকম হলে কি হবে। পোড়ামাটির ভাঁড় আর চীনে মাটির কাপ যেন। আগুনের তাপে পোড়-খাওয়া মাটির ভাঁড়কে রাখা যায় না ফুলকাটা শোখিন চীনেমাটির কাপের পাশে।

কি হল? আপনি যে কোন জবাব দিলেন না?

কিসের, কি জবাব দেব?

কেউ বন্ধুত্ব করতে এলে আপনি মুখ ফিরিয়ে থাকেন কি না।

মুখ ফিরিয়ে থাকব কেন?

ফিরিয়ে না থাকুন, গোমড়া করে তো থাকেন।

সেটা আমার দোষ নয়, আমার সৃষ্টিকর্তার।

তার মানে আপনার এই গম্ভীর মুখ সত্ত্বেও আমাকে ধরে নিতে হবে যে,



ইচ্ছে হলে আপনার সঙ্গে এ দীর্ঘ যাত্রায় দু'একটা কথা বলতে পারি আমি।  
সারাক্ষণ আমার মুখ বুজে না থাকলেও চলবে ?

নিশ্চয়। আপনাকে সঙ্গ দেবার জন্মেই আপনার বাবা আমাকে পাঠিয়েছেন।

লেট এলোন মাই ফাদার!—হঠাৎ ধমকে ওঠে আইভি। যেন কুশান্ন  
এই মাত্র ওর বাপ তুলে গাল দিয়েছে একটা।

চমকে ওঠে কুশান্ন। সেটা লক্ষ্য করে মেয়েটি। নিজের এই হঠাৎ  
কক্ষস্থরে যেন লজ্জিত হয়ে নরম স্বরে বলে, বলছিলুম, বাবার হুকুমে এসকট করা  
যায়, সঙ্গদান করা যায় না—যদি না নিজের কোন তাগিদ থাকে।

এ মেয়েও যে লজ্জা পেতে জানে, এটা বোধ করি জানা ছিল না। কুশান্ন  
তাই উপভোগ করে ওর লজ্জা পাওয়ার অভিব্যক্তিটা; হেসে বলে, নিজের  
তাগিদ আছে কিনা, তা তো পরখই করলেন না, তখন থেকে শুধু ধমকই  
দিচ্ছেন।

আইভি হাসলে। কাপে লিকার ঢালতে ঢালতে বলে, পরখ করে দেখতে  
অবশ্য পারি। কিন্তু আমি ইভা নই। তাই কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এলে  
আমি আপনি-আজ্ঞে করতে পারি না।

বেশ তো, না হয় তুমিই বলবেন।

তাই কি পারি, যতক্ষণ না অপর পক্ষও নেমে আসছে আমার সমতলে!  
বলে আইভি ধূমায়িত চায়ের কাপটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলে।

চায়ে একটা চুমুক দিয়ে কুশান্ন বলে, বেশ, তুমিই বলছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য-  
বশতঃ প্রথমেই তোমাকে একটা কটু কথা বলতে হচ্ছে। চা তুমি ভাল করতে  
জান না, চায়ে চিনি কম হয়েছে।

আইভি ছেলেমানুষের মত ঠোঁট উলটে বলে, দুর্ভাগ্য শুধু তোমার নয়  
কুশান্ন, আমারও। তাই একটা কটু কথা দিয়ে শুরু করতে হচ্ছে এই 'তুমি'  
পর্যায়ের আলাপ। চা তুমি খেতে শেখনি। চা-খোরদের দায়িত্ব শুধু চুমুক  
দেওয়াতেই নয়, নিজ কচি অনুযায়ী চিনি মিশিয়ে নেওয়াতেও। তোমার  
কাপে চিনি কম নয়, দেওয়াই হয়নি।

'থ্যাঙ্ক' বলে কুশান্ন স্ফগার পটটা টেনে নিতে নিতে।

থ্যাঙ্ক-নয়—থ্যাঙ্কস, একাধিক ধন্যবাদ আমার প্রাপ্য। প্রথমতঃ চা করে  
দিলাম, দ্বিতীয়তঃ চা খাওয়ার আধুনিক এটিকেট শেখালাম।

ক্রমশঃ বেশ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে ওদের বন্ধুত্ব। কুশান্ন লক্ষ্য করে

সে কোন জড়তা বোধ করছে না। হাসি-ঠাট্টা মঞ্চরায় বেশ ভাল দিবে যাচ্ছে। পায়ের পাতা থেকে ওঠা সেই সিরসিরানিটার কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। অস্থখটা ওর সেরে গেছে নাকি? ধুয়ে গেছে গন্ধার জোয়ারে? শেয়ালদা স্টেশানে এ ঘরের নিজনতাটাকে ও ঠিক বরদাস্ত করতে পারেনি, মনে হয়েছিল কামরাটায় আরও দু' একজন যাত্রী থাকলে যেন ভাল হত। তখন কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল মনে মনে। আশা করেছিল অস্তুত বর্ধমানে নিশ্চয় কেউ উঠবে ওদের কামরায়। এখন সে এতটা সহজ হয়ে উঠেছে যে বর্ধমান স্টেশান ছেড়ে কখন আবার দুটি যাত্রীকে নিয়ে রওনা হয়েছে ট্রেনেব সাথে এ কামবাটা তা খেয়ালই হয়নি। কথা প্রসঙ্গে কুশানু বলে, তোমাকে একটা অভিনন্দন জানানো হয়নি।

অভিনন্দন কিসের?

ইলুর কাছে কানপুরী ইন্টারভ্যুর বিবরণ শুনলাম। তখনই মনে হয়েছিল তোমাকে একটা অভিনন্দন জানানো উচিত। ছেলেমেয়ের বিবাহ জিনিসটাকে এইসব প্রাচীনপন্থী বুদ্ধরা—

বাধা দিয়ে আইভি বলে, বিবাহ ব্যাপারে তুমি বুঝি নব্য-পন্থী?

একেবারে। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে।

না নেই। আমি বাজ্রি বাখতে পারি।

কুশানু বলে, না, রেখ না, খামোখা হেরে যাবে।

যাবো না। আমি জানি তোমার কি মত।

জান? বেশ, বল।

তোমার মতে বাপ মা ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে নাক গলাতে আসবে না। তারা পছন্দ মত নিজেরাই মনের মানুষ বেছে নেবে। তাই নয়?

ঠিক তাই। তোমারও কি তাই মত নয়?

না, নয়।

তা হলে তোমার মতটা কি?

আমার মতে marriage itself is a vulgar taboo! ওটা একটা কুসংস্কার।

নব্যপন্থী কুশানু রায়ের দ্বিতীয় প্রশ্ন করার অবস্থা নেই।

আইভি মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে থাকে, আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত,

তাহলে বিয়ে জিনিসটাকে আমি আইন করে উঠিয়ে দিতাম। নতুন ছাঁচে ঢালতাম সমাজকে।

কুশাঙ্কু এতক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে ; বলে, সেই নতুন ছাঁচে ঢালা সমাজের একটু আভাস যদি দিতে—

তুমি সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাস কর ? কম্যুনিজমে ?

ইকনমিক্সের সেরা ছাত্রটি সংক্ষেপে শুধু বলল, করি।

তুমি বিশ্বাস কর, খেতখামার কলকারখানা সব কিছুর উন্নতি ব্যাহত হয়ে আছে পুঁজিবাদীদের জন্য ? ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবস্থা চালু থাকার জন্য ?

কুশাঙ্কু স্টেটমেন্টটা সংশোধন করে দেয়, আমি মনে করি পুঁজিবাদ এসব অগ্রগতির অন্ততম প্রধান বাধা।

তাহলে আমার থিয়োরীটা এখন মন দিয়ে বোঝবার চেষ্টা কর।

আইভি বলতে থাকে তার উর্বর মস্তিষ্কের নয়া আবিষ্কারের থিসিস্। সে সমাজতন্ত্রবাদের একজন গোঁড়া সমর্থক। কম্যুনিজম আমাদের ব্যক্তিগত মালিকানার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছে—ধর্মের আফিং-খাওয়া নেশার হাত থেকে মুক্ত করেছে সমাজকে। আইভি কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট নয়। ব্যক্তিগত ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা যদি যৌথ হতে পারে তবে যৌথ সংসারই বা হবে না কেন ? কোন একটি বিশেষ নারীর উপর কোন একটি পুরুষের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে নেওয়া হবে কেন ? ক্ষেত-খামার শস্য দেয়, কল-কারখানা দেয় ফিনিস্ ড প্রডাক্টস্—সবাই তা ভাগ কবে নেয় যৌথ কারবারে। নারীও একটি মেশিন—মানব-শিল্প প্রজননের যন্ত্র। তার উপর সমাজের যৌথ দাবী থাকার ব্যবস্থা কেন হবে না ?

বাধা দিয়ে কুশাঙ্কু বলে, তা কেমন করে হবে ? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যদি স্থনির্দিষ্ট না থাকে তাহলে পিতৃপরিচয় দেবে কেমন করে ভবিষ্যৎ যুগের মানুষ ?

আইভি অগ্নানবদনে বলে, দেবে না। পিতৃপরিচয় কথাটা তো একটা taboo ! গোত্রের মত, জাতের মত, কালার-ক্রীডের মত ! তখন কেউ বলবে না আমি অমুক লোকের ছেলে—বলবে আমি অমুক গাঁয়ের ছেলে।

কিন্তু শৈশবে কে তাকে পালন করবে ? বাপের যদি ঠিক না থাকে তবে বাপের দায়িত্বেরও তো ঠিক থাকবে না।

দায়িত্ব স্টেটের—প্রাথমিক দায়িত্ব যে যৌথ পরিবারের সম্ভান সেই

কোয়াপারেটিভ স্টোলাইটিং। মাতৃসন থেকে শিশুরা যাবে নার্সারীতে ; সেখান থেকে স্কুলে, কলেজে, যুনিভার্সিটিতে—ক্রমে কর্মক্ষেত্রে। পিতৃপরিচয় কপালে এঁটে যাবে না। এখনও একদল অনাথ আশ্রমের ছেলেরা এমনি করে মাহুষ হয়ে ওঠে—তাদের পিতৃপরিচয় থাকে না। পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ মনীষীর পিতৃপরিচয় নেই। তাতে তাঁদের বড় হতে বাধেনি। বাধা হয় বিয়ে করতে কারণ আর পাঁচজন তাদের মত পিতৃপরিচয়হীন নয় বলে।

কুশাহু ধমক দিয়ে বলে, তোমার এই থিয়োরীটাই ভালগার!

তোমার তাই মনে হচ্ছে কারণ তুমি একটা সেট-আইডিয়া নিয়ে থিয়োরীটা বিচার করছ। সংস্কারমুক্ত বিচারশক্তি নেই তোমার। একটা পূর্ব-সংস্কারের ইয়ার্ড-স্টিকে মাপতে চাইছ আমার থিসিসকে। সেই মাপকাঠিটা বাক্য—সেটা আমার থিয়োরীর দোষ নয়।

উত্তেজিতভাবে কুশাহু বলে, তুমি বলছ কি! হাজার হাজার বছরের এই সমাজ-ব্যবস্থা, দেশ-কাল-ভৌগোলিক ব্যবধান অতিক্রম করে মেনে নেওয়া সর্বজনস্বীকৃত স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক তুমি এক তুড়িতে উড়িয়ে দিতে চাও?

আইভি বলে, উত্তেজিত হলে বিচার করা যায় না। যুক্তি দিয়ে তর্ক কর। প্রমাণ কর আমার যুক্তিতে গলদ আছে। প্রথমত হাজার হাজার বছর কোন নিয়ম চললেই প্রমাণ হয়না সেটা সুনিয়ম। নিকোবারে, আফ্রিকায় আর প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপপুঞ্জে ক্যানিবলেরা মাহুষ খায়। ওদের সমাজব্যবস্থাও হাজার হাজার বছরের পুরনো, আর্থ সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন তাদের ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত পেট্রিয়াক্যাল ফ্যামিলির এ ব্যবস্থা খুব কিছু প্রাচীন নয়। বড়জোর দশ কি পনের হাজার বছরের পুরাতন। তার আগেব লাখখানেক বছর পিতৃপরিচয় বলে কোন কিছু ছিল না মাহুষের ইতিহাসে। তখন স্বামী-স্ত্রী বলে কোন কিছু ছিল না—ছিল নারী ও পুরুষ। স্মৃতরাং সময়ের দীর্ঘতাই যদি একটি ব্যবস্থার ভালমন্দের মাপকাঠি হয় তোমার মতে, তাহলে আমার মতটাই ভাল বলে প্রমাণিত হচ্ছে নাকি?

তুমি কি সেই অসভ্য যুগে ফিরে যেতে বলছ মনুষ্য সমাজকে?

অসভ্য কথাটার আমার আপত্তি আছে। আমি বলছি প্রাচীনযুগের সেই সমাজ-ব্যবস্থাটাই আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া উচিত।

কেন, অসভ্য কথাটার তোমার আপত্তি কিসের?



সভ্যতার সংজ্ঞা কি তোমার মতে ?

কৃশাঙ্কু রাগ করে বলে, সভ্যতা শব্দটা এমন কিছু আপেক্ষিক নয় যে তুমি আর আমি তার ভিন্ন অর্থ করব । সভ্যতার সংজ্ঞা একটাই ।

আইভি অনেক কিছু জানে না । রাঁধতে জানে না, শেলাই করতে জানে না, মশারী টাঙাতে জানে না, কিন্তু অস্তুত একটি জিনিস সে সূচাক্রমে সম্পন্ন করতে জানে—তর্ক করা । এমন আটঘাট বেঁধে স্থির মস্তিষ্কে তর্ক করে যে ওদের শিক্ষায়তনের বড় একটা কেউ ওব সঙ্গে তর্ক করতে ভেড়ে না । আইভি একটু হেসে বলে, তবু তর্কশাস্ত্র বলে বিচার্যবিষয়ে ব্যবহৃত শব্দগুলির সংজ্ঞা আগে নির্দিষ্ট কবে নেওয়া উচিত । সভ্যতার সংজ্ঞা হিসাবে আমি যদি শচীশের জ্যেষ্ঠামশাই জগমোহনবাবুর দেওয়া ডেফিনিসানটা ব্যবহার করি তুমি আপত্তি করবে ?

জগমোহনবাবু কে ? তাঁর ডেফিনিসানটাই বা কি ?

সভ্যতা হচ্ছে প্রচুবতর লোকের প্রভুততম সুখসাধনের স্বব্যবস্থা ।

মেনে নিলাম ।

বেশ, তা হলে গান পাউডার, ডিনামাইট, এ্যাটমিক এনার্জি আবিষ্কারকে তুমি কি বলবে ? সভ্যতার অগ্রগতি ?

একটু ভেবে নিয়ে কৃশাঙ্কু সাবধানে বলে, নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি নয় ।

আর ক্যামেরা, টেলিভিসান, রেডিও আবিষ্কারকে ?

নিঃসংশয়ে সভ্যতার অগ্রগতি বলব । কেন, তুমি বল না ?

না ।

কেন নয় ? রেডিও আবিষ্কৃত হওয়াতে কত সহস্র লোকের সুবিধা হয়েছে । যেসব কথা, যেসব গান, বক্তৃতা, বানিং কমেণ্টারি তারা কিছুতেই শুনতে পেত না, সেগুলো শুনতে পাচ্ছে—এটা সভ্যতার অগ্রগতি নয় ?

সভ্যতার পূর্ব স্বীকৃত সংজ্ঞা হিসাবে নিশ্চয়ই নয়—

কেন নয় ?

আমি যদি বলি ভারতবর্ষের বারো আনা লোক জানে না রেডিও কি বস্তু, শতকরা চব্বিশজন জানে রেডিও কি, আর শতকরা একজনের রেডিও আছে তা হলে কি খুব বেহিসাবী কথা বলা হয় ?

কি জানি, আমার ধারণা নেই ।

ধারণা না থাকলেও আমি বোধ হয় খুব কিছু ভুল বলিনি । তাহলে দেখ

রেডিওর আবিষ্কার শতকরা একজনকে দিয়েছে আনন্দ, আর চব্বিশজনকে দিয়েছে রেডিও না থাকার দুঃখ। বাকি বারো আনা লোকের অবস্থা এ আবিষ্কারে কোন লাভ ক্ষতি হয়নি। রেডিওযন্ত্র যদি আবিষ্কার না হত তাহলে বস্তুত এই চব্বিশজনের কোন দুঃখ থাকত না। শতকরা ঐ একজনেরও কোন ক্ষতি হত না, কারণ তাদের কোন খেদ থাকত না। চাঁদে যেতে পারছি না বলে আজ তোমার আমার মনে যেমন কোন খেদ নেই। আজ থেকে একশ বছর পরে হয়তো অনেকেই সে দুঃখ পাবে যখন তার প্রতিবেশীকে চন্দ্রমুখী রকেটে রওনা হতে দেখবে।

কুশাম্বু বিরক্ত হয়ে বলে এ তো শুধু তর্কের বোঁকে তর্ক করছ তুমি।

মোটাই না। একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝবে আমার একটা কথাও অযৌক্তিক নয়। তুমি যাকে সত্যতা বলছ তা প্রচুরতর লোককে এনে দিয়েছে শুধু প্রভূততর অভাববোধ। জটিল কবে তুলেছে জীবনকে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদটা শুধু বাড়িয়ে তুলেছে। মিল-মালিক আর মিল-শ্রমিকের জীবন-যাত্রায় যে প্রভেদ সেটা ছিল নিওলিথিক যুগের যে-কোন দুটি মানুষের জীবনযাত্রায় অচিস্তনীয়। তোমার সত্যতা মিলিয়ানে একজনকে করেছে মিলিওনেয়ার—প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে সেই সোভাগ্যবানকে, বিনিময়ে ন লক্ষ নিরানব্বই হাজার ন শো নিরানব্বই জনকে পীড়িত করেছে অসংখ্য অভাববোধের যন্ত্রণায়। তুমি যাকে অসত্যযুগ বলছ, মানে আমি যাকে প্রাচীনযুগ বলছি, সে যুগে অধিকাংশ মানুষের এ দুঃখ ছিল না—কাঁচি সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মত তারা জানত না তাবা কি পায়নি। কিন্তু আমাদের মূল তর্কের বিষয় ছিল ‘বিবাহ’ প্রথাটা বহুল ও দীর্ঘকাল প্রচলিত একটা কুসংস্কার কি না।

এ তর্কের কচকচি আর ভাল লাগছিল না, কুশাম্বুর। সে হেসে বললে, নিশ্চয় কুসংস্কার। মেয়েদের সতীত্ব জিনিসটাও একটা কুসংস্কার তা হলে?

আইভি কিন্তু হাসে না, জোর দিয়ে বলে, নয় কি? সতীত্বের সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করলে তুমি চটে যাবে, কিন্তু ভেবে দেখ কথাটার কোন মানে হয়? চুমু খেলে বাংলা সিনেমাব সতীত্ব হানি হয়, ইংরাজি ছবির হয় না। আয়নার ভিতর দিয়ে মুখ দেখালেও হানি হয় পদ্মিনীর, পঁচিশবার ডিভোর্স করলেও হয় না কোন হলিউড স্টারের! সতীত্ব একটা টাবু নয়?

এবার বিরক্তি স্বীকারই করে বসে কুশাল, এ আলোচনা আমার আর ভাল লাগছে না।

তার কারণ তোমার দীর্ঘদিনের সংস্কারে আঘাত লাগছে। আরও কারণ হচ্ছে যুক্তি দিয়ে তুমি আমার মতকে খণ্ডন করতে পারছ না।

কুশাল রাগ করে বলে, সে জগ্রে নয়, আমার খারাপ লাগছে এই জগ্রে যে, যে কথা তুমি মানো না—শুধু তর্কের খাতিরে তাই বলে চলেছ বলে।

আমি মানি না কেমন করে জানলে?

তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তাহলে তুমি সেটাকে দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না?

নিশ্চয়ই করব। তবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে না হলে করব না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কুশাল বলে, প্রচলিত বিবাহ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তোমার এ জেহাদের কারণটা কি?

ব্যক্তিগত মালিকানা আমি পছন্দ করি না বলে। রামবাবুর স্ত্রী শামবাবুকে ভালবাসেন, তবু তিনি শামবাবুর ঘরে শুতে যেতে পারেন না। কেন? না স্ত্রীর উপর রামবাবুর মনোপলি কারবার।

কেন? সে ক্ষেত্রে রামবাবুর স্ত্রী তো বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনতে পারেন।

পারেন না। কারণ ক্যাপিটালিস্ট রামবাবু আইন বাঁচিয়ে একচেটিয়া ব্যবসা করছেন। স্ত্রীকে ধরে মারেন কিনা তার সাক্ষী নেই, না খাইয়ে রাখেন কিনা তার প্রমাণ নেই। অন্য স্ত্রীলোকের ঘরে যেদিন রাত্রিবাস করেন সেদিন রাত্রে বাড়িতে থাকার সাজানো এ্যালোবাই রেখে যান। ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, আদালত বিবাহবিচ্ছেদ মেনে নিলেও সমাজ নেয়নি। তৃতীয়ত, হয়তো রামবাবুর স্ত্রী সত্যিই চিরদিনের জন্য ঠাই বদল করতে চান না। হয়তো রামবাবু বড়লোক, শামবাবু ভবঘুরে আর্টিস্ট।

অর্থাৎ মিসেস রাম গাছেরও খেতে চান, তলারও কুড়াতে চান।

ঠিক তাই। আমার ইউটোপিয়ান সমাজ-ব্যবস্থায় সেটা সম্ভব।

কুশাল জোর দিয়ে বলে, শুধু সম্ভব হলেই তো চলবে না, দেখতে হবে সেটা বাঞ্ছনীয় কি না। রামবাবুর ব্যভিচারিণী স্ত্রীর একদর্শ বাসনায় ইচ্ছন যোগানো আদৌ উচিত কিনা সেটাও ভেবে দেখতে হবে।

ব্যভিচারিণী আর কদর্য বিশেষণ দুটো তুমি তোমার অন্ধ সংস্কারের

জন্মেই ব্যবহার করেছ। সংস্কার-মুক্ত হলে দেখতে এটা খুবই স্বাভাবিক একটা জৈব প্রেরণা, খিদে পাওয়া, ভেঁটা পাওয়া অথবা ঘুম পাওয়ার মত।

কিন্তু রামবাবুর জীকে এ ক্ষেত্রে খাওয়াবে কে? ভরণ-পোষণ করবে কে?

যখন যার কাছে থাকবে তখন সেই। কেউ না থাকলে সেট। বিনিময়ে মেয়েটি তার শ্রমদান করবে। এ মাসে রাম, ও মাসে শাম, পরের বছর হয়তো যদুবাবুর সংসারযাত্রা নির্বাহ করবে। লোকে যেমন বাটলার রাখে, সেক্রেটারী রাখে তেমনি জীর সঙ্গে একটা কণ্ট্রাক্ট করবে।

কুশান্নুর গায়ের মধ্যে কেমন যেন ঘিন্‌ঘিন্‌ করে ওঠে। বলে, এ আলোচনা বন্ধ কর বাপু। আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

সে কথা তুমি আগেও একবার বলেছ। হয়তো জেনারালাইস করাতে তোমার সংস্কারে বাধেছে। স্পেসিফিক হলে এটাকেই কাব্য বলে মনে হত। আমার একটি বান্ধবীর কথা বলি। স্বামী তাকে নেয় না—ওদের মতের মিল হয়নি, আলাদা থাকে। বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে উঠছে না নানা কারণে। আমি জানি একফোঁটা ভালবাসা পাওয়াব জন্য কাঙাল হয়ে আছে তার মন, তার উপেক্ষিত অনাদ্রিত যৌবন বিদায় নিচ্ছে। তলে তিলে। এমন সময়ে সে হঠাৎ একটি ছেলেকে ভালবাসল। অথচ মুখ ফুটে সে কথা সে স্বীকার করতে পারল না। তুমি কি চাও গুমরে গুমরে কৈদে মরুক সে সারা জীবন?

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে কুশান্নুব। কার কথা বলছে আইভি? কি বলতে চায় সে?

ভাগ্যক্রমে ট্রেনটা বোলপুরে এসে পৌঁছনোতে ছেদ পড়ল এ প্রসঙ্গে। বয় এসে প্লেটগুলো নিয়ে যায়। লাক্স আসে পরিবর্তে। স্টেনলেস-স্টীলের ছোট ছোট বাটিতে থালা দুটি সাজানো। গদির ওপর খবরের কাগজ বিছিয়ে ওরা আহারে বসল। সোভাগ্যই বলতে হবে কুশান্নুর ট্রেনে এলেন নতুন একজন যাত্রী। একজন বিদেশী মহিলা। সম্ভবত যুরোপীয়, আমেরিকানও হতে পারেন, নিঃসন্দেহে টুরিস্ট। এখান থেকে যখন উঠছেন তখন নিশ্চয় শাস্তিনিকেতন দেখতে এসেছিলেন। মালপত্র বাক্সে গুছিয়ে দিয়ে পয়সা নিয়ে কুলিটা চলে গেল। মহিলা বৃদ্ধা, ঈষৎ স্থূলকায়া। ওদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বসলেন বেঞ্চের একপ্রান্তে। কুশান্নু ইংরেজিতে প্রশ্ন করে, কেমন দেখলেন শাস্তিনিকেতন?



ভদ্রমহিলা একগাল হেসে বলেন, ইয়েস।

কৃশানু হকচকিয়ে যায়। ভদ্রমহিলা কানে খাটো নাকি? তাই এবার একটু উচ্চতরকণ্ঠেই প্রশ্ন করে, গোয়িং ফার?

এবারও একগাল হেসে উনি বলেন, ভেরি নাইস।

কৃশানুর কণ্ঠরোধ হলে কি হবে, খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছে এবার আইভি। বিদেশিনীও অপ্রস্তুতের একশেষ। তাড়াতাড়ি কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, নো ইংলিশ।

কৃশানু মনে মনে বলে, সেকথা এখন বলা বাহুল্য।

আইভি কিন্তু হাল ছাড়ে না। ফরাসী ভাষায় প্রশ্ন করে, ফ্রেঞ্চ জানেন?

বুড়ি মেম একেবারে লাফিয়ে ওঠে। জড়িয়ে ধরে আইভিকে। বেচারি আজ একমাস যাবৎ মন খুলে কথা বলতে পারেনি সেই দিল্লী কনসুলেট অফিস ছাড়ার পর থেকে। আইভিকে একেবারে গ্রাস করল বুড়ি মেম। আইভিও ফরাসী বলার লোক পায় না। কথিত ভাষাটা অভ্যাস নেই ওর, উচ্চারণ এবং ব্যাকরণও হয়তো নিভুল নয়; কিন্তু তাতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না আলাপে। অনর্গল দুজনে বকতে থাকে। বুড়ি মেমই কথা বলে বেশী। কৃশানু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। আরও খুশী হল বাকের উপরে রাখা মেমের ট্রাঙ্কের দিকে নজর পড়ায়। লেবেল আঁটা আছে—মেম দার্জিলিঙের যাত্রী। অর্থাৎ আজ রাত্রে এই নিরালা কামরায় একটি অতি আধুনিক তরুণীর সঙ্গে সতীত্বের সংজ্ঞা নিয়ে আর তাকে তর্ক করতে হবেনা। ওর কণ্টকিত মন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

আরও কয়েক ঘণ্টা নিবিঘ্নে কেটে গেল। তিন পাহাড় স্টেশানটা পার হওয়ার সময় সে একবার আইভির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করল অদূরবর্তী পাহাড়ের তিনটি চূড়ার দিকে—কিন্তু ওরা তখন ফরাসী সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মিল খুঁজতে ব্যস্ত।

হঠাৎ একসময় আইভি বলে, তোমার স্কেচবুকটা এনেছ তো, দেখি।

কৃশানু অবাক হয়ে বলে, স্কেচবুক! তুমি কি করে জানলে সে কথা?

বাজে কথা বল না। স্কেচবুকটা বার কর। এ ভদ্রমহিলার নাম মাদাম সার্লট রচেস্টার। একটা ফ্রেঞ্চ জার্নালের ইনি আর্ট ক্রিটিক।

আইভির উপরোধে অগত্যা বার করতে হল ছবির খাতাখানা। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দেখলেন ছবিগুলি। খুব খুশী হলেন। একটা সাপুড়ের

স্কেচ-চিত্র ঠাঁর খুব ভাল লাগল। বারে বারে সেটার প্রশংসা করলেন।  
আইভি বলে, এটা ওঁকে উপহার দাও না কুশানু।

আমার আপত্তি নেই।

ছবি পেয়ে বুড়ি মেম তো ভারী খুশী, বলে, আর্টিস্টকে নাম সই করে দিতে হবে। কুশানু তাই দিল। আরও খানিকক্ষণ গল্পগুজবের পর গাড়ি এসে পৌছাল স্করিগলিঘাটে।

নৈশ আহার স্ত্রীমারেই সারল ওরা। তারপরে ওপারে পৌছে মনিহারীঘাট থেকে আবার নতুন গাড়ি। কুশানু তিনটে কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে আগে গিয়ে পৌছল। মালপত্র সাজিয়ে নিতে নিতেই আইভিরা এসে গেল। বুড়ি মেমের কি মতিচ্ছন্ন হল, কিছুতেই রাজি হল না ওদের সঙ্গে এক কামরায় যেতে। কুশানু বারে বারে প্রতিবাদ করল অঙ্গভঙ্গি করে, আইভিকে দিয়েও বলালো, কিন্তু মেম নাছোড়বান্দা। আবার কুলি ডেকে তার মালপত্র বার করে চলে গেল পাশের একটা কামরায়। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়। আবার দুজনে এক কামরার নির্জনে। কুশানু কি করবে ভেবে পায় না। অসহায়ের মত বলে, ম্যাডাম রচেস্টার আমাদের ওপর চটে গেলেন কেন বল তো?

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে আইভি মুখটা মেরামত করছিল, মুচকি হেসে বলে, কি জানি!

কিন্তু রাখে কেউ মারে কে? শেষ মুহূর্তে এক মাড়বারী ব্যবসায়ী এসে উঠলেন ওদের কামরায়। চতুর্থ বার্থটা খালিই পড়ে রইল। কুশানুর মনে হল আইভি যেন আশাহত হয়েছে। মাড়বার-তনয় উপরের বার্থে নিজের বিছানাটা বিছাতে থাকেন। গাড়ি ছাড়ল। আইভি বাথরুমে গেল বেশ বদলাতে—নৈশ পোশাক পরতে। আইভির বিছানায় পড়েছিল একখানা পত্রিকা। সময় কাটাবার জন্য সেটা হাতে তুলে নিয়ে কুশানু দেখে, সেটা ইংরেজি মাসিক নয়, ফরাসী ম্যাগাজিন—চিত্রবহুল। অন্ত্রমনস্কের মত প্রথম পাতাটা খুলেই চমকে ওঠে। পৃষ্ঠার মাথায় লেখা আছে—টু মিসেস কে. রয়, নীচে রচেস্টারের সই আর আজকের তারিখ।

রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যায়। একটা নিরুদ্দ রাগে ফুলতে থাকে কুশানু। তাই ম্যাডাম রচেস্টার ওদের ছেড়ে অন্য কামরায় গিয়ে উঠল। কিন্তু এ মিথ্যাচরণ কেন করল আইভি? কি চেয়েছিল সে? নির্জন ঘরে কুশানুর

সঙ্গে রাত্রিটা কাটাতে ? তার মানে— ? সত্যিই কি সে পাপপুণ্য মানে না ? সত্যীত্বধর্ম স্বীকার করে না !

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে আইভি দেখল, কুশানু ঘুমিয়ে পড়েছে নিজের বিছানায় ।

সারারাত ঘুম হল না কুশানুর । শুধু এপাশ ওপাশ করল । ওর মনে হল আইভিও ঘুমতে পারছে না । এপাশ ওপাশ করছে বারে বারে । মাড়বারী ভদ্রলোক অঘোরে ঘুমোচ্ছেন । ভোর রাতে ওর মধ্যেই কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল । হঠাৎ কে তাকে ঠেলা দেওয়ায় কুশানু উঠে বসে, দেখে আইভি ওকে ডাকছে । আইভির পরণে একটা টিলে স্যাকস, পায়ে চপ্পল, মাথায় একটা রেশমী রুমাল বাঁধা, চিবুকের নীচে গিঁট দেওয়া । কুশানু চোখ মেলে দেখে, ঘরে মাড়বারী ভদ্রলোক নেই । ভোর হয়ে গেছে । ঘরের ভিতরের সবুজ আলোটা স্নান হয়ে আসছে বাইরের আলোর ক্রমগুঞ্জলো । আইভি ওকে জানলার বাইরে তাকাতে বলল ।

অপূর্ব দৃশ্য, তুষারকিরীট পর্বতশ্রেণী রাতারাতি মাথা তুলে জেগে উঠেছে দিগন্তের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত । পূর্ব আকাশটা লালে লাল । এখনও সূর্যোদয় অবশ্য হয়নি । ঠাণ্ডা একটা বাতাস বইছে কাচ-তোলা খোলা জানলা দিয়ে । এমন একটি নিষ্কলুষ প্রভাত আসেনি কুশানুর জীবনে, কিন্তু ওর মনে হল, দেহমন ওর ক্রান্ত, ভারাক্রান্ত ।

আইভির রসবোধকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাল, অহেতুক বকবক না করে শাস্তভাবে সে বসে আছে জানলার ধারে ।

কেমন যেন আলিঙ্গি লাগছে, মুখ ধুতে যেতেও ইচ্ছে করছে না । কুশানুও নিশ্চুপ গিয়ে বসল জানলার ধারে । হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হল তার । প্রশ্ন করল, কটা বাজে ?

সওয়া পাঁচটা ।

মনে মনে হাসল কুশানু । আজ বুধবার, তেরই আশ্বিন অর্থাৎ পয়লা সেপ্টেম্বর, এখন সওয়া পাঁচটা !

ট্রেনজার্নি-ক্রান্ত আইভির মুখখানা দেখতে দেখতে ওর মনে ফুটে উঠল আর একখানি মুখ । আর একটি মেয়ে । হাওড়া স্টেশনে ছইলারের স্টলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একা । দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে আছে । হাতে

একগুচ্ছ রজনীগন্ধা—বিষল, স্নান। পরনে ওর ধূপছায়া রঙের একখানা ঢাকাই শাড়ি, কপালে টিপ।

কিন্তু তা কেমন করে হবে? স্বাহার তো ডীপ নীল রঙের একটা ক্রেপ সিঁদুর পরে আসার কথা। তাহলে ওর মনশ্চক্রে ভেসে ওঠা এ মেয়েটি কে?

কাল সারারাত তোমার ঘুম হয়নি, নয়? আইভি প্রশ্ন করে।

না, একেবারে ভোর রাতে একটু ঘুম এসেছিল। এ ভদ্রলোক কখন নেমে গেলেন?

এই মাত্র।

আমার যে সারারাত ঘুম হয়নি তা জানলে কি করে?

আমারও যে ঘুম হয়নি।

কেন ঘুম হল না বল তো আমাদের?

আইভি একটু চুপ করে থেকে বলে, তোমার কেন হল না জানি না, আমার হল না নিজের পাপে।

তুমি পাপপুণ্য মান তাহলে?

আইভি হেসে বলে, সে কথা আলোচনা করতে হলে প্রথমে পাপপুণ্য বলতে তুমি কি বোঝ তা জানতে হয়।

রুশারুও হেসে বলে, অর্থাৎ পাপপুণ্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হয়।

ঠিক তাই। কিন্তু তাহলে তুমি চটে যাবে, তাই ‘পাপ’ কথাটা উইথড্র করে আমি বলব নিজের দোষে।

নিজের কি দোষে?

কাল একটা অন্তায় করেছিলাম, জানলে। ওই ফরাসী ভদ্রমহিলাটি আমাদের স্বামী-স্ত্রী বলে ভুল করেছিলেন। তাঁর সে ভুলটা আমি ভেঙে দিইনি।

আমি জানতাম।

আইভি চমকে উঠে বলে, জানতে? বাজে কথা। কেমন করে জানতে?

ভদ্রমহিলার ভাবগতিক দেখেই সন্দেহ হয়েছিল আমার, নিঃসন্দেহ হলাম ঐ ম্যাগাজিনটা দেখে।

আইভি চমকে ওঠে, বিছানার উপর পড়ে থাকা মাসিক পত্রিকাটির দিকে একনজর দেখে নিয়ে বলে, কিন্তু তুমি তো ওটা দেখনি।

দেখেছি। তখন তুমি বাধক হয়ে ছিলে।



আইভি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নীচু গলায় বলে, কই, তুমি তো কিছু বলনি।

বলব আবার কি ?

এমন মিথ্যা কথা কেন বললাম আমি, তা জানতে ?

কুশানু তেমনি নির্বিকারভাবে বলে, প্রশ্ন করার প্রয়োজন ছিল না, কারণটাও আমি জানতাম।

ধক্ করে জলে ওঠে আইভির চোখ দুটো। উত্তেজিত হয়ে বলে, মানে ? কি জানতে তুমি ?

কুশানু দৃঢ়স্বরে বলে, এ আলোচনা থাক আইভি। তুমি অনেক কিছু মান না—যা আমি মেনে থাকি। ভারতীয় হিন্দু নারীর সম্বন্ধে আমার মনে একটা পবিত্র ধারণা আছে ; সেটা তুমি নাইবা ভেঙে দিলে।

হঠাৎ কি যেন হল আইভির। একেবারে চুপ করে গেল। সামান্য কটা কথা, কিন্তু মনে হল সে যেন প্রচণ্ড একটা আঘাত পেয়েছে এ কথায়। মুখরা আইভি মুক হয়ে গেল মুহূর্তে। জানলা দিয়ে পূর্বদিগন্তের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে।

কুশানু লক্ষ্য করে, দিনের প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়েছে আইভির কপালে। রেশমী রুমালের ফাঁক দিয়ে উকি-মারা দু এক গোছা কুস্তলায়িত কুস্তলচূর্ণ উড়ছে এলোমেলো হাওয়ায়। আইভির দু চোখের কোণে চিক্চিক করছে দু বিন্দু জল—হৈমন্তী শিশিরবিন্দু যেন ! অছিলা হোক আর সত্যি হোক—চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়ার অজুহাতে রুমাল দিয়ে চোখ দুটো রগড়ে মুছে নেয় একবার। কুশানু হুঃখ পায়। বোঝে অত্যন্ত রুঢ় আঘাত করেছে সে। হয়তো ওর অনুমান সত্য নয়। মুখে বড় বড় বুকনি দিলেও আইভি হয়তো মনে মনে এখনও কিশোরীই রয়ে গেছে। হয়তো নিছক একটা কৌতুকপ্রিয়তাই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই ছেলেমানুষীতে। রচেস্টার বাংলা বোঝে না, কুশানু বোঝে না ফ্রেঞ্চ, এই সুযোগে দুজনকে লুকিয়েই হয়তো সে একটা মজার খেলায় মেতে ছিল। আর কিছু উদ্দেশ্য হয়তো সত্যিই ছিল না তার।

ক্ষোভগ্লান কণ্ঠে বলে, আমাকে মাপ কর আইভি।

রুমাল দিয়ে কয়লার গুঁড়োটা বার করতে করতে আইভি বলে, মাপ চাইবার তো কিছু নেই ; এ অপমান আমার প্রাপ্য।

একটু কাছে সরে এসে কুশাহু বলে, আমি বুঝতে পারিনি, একটা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়েই তুমি বুড়ি মেমকে ঠকাতে চেয়েছিলে। তোমার আচরণের যে কদর্ষ ইঙ্গিত আমি করেছি নিশ্চয়ই সেটা অন্য় হয়েছে আমার।

আইভি নতনেত্রে বলে, ভুল ধারণা তোমার। কোতুকপ্রিয়তার জন্য মিথ্যা কথা বলিনি আমি, আমার অন্য উদ্দেশ্য ছিল।

ক্র কুঁচকে কুশাহু বলে, অন্য উদ্দেশ্য? মানে? কি বলতে চাইছ তুমি? আইভি জবাব দেয় না।

রোধ চেপে যায় কুশাহু, বলে, তুমি কি সত্যিই একটা রাত আমার সঙ্গে নির্জন ঘরে কাটাতে চেয়েছিলে?

আশ্চর্য নির্লজ্জ মেয়েটা! মাথা না তুলে বলে, হ্যাঁ।

অনেকক্ষণ কথা খুঁজে পায় না কুশাহু। কি বলতে পারে এরপর! আর কি বাকি রইল জানতে? আর কি জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে? পারলে, এখনই চেন টেনে গাড়ি থেকে নেমে যেত সে। যে নারী পাপ-পুণ্য মানে না, সতীত্ব-ধর্ম মানে না—পরপুরুষের সঙ্গে রাত্রিবাস করবার জন্য যে এমন মিথ্যা কুহক রচনা করতে পারে, আর সেকথা অকুণ্ঠস্বরে স্বীকার করতে যার বাধে না, সে তো কালসাপ! তার সঙ্গে এক মুহূর্ত থাকতে আছে? যে কোন মুহূর্তে ও তো বাঁপিয়ে পড়তে পারে কুশাহুর উপর তার একটা খেয়াল চরিতার্থ করতে।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে না?

আর কি জিজ্ঞাসা করব?

কেন একটা রাত তোমার সঙ্গে নির্জন ঘরে কাটাতে চেয়েছিলাম?

কুশাহু প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে, প্লিস আইভি। স্টপ। সব নির্লজ্জতারই একটা সীমা থাকা উচিত।

আইভি চিৎকার করে না। শাস্ত কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলে, ওয়েল, আই কাণ্ট স্টপ নাউ! কিছু না শুনতে কথা ছিল না; কিন্তু আধখানা শুনে যা ইচ্ছে কনক্লুশান টানতে দেব না তোমাকে। আমার সব কথা তোমাকে শুনতে হবে। তারপর শিলিগুড়ি পৌঁছে তুমি অন্য ট্যাক্সি নিও, আমি বাধা দেব না।

কুশাহু কোন কথা বলে না।

জানলার বাইরে দিয়ে ঐ দূর পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে আইভি একেবারে অন্ধ গলায় গল্প বলার স্বরে শুরু করে, আমার অনেক বন্ধু আছে, জানলে? ঘনিষ্ঠ বন্ধু সব। বয়স ফ্রেণ্ড। পুরুষ-বন্ধু আমাদের হস্টেলেব আরও অনেক মেয়ের দু'একটি কবে আছে। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠে আমার কাছে ওরা দাঁড়াতে পারে না। ওরা একসঙ্গে একটি ছটির বেশী বন্ধুর সঙ্গে মিশতে পারে না। আমার অন্তত ডজনখানেক বন্ধু আছে—তার মধ্যে জনা ছয়েকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমার।

বাধা দিয়ে কুশাহু বলে, এ সব কথা আমার শুনে কি লাভ?

আইভি যেন শুনতেই পায় না ওর কথা। একভাবে বলে চলে, কিন্তু আমার ভ্যানিটি শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নয়। ঐ দু'একটি বন্ধুর কাছেই ওরা ধরা দিতে বাধ্য হয়েছে—তারা নিজেদের অস্পৃশ্য রাখতে পারি নি, এ বিষয়ে আমিই একমাত্র ব্যতিক্রম। আমাকে যেন নেশায় পেয়ে যায়, জানলে? স্কি করবার সময় নিপুণ খেলোয়াড় দেখাতে চায় অতলস্পর্শ খাদের কত কাছ থেকে সে ঘুবে আসতে পারে। আমারও যেন তেমনি নেশা চেপে যায়। নতুন কোন ছেলের সঙ্গে আলাপ হলেই ইচ্ছা করে ওকে আমার দিকে আকৃষ্ট করি, ওকে নিয়ে খেলাই। কিন্তু সাপ-খেলানোর মত এমন করে খেলাব যে ওর প্রতিটি দংশন পড়বে আমার হাতের বাঁপিতে—স্পর্শ করতে পারবে না সে আমায়। তুমি বিশ্বাস করবে কি কুশাহু যে আমার প্রায় আধ-ডজন অন্ধ প্রেমিক আছে, অথচ এতটা বয়সেও আমি জানতে পারিনি পুরুষ মানুষে চুমু খেলে কেমন লাগে। আমি জানি, এ কথা শুনে তোমার একটা দুরন্ত লোভ হচ্ছে, কিন্তু আমি এ কথাও জানি তুমি এক পা এগিয়ে এলেই আমার ডান হাতটা সজোরে গিয়ে পড়বে তোমার বাঁ গালে, যেমন পড়েছিল ইতিপূর্বে কয়েকজনের।

কাঠের পুতুলের মত বসে থাকে কুশাহু।

আইভি এক নাগাড়ে বলে চলে, কাল আমার একটা দুরন্ত লোভ হয়েছিল, জানলে? একটা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে ইচ্ছা হয়েছিল। এতদিন এটা সাহস পাইনি। কারণ মনের মত মানুষও পাইনি। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বিশ্বাস করতে পারিনি। হাজার হোক আমার চেয়ে ওদের গায়ের জোর বেশী! কাল তোমাকে দেখে ভীষণ লোভ হল আমার। মনে হল তোমার সঙ্গে রক্তধার কক্কে রাত কাটানো চলবে। তোমাকে দেখে,

কি জানি কেন, আমার মনে হয়েছিল, তুমি একেবারে পশু হয়ে উঠবে না।  
আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আমাকে স্পর্শ করবে না তুমি।

কিন্তু কাল যে তুমি বলেছিলে, কেউ তোমার গায়ে হাত দিলেও সেটাকে  
তুমি দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না ?

তুমি ভুলে গেছ কুশানু। আমি বলেছিলাম, ইচ্ছার বিরুদ্ধে না দিলে  
মনে করব না।

কিন্তু নিজের মনকেই কি মানুষ চিনতে পারে ? মধ্যরাত্রেব নির্জনতা  
মানুষের মনে মোহ বিস্তার করে। কে জানে, খাদের মুখে এসে হঠাৎ  
মোড ঘোরার ইচ্ছাটা যদি মিলিয়ে যেত তোমার ? যদি ঝাঁপ দিয়ে পড়ার  
ইচ্ছাটা জাগত মনে ?

হু হাতে মুখ ঢেকে আইভি বলে ওঠে, তাহলে বুঝতাম, স্যাপার পরশ  
পাথর খুঁজে ফেরাব পালা শেষ হয়েছে।

কুশানুর বুকেব মধ্যে গুড গুড কবে ওঠে।

টেন শিলিগুডিতে এসে পৌঁছাল।

একটা ট্যাক্সি মিল কুশানু।

শিলিগুডি থেকে দার্জিলিং। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুন্দর পথ।  
এঁকে বেঁকে বিমপিল-গতিতে গুডি মেবে মেবে উঠছে গাড়িটা পাহাড়ের গা  
বেয়ে। আইভি একেবারে চুপ করে গেছে। ওর কথাই বসে ভাবছে  
কুশানু। আশ্চর্য এই ছনিয়া, আর বিচিত্র এই সৃষ্টি। কী অদ্ভুত মনোজগৎ  
গড়ে তুলেছে আইভি। সে নিত্য নতুন বন্ধুত্ব করতে চায়। নিত্য নতুন  
মানুষকে তিল তিল কবে আকৃষ্ট করতে চায় নিজের দিকে। আরও কাছে,  
আরও কাছে—তবু একচুল ব্যবধান সে রেখে যায় বরাবর। সাপ খেলায়  
যে বেদনাই তার মতই ও নেশায় মাতাল। সার্কাসে ট্র্যাপিজের খেলা  
দেখায় যে মেয়ে ও যেন তাদের জাতের। ও পড়তে পড়তে পড়বে না।  
কুশানুর সঙ্গে একঘরে রাত কাটাতে চায়, আর কিছু নয়—শুধু নতুন  
অভিজ্ঞতা একটা। অনাস্থীয় একটি যুবকের সঙ্গে স্পর্শ বাঁচানো একটা  
রাত্রি এক কক্ষ অতিবাহিত করা। তার জন্ম ও মিথ্যা কথা বলতেও  
কুণ্ঠিত নয়। চারদিকে আগুন জ্বলতে চায় সে—অথচ নিজের গায়ে এক  
ফোঁটা আঁচ লাগবে না, তবেই না খেলা।



জারী করণের আইডি বলে, তুমি আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারনি, নয় ?

ওর হাত দুটি টেনে নিয়ে কুশানু বলে, করেছি। আমি বলেই করেছি। কারণ আমিও ঐ রকম একটা অদ্ভুত মানসিক রোগে ভুগছি। যার জন্য মেয়েদের সঙ্গে আমি এড়িয়ে চলি।

আইডি কোতূহলী হয়ে বলে, কী রোগ ?

আজ বলার সময় নেই, একদিন বলব।

না, আজই বলতে হবে। বন্ধু বলে তুমি আমাকে স্বীকার করেছ, আমার সব কথা তোমাকে বলেছি, তুমিই বা কেন বলবে না ?

বলব, কিন্তু আজ আর সময় কোথায় ? ঐ দেখ দার্জিলিং স্টেশন দেখা যাচ্ছে। আগে তোমাকে হস্টেলে নামিয়ে দেব, না আগে আমি নেমে যাব ?

আইডি মাথা নেড়ে বলে, এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে না। আগে-পিছে নামা চলবে না। একসঙ্গেই নামব।

মানে ?

মানে বুঝবে এখনই।

একটু পরে ট্যাক্সিটা রাস্তার একধারে দাঁড় করিয়ে রেখে আইডি নেমে এসে বলে, এস।

কুশানু ওর কথামত নেমে আসে, বলে এ কোথায় এলে ?

এটা একটা হোটেল। আজকে একটা বেলা এখানে মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস রায় থাকবেন। তোমার সব কথা শুনে বিকালে ছেড়ে দেব তোমাকে। এস।

প্রতিবাদে কুশানু কি একটা কথা বলবার উপক্রম কবেই থেমে যায়। স্টাফটোমার ম্যানেজার ততক্ষণে নেমে এসেছে। আইডি তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। অনর্গল বকবক করে চলে। আইডির কোন বাস্তবী নাকি এখানে সঙ্গীক উঠেছিল, তারা খুব প্রশংসা করেছে হোটেলের, ফিরে গিয়ে। তাই একদিনের জন্য এসেও সে খুঁজে বার করেছে হোটেলটা। বাগানের দিকে তাকিয়ে বলল, হাউ লাভলি, ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার স্বামী কিন্তু খুব অর্থোডক্স, হাম, পোর্ক, বীফ কিছু চলবে না।

ম্যানেজার বিগলিত হয়ে বলল, কিছু ভাবতে হবে না। সব ব্যবস্থা সে করে দেবে।

অগত্যা অদৃশ্য গাঁটছড়া বাঁধা কুশানু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে  
ধিতলে। দোতলা বাড়ি—ছোট। কোণার দিকে সবচেয়ে ভাল ঘরখানা  
পছন্দ হল আইভির। দোতলার এক প্রান্তে। হোটেলের চাকর মালপত্র  
এনে পৌছে দিল ঘরে। জিজ্ঞাসা করল কি কি খাবে ওরা মধ্যাহ্নে। আইভি  
নীচে গিয়ে ম্যানেজারের খাতায় কি সব লিখিয়ে দিয়ে এল।

হোটেলটা শহরের প্রবেশপথে একান্তে। কার্টরোড থেকে এক চিলতে  
একটা ফ্যাকড়া নেমে গেছে গভর্ণর হাউসের দিকে। তারই বাঁকের মাথায়  
পাথরে গড়া বাড়িটা। অসংখ্য মরুমি ফুল ফুটে আছে সামনের বাগানে।  
চারিদিক ছিমছাম পরিষ্কার। হোটেলের চাকরটাও বেশ করিৎকর্মা।  
বাচ্চা নেপালী চাকর। সর্বদাই হাসিখুশী। কুতকুতে চোখদুটো সবসময়ই  
আধবোজা, একটু খুশী হলে একবারে বুজে যায়। আইভি ওকে দিবা  
খাটিয়ে নিচ্ছে। দুপাশের দুখানি খাটে আলাদা দুটি বিছানা পেতে দিয়ে,  
জল বদলিয়ে চলে গেল ছেলেটা।

কুশানু একটা ইজিচেয়ারে টান হয়ে পড়ে। দেখতে থাকে চেয়ে চেয়ে  
ঘরখানাকে। কাঠ-পাথরের বাড়ি। পার্টিসান দেওয়ালগুলো সব কাঠের।  
মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা। দেওয়ালের মাঝখানে আগুন জালবার  
ম্যাটেলপীস। খান কয়েক ছবি টাঙান আছে দেওয়ালে। দার্জিলিঙেরই  
দৃশ্যাবলী। বড় বড় দুটো জানলা বাইরের দিকে। পর্দা দেওয়া। বারান্দার  
দিকে একটি মাত্র দরজা। জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা যায়। ঘরের  
লাগাও রাখরুম।

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে কুশানু তার এই দুঃসাহসিক আচরণের কথাই  
ভাবছিল। কী দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে ওর। মাসকতক আগে যেদিন ইভা  
ওকে একটা টেবিলক্লে নক্সা আঁকতে দেয়, সেদিন তার দিকে চোখ তুলে  
তাকাতে পর্যন্ত পারা যায়নি। আর আজ সে একটি অনাখীয়া তরুণীকে এনে  
তুলেছে একটা হোটеле। তার চটুল রসিকতায় অভিভূত হওয়া দূরে থাক,  
যোগ দিচ্ছে কুশানু অনায়াসে। রীতিমত দুঃসাহসিক হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? কুশানু এই যে আইভির স্বামীর পরিচয় বহন  
করে এসে উঠল একবেলার জন্য এই হোটেল, এটা কি তার দুঃসাহসের  
পরিচয়, না একান্ত ভীকৃতার? আইভির ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার  
দৃঢ়তা ছিল না তার মনে। তাই স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দিয়েছে শুধু।

অগতের অনেক দুঃসাহসিকতার মূলেই যেমন আসলে ভীকৃত্য ছাড়া আর কিছু নেই, কুশানুর আজকের আচরণটাও কি তাই নয় ?

আইভি বলে, স্নান করবে তো ? গরম জল দিয়েছে, যাও স্নান করে এস ।

হঠাৎ কেমন রাগ ধরে যায় কুশানুর । কী পেয়েছে তাকে আইভি ? পাকা গিল্লির মত এ ভাবে ছকুম করার মানে ? গম্ভীর হয়ে বলে, না, স্নান করব না আমি ।

আইভি ধমক দেয়, কুঁড়েমি কর না । ওঠ, যাও স্নান সেরে এস । এই নাও মাথার তেল আর সাবান । তোয়ালে এনেছ তো, না দেব ?

কুশানু হেসে ফেলে ওব গিল্লিপনায়, বলে, থাকগে, বড্ড শীত করছে ।

ট্যাক্সি যখন ক্রমশঃ উপরে উঠছিল তখনই স্ফটিকেশ খুলে একটা পুরোহাতা সোয়েটার বার করে পরেছে কুশানু । তার রীতিমত শীত করছে এই মধ্যাহ্ন বেলাতেও ।

আইভি ওর হাতটা ধরে টানে, গেট আপ, যু ডরমাউন্ট । স্নান না করলে একটুও ফ্রেশ লাগবে না । গরম জল জুড়িয়ে যাচ্ছে ।

অগত্যা কুশানু বাথরুমে ঢোকে ।

স্নান করে সত্যিই আরাম লাগে । গতরাত্রে অনিদ্রা আর ভ্রমণের প্লানি যেন ধুয়ে গেল । জামাকাপড় নিয়ে এবার আইভি গেল বাথরুমে । কুশানু স্কেচখাতাটা নিয়ে এসে বসল জানলাব ধারে । পেনসিলটা বাব কবে আঁচড় টানতে থাকে । কিন্তু মন দিতে পারেনা । কাল রাত্রে যদি সেই মাড়বায়ী ভদ্রলোক না এসে উঠত ওদের ঘরে তা হলে কি ঘটত ? নিশ্চয় বিসদৃশ কিছু করে বসত না কুশানু । কিন্তু আইভি যদি অগ্রসর হয়ে আসত তাহলে তাকে বাধা দিতে পারত কি ? হয়তো অগ্রসর হতনা আইভি । মনে পড়ল আইভির সেই কথা কটা—কিন্তু আমি একথাও জানি যে তুমি এক পা এগিয়ে এলেই আমার ডান হাতটা সজোরে গিয়ে পড়বে তোমার বাঁ গালে ।

আচ্ছা, কুশানু কি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়ে গেছে ? না হলে, কই আইভির এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও তো দৃষ্টিবিলম্ব হয়নি তার । এতদিন দূরে দূরে সরে থাকতে চেয়েছে, মনকে সজাগ রেখেছে ; তাতেই মন ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । এখন সে বিপদকে দেখে দূর থেকে সরে যায় না ; তাই মমণ্ড এসেছে ওর বশে । এই তো কাঠের পার্টিশনের ও পাশে জল ঢালার লক্ষ উঠছে ; কই তার তো কোন চিন্তাবিকার হচ্ছে না এতে ।

মনে মনে আরও একথাপ এগিয়ে যায় ক্রমে। দেখাই যাক না কি হয়! একবার মনে কিসের খেন একটা বাধা, একটা সঙ্কোচ বোধ করে; কিন্তু পরক্ষণেই সেটা ঝেড়ে ফেলে। সে তো অসামাজিক, অশ্লীল কিছু করেছে না। মনে মনে সে কি করেছে তার কৈফিয়ত কার কাছে দিতে হবে? ঈশ্বর? কিন্তু তিনিই তো আসামী, তাঁর নিজের কি কৈফিয়ত আছে কুশানুর মনকে এমন বিকৃত করে তৈরী করার?

...অনেকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থেকে উঠে বসে ফের। না। চেষ্টা করেও আক্রমণটাকে আনতে পারল না। কাঠের পার্টিসানটাকে মনে মনে উড়িয়ে দেওয়া গেল না। দারুময় পার্টিসান মনে মনেও রইল অনড়।

খুশী হল কুশানু। ভীষণ খুশী হল। তবে হয়তো সে একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ওর রোগ নিশ্চয় ধুয়ে গেছে গঙ্গার জোয়ারে। নয়তো স্বাহার কাছে মন খুলে নামিয়ে দিয়েছে সে মনের বোঝা। আইভি ওর মনের অস্থির কথা জানতে চায়, কিন্তু অস্থিটা হয়তো সেরেই গেছে। তাহলে অহেতুক সে লজ্জাকর ইতিহাস ওকে শুনিয়ে কী লাভ? কিন্তু না, সব কথা খুলে বলাই ভাল। বলে মনটা আরও হালকা করে ফেলা উচিত। ভবিষ্যতে আইভি না কোনদিন বলতে পারে কুশানু তাকে ঠকিয়েছে। সব দুর্বলতার কথা, সব অপূর্ণতার কথাই খোলাখুলি জানিয়ে দেবে কুশানু। তার পরেও যদি তুমি এগিয়ে আস তাহলে সে দায়িত্ব তোমার।

এই, কালা নাকি তুমি?

কুশানু চমকে ওঠে। তন্দ্রা ছুটে যায় ওর। বাথরুমের দরজাটা একটু খুলে ওকে ডাকছে আইভি। বোধহয় অনেকবারই ডেকেছে। উঠে বসে বলে, কি, ডাকছ কেন?

আমার ঐ হাত-ব্যাগের মধ্যে একটা কিউটিকুরার কোটা আছে। দেবে?

কুশানু হাত-ব্যাগ হাতড়ে উদ্ধার করে পাউডারের কোটা। বাথরুমের কাছে এসে সেটা দেয় আইভির দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা ভিজ়ে হাতে।

ঘুমুচ্ছিলে নাকি?

না, ঠিক ঘুমাইনি। বলতে বলতে নত হয়ে যায় কুশানুর দৃষ্টি।

অল্প কয়েকটা নীরব মুহূর্তের পরেই আবার বন্ধ হয়ে গেল ঈষদুশ্মিত দরজাটা।



ক সেকেণ্ড দেবী হয়েছিল আইভির ? সেকেণ্ড-পল-অনুপল দিয়ে মাথা মুশকিল, তবে আন্দাজে কুশাল বলতে পারে জোয়ার চলে যাবার ষে-কয় সেকেণ্ড পরে উঠে দাঁড়িয়েছিল ইভা, এবারও সময়ের দৈর্ঘ্যটা ঐ জাতীয়ই। আর সেই নীরব কয়টি মুহূর্তেই এই প্রথম, ই্যা কাল রওনা হওয়ার পর থেকে এই প্রথম, কুশাল প্রয়োজন বোধ করল দৃষ্টি নত করার। আইভির বুকের উপর চাপা দেওয়া ছিল রাজহাঁসের পালকের মত সাদা একটা তোয়ালে। গরমজল-নিংড়ানো তোয়ালে থেকে এঁকে-বঁেকে-ওঠা বাষ্পীয় রেখাগুলো মনে হল যেন কতকগুলো সরীসৃপ। যেন অনন্যতার হৃদয়ের কোন কামনা বিসর্গিল রেখায় বাষ্পায়িত হয়ে বেরিয়ে আসছে তোয়ালে ভেদ করে। আপনিই দৃষ্টি নত হয়ে গিয়েছিল ওর।

ছপুর্নে আহালাদির পর চোখ দুটো ঘুমে ভেঙে আসতে চায়। কুশালের মধ্যে একজন ভবঘুরে আছে। ছুটিছাটায় প্রায়ই সে বেরিয়ে পড়ত, শুধু ষেদিকে ছুচোখ যায় নয়, ষতদূর পকেট ষেতে দেয়। এমন নিশ্চিন্ত প্রথম শ্রেণীর আরাম ওর জীবনে এই প্রথম। সুতরাং পথশ্রমে ওর এতটা ক্লান্ত হওয়ার কথা নয়—তবু কালরাত্রের অনিদ্রা আজ ওর চোখ দুটিকে যেন জোর করে বন্ধ করে দিতে চায়। কিন্তু আইভি কিছুতেই ঘুমাতে দিল না ওকে। সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনল সে। ই্যা, সব কথাই মন খুলে বলে ফেলে কুশাল। ওর দুর্বলতার কথা, ওর মানসিক বিকারের কথা—ইভার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা, জলখাবার নামিয়ে রেখে ইভার ছুটে পালিয়ে যাবার কথা।

থামতেই আইভি বলে, তারপর ?

তারপর আবার কি ?

তারপর পুনর্মিলনের কথা !

চমকে উঠে কুশাল বলে, ও আবার কি কথা ! কি যা তা বলছ !

বাঃ ! কাল তুমি বললে না—ইভার বন্ধুত্ব তুমি স্বীকার করেছিলে। সেটা কখন, কেমন করে হল ? বাপি তোমাকে শ্রীরামপুরে ষেতে বললেন, তুমি রাজি হলে, এখানে কখনও গল্প শেষ হতে পারে ?

এরপর গম্ভীর হতে হয় কুশালকে ; বলে, এর পরের কথা তো আমার একার কথা নয় আইভি। অপরের গোপন কথা বলার তো কোন অধিকার নেই আমার। ইভার কথা তোমাকে বলা যায় না ; যেমন তোমার সঙ্গে আজকের এ অভিজ্ঞতার কথা ইভাকে বলা যাবে না কোনদিন।

আইভি দুহাতে মুখ রেখে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিল। তার গায়ের উপর আলতো-করে ফেলা ছিল একটা ইটালিয়ান কবুল। মাথা ঝাঁকিয়ে আইভি বললে, সব কথাই বলা যাবে ইভাকে, তুমি না বললেও আমি ইভাকে সব কথা বলব।

বলবে? তোমার লজ্জা করবে না?

না। লজ্জা পাবার মত তো কিছু করিনি আমরা। ইভা আমার সব কথা জানে, যেমন আমিও ইভার সব কথা জানি।

না, জান না। তুমি জান, ইভা মনে মনে কাকে সবচেয়ে ভালবাসে?

জানি। এবং এও জানি, তুমি যার কথা ভাবছ তাকে নয়।

তার মানে? সুকান্তবাবুকে নয়?

জামাইবাবুকেই!

তবে যে তুমি বললে, আমি যার কথা ভাবছি তাকে নয়।

তুমি তো কথা ঘোরাচ্ছ। তুমি তো জামাইবাবুর কথা ভেবে এ প্রশ্নটা করনি আমাকে। আমার কথা বাক নিতেই সাবধান হয়ে এ কথা বলছ এখন।

তাহলে তুমি বলতে চাও, আমি অন্য কোন একজনকে মীন করেছিলাম?

ঠিক তাই।

কে সে?

শ্রীমান কুশানু রায়।

মাথাটা আর তুলতে পারে না কুশানু। এ মেয়েটার কি জানতে কিছুই বাকি নেই? কিন্তু ও যা বলছে তাই কি ঠিক? ইভা তাকে ভালবাসে না?

কী পাগল ছেলে তুমি! এতটা লজ্জা পাচ্ছ কেন? বল, তারপর কি হয়েছিল?

আমি যে কুশানু রায়ের কথা ভাবছিলাম তা আন্দাজ করলে কি করে?

কাল যখন ইভা তোমাকে চিনতে পারল না, আর তাই দেখে তুমি যখন জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসে থাকলে, তখন আমি তো ছার, কুলিটা পর্যন্ত আন্দাজ করেছিল তোমাদের দুজনের সম্পর্ক।

ছদ্মনের সম্পর্ক ! কিন্তু তুমি যে এইমাত্র বললে ইভার মনে কোন  
যোহ নেই ?

তাই বলেছি ? তুমি কি সত্যিই এত ভুলো মানুষ, না কি প্রেমে পড়ায়  
সাময়িক বোকামি এগুলো ?

কেন ?

তুমি বললে, ইভা মনে মনে সবচাইতে কাকে ভালবাসে ? আমি বললুম,  
জামাইবাবুকে , তার অর্থ হল ইভা তোমাকে ভালবাসে না ?

হল না ?

হল ? তুমি যদি বল সবচেয়ে উঁচু গিরিশৃঙ্গ কোনটা, আর আমি বলি  
এভারেস্ট, তাহলে ইনফারেন্স হল কাক্ষনজজ্যা পীকটা নেই ?

কুশাহু গম্ভীর হয়ে বলে, হিমালয় পাহাড়ের উচ্চাস অযুত গিরিশৃঙ্গে উন্মুখ  
হয়ে উঠতে পারে—মেয়েমানুষের মন পাহাড় নয় । স্বামীকে যদি কেউ সত্যি  
ভালবাসে তাহলে আর কোন কাউকে ভালবাসা তার পক্ষে সম্ভব নয় ; কৃষ্ণকে  
ভালবাসলে আর আয়ান ঘোষকে ভালবাসা যায় না ।

বৈষ্ণব কবিরা বলেছেন বুঝি ? কিন্তু জীবনটা কাব্য নয় কুশাহু !  
নিঃসন্দেহে ইভা তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে , কিন্তু তাই বলে স্বকান্ত্যবাবুকেও  
সে ভুলে যায়নি । দিদি হচ্ছে আমার মায়ের মতন ..আই মীন, ভারতীয়  
নারীর যে বিশিষ্টতা, ওর তা আছে । ও তোমাকে ভালবাসলেও সেটা স্বীকার  
করতে পারছে না । না তোমার কাছে, না ওর নিজের কাছে । তাই ও  
এড়িয়ে এড়িয়ে চলে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় । কিন্তু এতদিনে ও বুঝতে  
পেরেছে নিজের মনকে ।

তোমার কাছে কি ইভা স্বীকার করেছে ?

স্বীকার ঠিক করেনি—তবে বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি । সে  
আমাকে সাবধান করে দিয়েছে যেন তোমার সঙ্গে বেশী অস্তরঙ্গ হয়ে না  
যিনি । এমন করে সাবধান করে দেবার নিশ্চয় কোন কারণ ছিল । আমি  
জানি যে ইভা জানে, যে বাধা দিলেই আমি আরও উদ্দাম হয়ে উঠব । ইভা  
চায় আমি তোমাকে বিয়ে করি । ও আমাকে প্রচণ্ড ভালবাসে—তাই আমাকে  
তার জীবনের এতবড় একটা সম্পদ উপহার দেওয়ার মধ্যোই সে একটা  
'ভাইকেরিয়াস্ এন্জয়মেন্ট' খুঁজছে ।

কুশানু ধীরে ধীরে বলে, তাকে সে আনন্দ পেতে দেওয়া কি একেবারেই অসম্ভব আইডি ?

মুচকি হেসে আইডি বলে, পারহ্যাপ্স ! তুমি বড্ড ভীতু, তোমাকে দিয়ে চলবে না ।

কুশানুও হেসে বলে, তোমাকে বিয়ে করা কি ভীষণ একটা দুঃসাহসিক কাজ ?

ভীষণ ! আমাকে বিয়ে করা মানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা ! তাইতো দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃসাহসী প্রেমিককে খুঁজছি আমি । জানো, এই হোটেলের একটি বোর্ডারের সঙ্গে আমার কয়েক মাস আগে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় । ছেলেটা এতদূর ডেয়ারিং যে নিজেকে ফিল্ম ডিরেক্টর তরুণ গুপ্ত বলে পরিচয় দেয় । আমাকে সে ফিল্মে একটা চান্স পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল । ছেলেটা বোকা, কিন্তু তার দুঃসাহসকে আমি প্রশংসা করি ।

তারপর কি হল ছেলেটার ?

ভেবেছিলাম তাকে নিয়ে যাব খাদের শেষ প্রান্ত পযন্ত—শেষমুহুর্তে যখন সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে—তখন তার হাতের লেখা চিঠিতে তরুণ গুপ্তের সেই দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম—জালিয়াতির অপরাধে কয় মাস জেলের ব্যবস্থা আছে আই পি. সি.-তে ? কিন্তু সে সুযোগ আর পেলাম না । ছেলেটি বোধ হয় কোনসূত্রে আমার পিতৃপরিচয় পেয়েই সাবধান হয়ে পালিয়েছিল । কাল তোমায় বলছিলাম না, পিতৃপরিচয়ই আমাদের সব সর্বনাশের মূল !

ও কথা যাক, কিন্তু কী ধনুকভাঙা পণ আছে তোমার শুনি ?

ধনুকভাঙা পণের কথাও পরে হবে । শ্রীরামপুরে গিয়ে কি দেখলে তাই আগে বল ।

কুশানু অকপটে সব কথা বলে যায় । কোন কথাই গোপন করে না । চাঁপা রঙের শাড়ি আর দার্জিলিঙ পাথরের লকেট খুলে রেখে আসার কথা, পান এনে দেওয়ার কথা, মাঝির তুল ধারণার কথা । তারপর সে এসে পড়ে ভরাকোটালের বানের কথায় । মুহুর্তের বিহ্বলতায় কেমন করে ওর বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ইভা । ওর সমস্ত দেহমন অন্তরাঙ্গা কেমন এক অনির্বচনীয় পুলকাবেশে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল । কুশানু কথা বলছিল জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে—যেন আপন মনে গল্প করছে । হঠাৎ



ধেমে পড়ে। খাট থেকে কি মনে করে অকস্মাৎ নেমে পড়েছে আইভি কোন কথা না বলে হঠাৎ সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বিহ্বল হয়ে কুশান্ন একাই বসে থাকে চুপ করে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আরও ঠাণ্ডা বেড়েছে। অলস মধ্যাহ্ন কখন অগোচরে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে জানতেও পারেনি। ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম এনে নামিয়ে রাখে হোটেলের চাকরটা; কাঞ্চা না কি ঘেন নাম ছেলেটার। প্রায় একঘণ্টা পরে ওর পিছন পিছন এসে ঢোকে আইভি।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

বাগানে বেড়াচ্ছিলাম।

এমন ছুটে বেরিয়ে গেলে যে হঠাৎ?

আমার খুশী। তুমি কি ক্লাস নিচ্ছ না কি, যে বাইরে যেতে হলে পার্মিসান নিতে হবে।

কুশান্নুব বুঝতে কষ্ট হয় না আইভির মেজাজটা আবার বিগড়েছে, অবশ্য এবার যে কেন বিগড়ালো তা ঠিক বোঝা গেল না। বলে, চা খেয়েই এবার ওঠা যাক। বাঁধাছাঁদা করতেও তো কিছুটা সময় লাগবে।

চায়ের কাপটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আইভি বলে, কেন, কোথাও যাবে?

চায়ে একটা চুমুক দিয়েই ভুলটা বুঝতে পারে কুশান্ন। চিনির পাত্রটা টেনে নেয়। বলে, কোথাও যাবে মানে? তুমি কি এখানেই থাকবে নাকি?

হ্যাঁ।

বেশ, থাক।

নিজের চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে আইভি বলে, থাক মানে? আমি কি একা থাকব নাকি?

কুশান্ন ভ্রূ কুঁচকে বলে, কি বলতে চাইছ তুমি?

বলতে চাইছি যে কালকে সকালের গাড়িতে আমরা দুজনে দার্জিলিঙে পৌঁছাব—আর স্টেশন থেকে তুমি আমাকে সোজা হস্টেলে নিয়ে যাবে। না হলে এখন পৌঁছে আমি কৈফিয়ত দেব কি? কোন ট্রেনে এসেছি কলকাতা থেকে?

তার মানে আজ রাত্রিটা তুমি এ ঘরেই কাটাতে চাও?

আইভি কোন জবাব দেয় না। কুশানুই আবার বলে, কিন্তু সে জন্তে  
বে অজুহাত খাড়া করেছ সেটা খুব জোরাল নয়।

এবারও আইভি চুপ করে থাকে।

কেন আইভি? তোমার সেই টাবু থিয়োরীর জন্তে? তোমার একটা  
খেলান চরিতার্থ করার জন্তে?

এবার ধীরে ধীরে আইভি জবাব দেয়। ওর দিকে তাকায় না। চায়ের  
কাপটায় চামচে নাড়তে নাড়তে সেই দিকেই তাকিয়ে বলে, না, আমার  
খেলান চরিতার্থ করার জন্তে নয়। আজ রাতটা এখানে থেকে গেলাম  
শুধু তোমার জন্তেই। কাল রাতে তোমার ঘুম হয়নি—আজও হবে না।  
আজ সারারাত জেগে তোমাকে একখানা ছবি আঁকতে হবে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে কুশানু বলে, ছবি আঁকতে হবে? কেন? কিসের?

একইভাবে আইভি বলে, রোগ তোমার সারেনি কুশানু—চাপা আছে  
মাত্র। ও রোগ এমনিতে সারে না। দৃষ্টিবিক্রমের মুহূর্তটিতে তোমার  
অবচেতন মন যে দৃশ্যটি দেখবার জন্য কাঁড়ালপনা করে, চর্মচক্ষুকে সেই  
ছবিখানিই নৈবেদ্য দিতে হবে। না হলে এ রোগের হাত থেকে তোমার  
নিষ্কৃতি নেই।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে কুশানু।

আইভি মুখ তুলে তাকায়। অদ্ভুতভাবে হাসে। বলে, কি? ভয়  
পেলে? আমি জানি, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি আমার গায়ে হাত  
দেবে না। দিও না, কেমন? ছবিখানা তোমার স্কেচবুকেও রেখ না।  
আমার ফিগারটা বড পিক্যালিয়ার। মুখ না আঁকলেও লোকে চিনে ফেলতে  
পারে।

এতক্ষণে সাহস সঞ্চয় করে কুশানু বলে, আমি রাজি নই আইভি।

ক্রকুঁচকে আইভি বলে, কেন?

দুটি সর্তে আমি রাজি হতে পারি।

বল।

প্রথমত, কোন কারণেই আজ রাতে তুমি আমাকে স্পর্শ করবে না।

আইভি হেসে বলে, মেনে নিলাম ও সর্ত, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে  
তোমাকে স্পর্শ করব না। দ্বিতীয়টা?

কুশানু লক্ষ্য করল—কথা দেওয়ার সময় অল ডাকলের প্যাচ কষেছে

আইভি। কিন্তু এ নিয়ে কিছু বলা যায় না। অর্থাৎ বলা যায়, কিন্তু তাহলে বলতে হয় নিজের উপরও অতটা সংযম নেই কুশানুর। সেটা এই অবস্থায় স্বীকার করাটা ঠিক নয়। তাই বলে, দ্বিতীয়টা হচ্ছে, শুধু একরাত্রেই জন্ম নয়, দিতে হবে আমাকে সমস্ত জীবনের জন্ম এ অধিকার।

এবারও আইভি হেসে বলে, সেটা কাল বলব।

না। সিটিং দেওয়ার আগেই তোমাকে মনস্থির করতে হবে। যদি নাকচ কর আমার প্রার্থনা তাহলে তোমাকে মডেল করে ছবি আঁকব না আমি।

আইভি কি যেন একটু ভাবে। তারপর বলে, আজকের রাতটা শুধু তোমার আর আমার। এ জীবনটা তো শুধু তোমার আর আমার নয়। তোমার পরিবারের লোকেরাও আছেন, আমারও ?

বাধা দিয়ে কুশানুর বলে, আমার তিনকুলে কেউ নেই, যার কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হতে পারে। তোমার তরফে ইভার তো আগ্রহ আছেই, আর তোমার বাবা ?

হ্যাঁ। বাবাকে নিয়েই কথা। তোমার আমার বিয়ে তিনি কিছুতেই অনুমোদন করবেন না। একেবারে নিঃসঙ্গল হয়ে আমাদের দুজনকে নেমে আসতে হবে পথে। সে দুঃসাহসিক অভিযানের জন্তে আমি অবশ্য তৈরি ; কিন্তু তুমি কি অতটা পারবে ? তা যদি পারবে বলে মনে কর, তাহলে শুধু আজকের এই রাতটা নয়, আমার সারা জীবনটাকে দিতে পারি তোমার রঙ-তুলির হাতে তুলে।

কুশানুর মুখে ফুটে ওঠে বিজয়ের হাসি। ওর হাত দুটি ধরে বলে এতক্ষণে সব কথা। বুঝিয়ে বলে যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নিশ্চিত করে আইভিকে। জানায়—ভবতারণবাবুর পূর্ণ সম্মতি আছে। বস্তুত অনেক দিন আগে থেকেই তিনি মনোনিবেশ করেছেন কুশানুরকে। আইভির সহযাত্রী করে কুশানুরকে দার্জিলিং পাঠানোর মূলে তাঁর যে গোপন বাসনা ছিল সেটাও জানায়। হেসে বলে, আমি শুধু তোমাকে এস্কোর্ট করতেই আসিনি ; আমি এসেছি একটা ডিপ্লম্যাটিক মিশন নিয়ে। আমার এ কূটনৈতিক অভিযানের সাফল্যে এখন তুমি আমাকে অভিনন্দিত করতে পার, ইচ্ছা হলে।

আইভি কোন কথা বলে না ; ধীরে ধীরে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে চলে যায় বাইরে।

কুশান্ন একা বসেই থাকে।

দু মিনিট—পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট ;—ফিরে আসে না। তারপর অবশ্য আইভি ফিরে আসে। একা নয়, দুজন লোক নিয়ে। কুশান্নর দিকে একবারও তাকায় না মুখ তুলে। একটা কথাও বলে না। তার মালপত্র গুছিয়ে তোলে স্যুটকেসে। বেডিংটা বেঁধে দেয় কাঞ্চা। কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে চলে যাবার সময় ওর দিকে ফিরে শুধু বলে, আজ রাত্রেই হোটেল চার্জ মেটানো আছে। কাল সকালে আপনি জগদীশবাবুর বাড়িতে চলে যাবেন। নমস্কার।

আকাশপাতাল কিছুই বুঝতে পারে না কুশান্ন। শুভিত হয়ে বসে থাকে।

দিন সাতেক পবে কুশান্ন কলকাতায় ফিরে এল।

ইতিমধ্যে অবশ্য পূজার ছুটি শুরু হয়ে গেছে কলকাতায়। দলে দলে ষাত্রীবা আসতে শুরু করেছে শৈলপুৰীতে। দার্জিলিঙে উৎসবের সবে শুরু। এ সময় সবাই ওঠে, নামে না বড একটা কেউ। কুশান্ন জানত ইতিমধ্যে ওদের মেসেব বাকি কজন নিশ্চয় চলে গেছে যে যার বাড়ি। শূন্য মেসে গিয়ে করারও কিছু নেই তাব। কিন্তু সাত দিনেই সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল দার্জিলিঙে।

আইভির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল হস্টেলে। দেখা হয়নি। মানে, দেখা করেনি আইভি। একদিন এসেছিল সে জগদীশবাবুর বাড়িতে। ওঁকে যেন চিনতেই পারেনি। মণিমালা বোধ হয় সেটা নজর করেছিলেন। প্রশ্নও করলেন কুশান্নকে, আইভির সঙ্গে আপনার আলাপ নেই ?

না বলতে পারলেই বাঁচে, কিন্তু কুশান্ন জানে প্রশ্নকর্তার অজানা নয়—সেই নিয়ে এসেছে আইভিকে দার্জিলিঙে। পরদিনই সে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হল। আপত্তি করেছিলেন মণিমালা, জগদীশবাবুও—কিন্তু কুশান্ন রাজি হয়নি।

কলকাতার মেসে পৌঁছে দেখে ঘরে তালা মারা। রামনন্দনও নেই নাকি ? হয়তো কিশুবাবুও নেই দেখে ছুটি নিয়ে সে ফুলওয়ারি গাঁয়ে গেছে এবার ছুটিতে। তালা খুলে ঘরে ঢুকে জানলাগুলো খুলে দেয়। বাইরে এখনও চন্‌চনে রোদ আছে, কিন্তু ওদের মেসের ঘুপচি ঘরে নেমে এসেছে



সন্ধ্যার অন্ধকার। আলোটা জ্বলতে হয়। গুমোট গরম। ফ্যান নেই  
ওদের ঘরে। বিছানাটা খুলে পেতে ফেলে খাটে। তক্তাপোশের উপর চিত  
হয়ে শুয়ে পড়ে। পাশেই মেস ম্যানেজার স্বত্রত দাশের চৌকিতে পড়ে আছে  
তালপাতার একখানা পাখা। সেটা নিয়ে জোরে জোরে হাওয়া খেতে থাকে।  
হাসি পায় কুশানুর। সেপ্টেম্বরের প্রায় মাঝামাঝি, অথচ গুমোট গরম লাগছে  
আজ ওর। আসলে হয়তো সত্যিই গরম নেই—দার্জিলিঙের আবহাওয়া থেকে  
নেমে এসে এই দুর্বস্থা হয়েছে ওর। গেঞ্জিটাও খুলে ফেলে শেষ পর্যন্ত।

দূরে কোথায় সানাই বাজছে। আসন্ন পূজার বারোয়ারী তলায় নাকি ?  
কিন্তু ঢাকের আওয়াজ তো নেই। নাকি রেডিওতে বাজছে কোথাও ?  
চুপচাপ শুয়ে শুয়ে সানাইয়ের স্বরে ডুবে রইল কিছুক্ষণ।

সাতদিন ছিল সে দার্জিলিঙে। কত নতুন দৃশ্য দেখেছে, কত ঘুরেছে  
ছায়া-শীতল পথে পথে, কিন্তু ভারাক্রান্ত মনটা স্থিতি পায়নি। কেন অমন  
অদ্ভুতভাবে সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে চলে গেল আইভি ? কি কারণে আঘাত  
পেল সে ? কিছুই বুঝতে পারেনি। কিন্তু মন বড় অবুঝ ; প্রত্যেকটি জিনিসের  
জন্তু একটা করে ব্যাখ্যা দিতে না পারলে সে সন্তুষ্ট হয় না। মনকে শেষ পর্যন্ত  
কুশানু বুঝিয়েছিল আইভি যা মুখে বলে তাই সে বিশ্বাস করে, আইভি  
পাপপুণ্য মানে না, সত্যি তার কাছে একটা কুসংস্কারই। হয়তো এমনভাবে  
আরও কত রাত সে কাটিয়েছে তার অগ্ণাত বন্ধুর সঙ্গে। কেউ কখনও ওকে  
স্পর্শ করেনি ? বাজে কথা। কুশানু বিশ্বাস করে না। চরিত্রহীন ফ্লার্ট  
একটা। সেদিনও সে একটা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চেয়েছিল।  
কুশানুকে করতে চেয়েছিল তার একরাতের খেলার পুতুল, তার কামনার  
সাময়িক শিকার। হয়তো ভেবেছিল কুশানু ঘাবড়ে যাবে ভবতারণবাবুর নাম  
শুনে। হয়তো একরাত্রির প্রসাদ নিয়ে কুশানু সসঙ্কোচে সরে দাঁড়াবে, যেই  
শুনবে ভবতারণ ঘোষাল এটা বরদাস্ত করবেন না। পুলিশ সাহেবের নাম শুনে  
আইভির আর একটি বন্ধু—কি যেন ফিল্ম ডাইরেক্টরের নাম নিয়ে যে খেলা  
করছিল আইভির সঙ্গে—সে যেমন কেটে পড়েছিল, হয়তো কুশানুও তেমনি  
সরে পড়বে। কিন্তু তা হল না। ভবতারণবাবুর নাম শুনেও যখন পিছপাও  
হলনা কুশানু তখন সাবধান হতে হল আইভিকে। বুঝল একরাত্রের সাময়িক  
ফুর্তিতেই শেষ হবে না এ অধ্যায়। এর জের টেনে চলতে হবে সারাজীবন।  
তাই তৎক্ষণাৎ নিজেই সরে গেল আইভি। অথচ কী দরাজ গলায় সে

বলেছিল বাপ ত্যাগ করলেও সে কুশান্নর হাত ধরে পথে নামতেও রাজি।  
লাইসেনসস্ ভাইপার !

মেয়েমানুষ জাতটাই এ রকম—ভাবে কুশান্ন। . এতদিন মুখ তুলে ওদের  
দেখেনি, শাস্তিতে ছিল। কী কুক্ষণেই যে ইভার ফাঁদে পড়ে জানবুকের  
ফলের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল। আজ এই কয়মাসে ওর সুখ শাস্তি  
সব নষ্ট করেছে ওরা। ইভার ছলনায় প্রায় মরতেই বসেছিল তো সেদিন।  
আইভিও কম গেল না। সুখের সপ্তম স্বর্গে ওকে তুলে দিয়ে সোনা মইটি  
হাতে নিয়ে কেটে পড়ল। আর আছেন একজন পাটনা-বাসিনী এক লিপি-  
বান্ধবী। যাকে চিনি না, জানি না—তারই কী ছকুমের সুর ! ভোর পাঁচটায়  
স্টেশানে হাজিরা দাও ! ট্রামে উঠতে যার পয়সা থাকে না, অর্ধেক দিন হেঁটে  
এসপ্লানেড চলে যায় তাকে কিনতে হবে এক ডজন রজনীগন্ধা। না হোক  
আট দশ আনা তো বটেই ! সেই ফার্স্ট ইয়ারে পড়বার সময় এক অধ্যাপকের  
মৃত্যুতে গ্লোব-নার্সারি থেকে এক ডজন রজনীগন্ধা কিনেছিল। জীবনে সেই  
প্রথম আর শেষ ! উনি ছকুম করে বসলেন অধ্যাপকের মৃত্যুতে যেমন ফুল  
কিনেছিলে এবার ছাত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তেমনি আবার ফুল কেন।  
কী ? না আমি তোমার সঙ্গে রোমান্টিক প্রেম করছি ! ধন্য করছি  
তোমাকে !

হঠাৎ কি মনে পড়ায় উঠে বসে একবার। ডাকবাক্সটা দেখলে হত।  
নিশ্চয়ই চিঠি এসেছে তাঁর। এতদিন চুপ করে থাকার মেয়ে তো তিনি  
নন। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, এরপর সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দেবে সে এই বিজাতীয়দের  
সঙ্গে। এতদিন যেমন ছিল তেমনিই থাকবে।

চিঠির বাক্সটা খুলে দেখে খানকয় চিঠি জমেছে এ কয়দিনে। ওর নামে  
আছে দুখানা। একটা শুভবিবাহ মার্ক। টুকলির বিয়ে হয়ে গেছে  
গতকাল রাত্রে। বাঁচা গেছে। দ্বিতীয়খানা ? হ্যাঁ, যা আন্দাজ করেছিল।  
স্বাহার চিঠিই। খুলে পড়তে যাবে, এমন সময় কে যেন কড়া নাড়ল সামনের  
দরজায়। খোলা চিঠিখানা বালিশের তলায় চাপা দিয়ে বাইরে আসে  
কুশান্ন।

বাইরে আধো অন্ধকারে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল এক অপক্লপ বিষয় !

কুশান্নবাবু এখানে থাকেন ? কুশান্ন রায় ?

অবাক বিষয়ে ওর দিকে আধমিনিট নিম্পলক তাকিয়ে থাকে কুশান্ন।

বারান্দার বাতিটা জ্বলতে কুলে যায়। আধো আলোর দরজার চৌকাঠের ফ্রেমে বাঁধান একটি নারীমূর্তির অস্পষ্ট সিল্যুয়ে। বাতির স্নাইচটা জ্বলা দরকার—এটা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। কিন্তু আলো জ্বললেই জানা যাবে ও শ্যামা না শুভ্রা, ও সুরূপা না রূপহীনা।

কুশানুবারু এখানে থাকেন? কুশানু রায়? দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে মেয়েটি। মরিয়া হয়ে বাতিটা জ্বলে দেয় কুশানু।

ওর বয়স কত? ওকি শ্যামা—না শুভ্রা? ওকি সুরূপা না অপরূপা? এসব কথা ভাববার অবকাশই পেল না কুশানু। ওর চেহারার একটি জিনিস মাত্র নজরে পড়ল কুশানুর—সেটাকে বলা যায় ব্যক্তিত্ব! যা মাপবার কোন মানদণ্ড নেই। বিবেকানন্দের চোখের দৃষ্টিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের চাপা ঠোঁটে যে ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে তা-শুধু বোঝা যায়, বোঝান যায় না।

মেয়েটি কোন উৎসব বাড়ি থেকে উঠে এসেছে অল্প সময়ের ছুটি নিয়ে। ওর সমস্ত শরীরে সে সংবাদের ছাপ। যেন টুকলির বিয়ের উৎসব এ নয়! ওর গায়ে জড়িয়ে রয়েছে গত বাত্বের বাসরঘরের কিসের একটা সৌরভ—বাসিফুলের, সেন্টের অথবা উৎসবমগ্না কিশোরী তরুণী যুবতী নারীর স্বতঃ-উৎসারিত একটা পদ্মগন্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হল কুশানুর কান্নকায়-খচিত এই খাপটা বাহ্যিক মাত্র—খাপের আড়ালে লুকিয়ে আছে বুদ্ধিদীপ্ত একখানি ঝকঝকে তলোয়ার। আর দেবী কবা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই সামলে নিয়ে কুশানু বলে, থাকেন, কিন্তু এখন তো নেই।

দার্জিলিঙ থেকে ফেরেন নি এখনও?

দার্জিলিঙ। দার্জিলিঙের কথা ও জানল কোথা থেকে? কুশানু শুধু গম্ভীর হয়ে বলে, না। ফিরতে বোধ হয় ওর দেবী হবে।

ও। দাঁত দিখে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে কি যেন ভাবছে স্বাহা।

কুশানু এলে কিছু কি বলতে হবে? প্রশ্ন করে কুশানু।

না। বলতে কিছুই হবে না। চিঠিতেই আমি লিখব। আপনার নামটা শুধু জেনে যাই, চিঠিতে উল্লেখ করব। না হলে বিশ্বাস করবে না হয় তো যে আমি এসেছিলাম।

ও আচ্ছা, আমার নাম সূত্রত দাশ।

ও, আপনিই তো মেসের ম্যানেজার।

সত্যিই অবাক হতে হয় এবার। বলে, আপনি কি করে জানলেন?

মেয়েটি হেসে বলে, আপনাদের মেসের রায়নন্দন আমার পরিচিত। যদি কিছু না মনে করেন তাহলে একটা অস্বরোধ করি—

বলুন, বলুন—

কুশালুবাবুর ঘরটা একবার দেখে যেতে পারি ?

অনায়াসে। আসুন আমার সঙ্গে। কুশালু আমারই রুম-মেট।

জানি সে কথা। বলে মেয়েটি ওর পিছনে পিছনে আসে।

ঘরে এসে প্রথমেই গেঞ্জিটা গায়ে চড়ায়। এতক্ষণে একটু ভদ্রস্থ লাগে। বিছানার চাদরটা ভীষণ ময়লা। ট্রেনের কালিমায় মলিন। এর উপর ওকে বসতে বলা যায় না। কাঠেব ফোল্ডিং চেয়ারটা ঠেলে দেয় মেয়েটির দিকে, বলে, বসুন। এটাই আমাদের ঘর। কোনটা কুশালুর সীট বলে দিতে হবে না আশা করি।

স্বাহা বসে না। ঘরটাকে ভাল করে লক্ষ্য করে। দেওয়ালের চাপড়া খুলে পড়েছে এখানে ওখানে। বারান্দার ওপাশে খাড়া প্রাচীরের সারা গায়ে নোনাধরা লালচে ইটের দগদগে ঘা। পুরানো দেওয়ালের পেরেক প্রায়ই খুলে আসে হুলহুল করে। সাবা দেওয়ালে মশারি টাঙাবার জন্ত পেরেক পোতার গর্ত। সে-আমলের লোহার টি-আয়রণের পেটাটালির ছাদ, জং ধরে ফাটিয়েছে ছাদকে। গত বর্ষায় সেই ফাটল দিয়ে নেমেছে বর্ষার বসুধারাচিহ্ন।

ভারী খুশী হয়েছে কুশালু মনে মনে। রীতিমত জ্বদ হয়েছে স্বাহা। বেশ চাল চলেছে সে।

কেন, বলে দিতে হবে না কেন ? প্রশ্ন করে স্বাহা।

ইচ্ছা করেই আর এক ধাপ এগিয়ে যায় কুশালু। বলে, ওর টেবিলের উপর ফোটোর স্ট্যাণ্ডটা দেখেই আপনার বোঝা উচিত ছিল ওটাই ওর সীট।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় সাহা। আঁচলের তলা থেকে এতক্ষণে হাতটা বার করে। এতক্ষণে নজরে পড়ে আঁচলের তলায় ওর হাতে ধরা ছিল একগোছা রজনীগন্ধা। টেবিলে সেটাকে নামিয়ে রেখে ফ্রেমে বাঁধান সূত্রতর ফটোটা তুলে নেয়। কেমন যেন ক্লান্ত বিষন্ন লাগছে ওকে। যেন একটা বুকচাপা দীর্ঘশ্বাসকে সে কোনমতে আটকে রেখেছে। সূত্রতর ফটোখানা ধরা আছে ওর হাতে—কিন্তু সেদিকে ওর দৃষ্টি নেই। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে একদৃষ্টে নোনাধরা দেওয়ালের দিকে। দেওয়ালের বুক



স্থানে একটা কতচিহ্ন। এক শিশু মহীকহের বীজ পড়েছিল ওখানে। আলোবাতাসে শিশু-কৌতূহলে চারা গাছটা মাথা তুলে দেখতে চেয়েছিল রূপরসে ভরা এই দুনিয়াকে অবাক বিষয়ে! বাড়িওয়ালার মিস্ত্রি ডেকে গাছটা উপড়ে ফেলেছে। এ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়েছে শিকড়ের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত। সেই কালো গহ্বরটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে স্বাহা!

সানাইয়ের প্রোগ্রামটা এখনও শেষ হয়নি। ক্লাস্ত বিষয় সানাইএর করুণ স্বর এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে সন্ধ্যাবাতাসে। আঁচলের তলা থেকে মুক্তি পাওয়া রজনীগন্ধাও যুক্ত করেছে তার সৌরভ হঠাৎ-ওঠা একটা দমকা হাওয়ায়। কুশাছু একদৃষ্টে দেখছিল আনমনা মেয়েটিকে। এতক্ষণে অবকাশ পেল ভালো করে লক্ষ্য করতে ওর সাজপোষাক। উৎসববাড়ির সুসজ্জিত আয়োজন, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ পেল না। ওর কেন যেন মনে হল এই আশ্রয় মায়াহে ঐ রুদ্ধশ্বাস মেয়েটি ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছে নিজ দেহভার। ও যেন বাস্তবে ওখানে নেই—ও যেন একটা স্বপ্ন। এখনই মিলিয়ে যাবে। কুশাচুর পায়ের পাতা থেকে একটা সিরসিরানি উঠে আসে শিরদাঁড়া বেয়ে। এ অসুভূতিটাকে ও চেনে। যা ভেবেছে তাই। ধূপের ধোঁয়া যেমন আবছা নীল রঙে সূর্য হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় বাতাসে, ঠিক তেমনি করে একে একে মিলিয়ে যেতে থাকে ওর বহিরাবরণ! গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে গরম পীচগলা রাস্তায় যেমন মিলিয়ে যায় ছলকে-পড়া জল কোন চিহ্ন না রেখে, ঠিক তেমনি করেই। একটা আর্তনাদ ওর গলা চিরে বেরিয়ে আসছিল। দু হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে নিজের চৌকিতে। সে শব্দে হঠাৎ চমকে তাকায় মেয়েটি, বলে, কি হল?

অনেক কষ্টে কুশাছু আত্মসংবরণ করে। সানাইয়ের আওয়াজটাও থেমে গেছে। হঠাৎ বসতে গিয়ে বাঁ পায়ের বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা মচকে গেল; আর তৎক্ষণাৎ শারীরিক প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে সম্বিত ফিরে পায়। না, হারিয়ে যাওয়া কাপড়-জামা আবার ফিরে এসেছে। প্রত্যক্ষকে পার-করা দৃষ্টিটা মিলিয়ে গেছে। সামলে নিয়ে কুশাছু বলে, মাথাটা কেমন ঘুরে উঠেছিল।

অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে স্বাহা।

ভীষণ রাগ হয়ে যায় কুশাচুর। একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারত রাগটা ওর হয়েছিল রোগের পুনরাক্রমণে। আর সেজন্যে মেয়েটির কোন

দোষ নেই। কুশাহু মনে মনে আশা করেছিল এবার মেয়েটি নীরবে বিদায় নেবে। তবু তাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু রুচস্বরেই বলে, আমি অসুস্থ। একটু বিশ্রাম করব। আর কিছু বলবেন?

মেয়েটি রীতিমত বিহ্বল হয়ে পড়ে; বলে, এখানে তো দ্বিতীয় কাউকে দেখছি না—এভাবে অসুস্থ আপনাকে কেনে রেখে—

কুশাহুর হাতখানা টেনে নিয়ে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করে।

হাতখানা ছাড়িয়ে নেয় কুশাহু। বলে, মাপ করবেন, আমি একটু একলা থাকতে চাই।

স্বাহা একটা মুহূর্ত ইতস্তত করে। যেন কিছু বলবে সে। কিছু বলে না কিন্তু শেষ পর্যন্ত। একটা বোবা-কান্না সত্যিই বুক ঠেলে উঠে আসছিল কুশাহুর। সে শুয়েই পড়ে।

ওর বালিসটা মাথার নীচে ঠিক করে দিয়ে মেয়েটি নীরবেই চলে গেল। বাইরে দাঁড়ানো ট্যাক্সিটা বিদ্যুটে একটা হাসির আওয়াজ তুলে যবনিকা টানল এ অধ্যায়ের।

অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে পড়ে থাকার পর বেশ সূস্থ বোধ করে। পায়ের আঙুলে বেশ ব্যথা আছে এখনও। চোখ তুলে তাকায়, উঠে বসে। যেন একটা স্বপ্ন দেখে উঠল এইমাত্র! উৎসবমুখরিত বাসর-রজনীর যে মুহূ সৌরভ নিয়ে এসেছিল ওর স্বপনচারিণী—বাতাসে যেন তার স্পর্শ তখনও লেগে আছে। সত্যিই স্বপ্ন দেখছিল নাকি এতক্ষণ? থার্ডক্লাস কামরায় কাল সরাবাত দুটি চোখের পাতা এক করতে পারেনি। তাই কি নিজের ঘরে এসে খাটে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল? স্বাহা তাহলে আসেনি? সবটাই স্বপ্ন?

কিন্তু না। এ সৌরভ তো স্বপনচারিণীর পদ্যগন্ধ নয়, ঐ তো টেবিলের উপর মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা!

নাটকের মত জীবনটাও যেন অন্ধে আর গর্তাঙ্কে ভাগ করা। কুশাহুর মনে হয় এবারকার পূজার ছুটিটা প্রথম অন্ধের দীর্ঘ বিরতি। জং ধরা টি-আয়রণ-গুলোর দিকে তাকিয়ে চুপ করে পড়ে থাকে একা মেসে। মাঝে মাঝে জোর করে বই খুলে বসে। মনকে বোঝায় নতুন জন্ম হয়েছে তার, না কি পুনর্মূষিক হয়েছে এতদিনে আবার? সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে ইলাকে পড়াবার দায় নেই—

সে গেছে মাসীমার বাড়ি পূজার ছুটিতে। ইভা চলে গেছে শ্রীরামপুরে। খবরটা পেয়েছিল ও বাড়িতে গিয়ে। ইভার শ্বশুর মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তিনি নাকি তাঁর স্বাবর-অস্বাবর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেছেন পুত্রবধূকে, পুত্রকে নয়। যদিও শেষ সময়ে কোথা থেকে কি করে খবর পেয়ে এসেছিল স্ককাস্ত। আত্মশাস্তি মিটিয়ে চলে গেছে নিশ্চিন্ত হয়ে, সব বাঁধন কাটিয়ে। ভবতারণ আগের মতই মেয়েকে নিজের কাছে এনে রাখতে চেয়েছিলেন, ইভাই রাজি হয়নি। শ্বশুরের সম্পত্তি এতদিন দেখাশোনার অভাবে নষ্ট হয়েছে, আর নাকি নষ্ট হতে দেওয়া চলে না। তাই ইভা শ্রীরামপুরেই থাকে আজকাল। কুশানু শুনে অবাক হয়ে ভাবে—কাব জগ্রে এ যক্ষের ধন আগলে রাখছে ইভা? সে কি আশা করে পুড়িঙের লোভে না হোক, অস্তুত সম্পত্তির লোভেও একদিন ফিরে আসবে স্ককাস্ত?

ফেলে আসা দিনগুলোর কথা বারে বারে মনে পড়ে। ইভার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনগুলো। সকাল দশটায় ছুটত যুনিভাসিটিতে। চারটে বাজলে বেরিয়ে আসত। কখনও বসত গোলদীঘিতে, কখনও হাঁটতে হাঁটতে চলে যেত এসপ্লানেডে। সেখান থেকে ধরত দক্ষিণমুখো ট্রাম। গিয়ে উঠত জাশনাল লাইব্রেরীতে। যুগযুগান্তরের অমৃত মনীষীদের নানা চিন্তাধারার শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার। রিজার্ভে রাখা বই ইস্যু করিয়ে পড়ত ঘণ্টা দেড় দুই। ছটা বাজলেই ভারি মিষ্টি একটা ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যায়। বই বন্ধ করে উঠে পড়ত। পীচ ঢালা পথটুকু পার হয়ে হাজরা রোডে হেঁটেই চলে আসত। শেড দেওয়া আলোকোজ্জ্বল টেবিলের একটা কোণা যেন ওকে টেনে নিয়ে আসত। সেখানে বসে ও ট্রান্সলেশন সংশোধন করে দিত ওর ছাত্রীর আর সামনে বসে অঙ্ক কষত ইলু। কুশানুর ষষ্ঠ ইঞ্জিয় সজাগ হয়ে থাকত কখন নড়ে ওঠে জোড়া হাতী আঁকা শাস্তিনিকেতনী পর্দাটা। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেত তা যেন টেরই পাওয়া যায়না। ফিরে আসত আবার তিন নম্বর বাসে। আলোকোজ্জ্বল চৌরঙ্গী পার হয়ে হু হু করে ছুটে এসে পৌছাত মেসে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে নিজের ঘরে ঢোকান আগে একনজর দেখে নিত কাঠের ছোট ডাকবাক্সটা। কোন কোনদিন ওর ভিতর থেকে উদ্ধার করত চিঠি। অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন ঘুম আসত না। চিঠি পড়া, জবাব লেখা অথবা আপন মনেই না দেখে লিপিবন্ধুর মানস চিত্রে যোজনা করত নূতন রঙ।

এখন এর কোনটাই নেই। না সেই যুনিভার্সিটিতে কলমুখরিত গুঞ্জন, না সাক্ষ্য ট্যুইশানির মায়াজাল, না চিঠির কাগজে বিনিম্বতোর মালা গাঁথা। চিঠি লেখা বন্ধ হয়ে গেছে। মনে হয় সে পরিচ্ছেদও শেষ হয়েছে একেবারে। খান দুই চিঠি লিখে জবাব না পেয়ে শেষ পর্যন্ত রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়েছিল কুশাহু ; প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছে সেটা। এই লিপিবন্ধুত্বের স্রব হয়েছে যেন আকস্মিকতায়, শেষও হল তেমনি ভাবে। স্বাহার শেষ চিঠিখানা পড়েছিল কুশাহু পরে। আর সেই জন্তেই বারে বারে লিখেছিল স্বাহাকে— কিন্তু সম্ভবত নতুন যোগসূত্র স্থাপন করতে স্বাহা রাজী নয়। শেষ চিঠিখানা কুশাহু প্রায়ই পড়ে, স্বাহা লিখেছিল—

স্টেশনে তোমাকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত মর্মান্ত হইয়াছিলাম। শুধু মর্মান্তই নয়, অপমানিতও। তখনও আসল কারণটা জানা ছিল না আমার। বাড়িতে এসেও মনটা শান্ত হল না। কেমন যেন একটা জালা বোধ হচ্ছিল। সত্যিই তাহলে হেরে গেলাম সেই একটা অজাত প্রতি-দ্বন্দ্বিনীর কাছে? বিয়েবাড়িতে অসংখ্য কাজ, চারিদিক থেকে সবাই আমাকে ঘিরে রইল সারাটা দিন। তবু মনটা লুকিয়ে লুকিয়ে গুমরে মরে। দাদা থাকলে এতটা দায়িত্ব ছিল না আমার। আমি আবার কলকাতার পথঘাট ভাল চিনিও না। সত্যি কথা বলতে কি, এখন বুঝছি মনে মনে তোমার উপর নির্ভর করেছিলাম অনেকটা। ভেবেছিলাম স্টেশন থেকেই ধরে নিয়ে যাব তোমাকে বিয়েবাড়িতে। সবার সাথে আলাপ করিয়ে দেব। লজ্জা ভেঙে গেলে আর কোন অসুবিধা তোমার হবে না। তোমার ছুটি হয়ে গেছে সুতরাং তোমাকে পুরোপুরি না পাওয়ার কোন কারণ নেই। দুজনে একসঙ্গেই সারতে পারব বিয়ের বাজার। তাই স্থির করলাম তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে। মাসতুত এক ভাইকে সঙ্গে করে গেলাম তোমাদের মেসে। শুনলাম কি একটা প্রয়োজনে তুমি দার্জিলিং চলে গেছ। কবে ফিরবে তা ওঁরা বলতে পারলেন না। আমি কিন্তু হাল ছাড়িনি। তুমি আগে একটা চিঠিতে লিখেছিলে একজন বড় পুলিশ-আফসারের মেয়েকে তুমি পড়াও। নামটাও মনে ছিল, ভবতারণ ঘোষাল। ভাবলাম ঘোষাল সাহেব নিশ্চয় বলতে পারবেন কতদিনের জন্য তুমি দার্জিলিং গেছ, তাঁর মেয়ের প্রাইভেট ট্যুটার কতদিন অসুস্থ হইয়া থাকবেন। টেলিফোন গাইড খুঁজে হুদিস পেতে দেবী হল না। টেলিফোন করলাম। ধরলেন ঘোষাল-তনয়া



ইভা দেবী। তোমার খোঁজ করছি শুনে জানতে চাইলেন আমি কে। বললাম, আমি তাঁর বান্ধবী। ইভা দেবী কি জানি কেন আলাপ করতে চাইলেন আমার সঙ্গে, নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর বাড়িতে। তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করতে নয়, গেলাম নিজের গরজেই। তোমাকে জানবার কোন সূত্র তুমি আমাকে দাওনি, দেখাই থাক না এ ভদ্রমহিলার কাছ থেকে তোমার নতুন কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা।

গেলাম। হ্যাঁ, অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করা গেল বটে। জানলাম তুমি দার্জিলিঙে পৌঁছে দিতে গেছ ইভার ছোট বোনকে। ছোট বোন শুনে ভেবেছিলাম মেয়েটি এতই ছোট যে পৌঁছে না দিলে সতাই সে যেতে পারেনা। সে ভুল ভাঙল দেওয়ালে টাঙান ওদের তিন বোনের একটা ফটো দেখে। বুঝলাম, কেন তুমি স্টেশনে আসনি! কথাবার্তায় মনে হল শুধু আইভি আর ইভা দেবীই নয়, স্বয়ং ঘোষালসাহেবও তোমাকে খুব স্নেহ করেন। তিনি তোমাকে চান অতি নিকট আত্মীয়রূপে।

তাই এই চিঠি লিখছি। আমাকে মাপ কর তুমি। এত কথা আমি জানতাম না। তোমাকে একজন ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ারের নিঃসম্বল ছাত্র বলেই জানতাম এতদিন—তাই জানতে দিয়েছিলে তুমি। আসলে তুমি যে স্বনামধন্য অপুত্রক ভবতারণ ঘোষালের জামাতা হবার স্বপ্ন দেখছ তা তো আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানাওনি এতদিন। জানালে ছেলেমানুষের মত এ প্রগল্ভতা কখনও করতাম না নিশ্চয়।

একটা কথা। আমি কুশাহু রায়কে মনে মনে যে রঙে এঁকেছিলাম, আজব শহর কলকাতায় এসে দেখছি কুশাহু রায় বাস্তবে সে রকম নয় মোটেই। আমি যে কুশাহু রায়কে চিনতাম সে কেমন জান? সে তুমি মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পার না, সে তুমি অনাত্মীয় কোন তরুণী মেয়ের সঙ্গে প্রমোদ ভ্রমণে প্রস্তাবে মূর্ছা যাও, সে তুমি তোমার লিপিবন্ধুর কাছ থেকে কখনই গোপন করতে পার না তোমার আসন্ন বিবাহের সংবাদ!

আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে তোমাকে দেখতে। কেমন মানুষ তুমি? আমার সনির্বন্ধ অহরোধ তুমি একবার এসে দেখা কর আমি পার্টনা ফিরে যাবার আগে। যদি না আস তবে আমিই আবার একবার যাব তোমাদের মেসে। ভয় নেই—নতুন করে জড়াব না তোমাকে। আমার মনে আর কোন দ্বন্দ্ব নেই; যে বেকনাটা পেয়েছিলাম তুমি স্টেশনে না আসার

সেটা আর নেই। কোনও অপার্থিব মানসীর কাছে আমি হারিনি—হেরে গেছি রক্তমাংসে গড়া অপুত্রক পিতার একটি আধুনিক কন্ঠার কাছে—এ তো খুবই স্বাভাবিক। তাই কোন খেদ নেই আমার। শুধু একবার অভিনন্দন জানাতে চাই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। শুধু দেখব একটু তাকিয়ে তোমাকে। জেনে যাব যে অদেখা মানুষটাকে দূর থেকে ভালবেসে আমার জীবনের প্রথম স্বপ্ন গড়েছিলাম সে মানুষটা কেমন। তাতে নিশ্চয় আইভি দেবী রাগ করবেন না, কারণ সেই সাক্ষাৎই হবে আমাদের প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ। এরপর চিঠিপত্র লেখাতেও হবে ইতি।

দুখানা চিঠি লিখেও জবাব না আসায় শেষ পর্যন্ত রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়েছিল কুশান্ন। সেখানা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছে। চিঠি গ্রহণ করেনি স্বাহা। হয়তো আগের চিঠি দুখানাও না পড়েই ছিঁড়ে ফেলেছে। এক একবার ভাবে যাবে নাকি চলে পার্টনার? আবার ভাবে কী দরকার? জীবনের এতগুলো বছর যদি এভাবে কেটে গিয়ে থাকে তবে বাকি কটা বছরও যাবে কেটে। মনকে বোঝায়—স্বাহাকে তো সে কোনদিনই ভালোবাসেনি—সুতরাং ক্ষতিও হয়নি কিছু তার।

অবশেষে চিঠি এল। খামটা খুলে আশাহত হল কুশান্ন। না, পার্টনার চিঠি নয়, এ চিঠিখানি এসেছে শ্রীরামপুর থেকে :

শ্রীচরণকমলেশ্বর, আমার চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে যাবেন নিশ্চয়। কিন্তু সত্যিই অবাক হওয়ার কিছু আছে কি? আপনি তো আমাকে একদিন বান্ধবী বলে স্বীকার করেছিলেন—বান্ধবীর চিঠি নিশ্চয় একেবারে অপ্রত্যাশিত বস্তু নয়।

আপনাকে কয়েকটা কথা না লিখে পারছি না। আগামী সপ্তাহেই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। যাচ্ছি অনেক দূরে—মধ্যভারতে। আবার কবে বাংলা দেশে ফিরব জানি না। এলেও আপনি তখন কোথায় থাকবেন জানব কি করে? তাই যাওয়ার আগে আপনাকে একটা অনুরোধ করতে চাই। রাখবেন আমার অনুরোধ?

জানেন নিশ্চয়, আমার শশুর মারা গেছেন। তিনি তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দিয়ে গেছেন। শেষ সময়ে সংবাদ পেয়ে উনি এসেছিলেন। পিতাপুত্রে মিলন হয়েছিল, এইটুকুই সাহসনা। কিন্তু মিল হয়নি বোধ হয়। কি জানি কী ভাবলেন আমার শশুর, সব কিছুই আমাকে

দিয়ে গেলেন। বোধ হয় ভেবেছিলেন আর কিছুর জন্তে না হলেও—অন্তত আর্থিক কারণেও তিনি আমাকে স্বীকার করে নেবেন। অথবা হয়তো ভেবেছিলেন তাঁর সঞ্চিত অর্থ পুত্রের অধোগমনের পথ পিচ্ছিল করে তুলবে শুধু। সে যাই হোক তিনি আমার স্বক্ষে দিয়ে গেলেন দুর্বহ ভার।

উনি মধ্যপ্রদেশেই থাকেন, রায়পুর। সেখানেই চাকরি করেন। শ্রাদ্ধ-শাস্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এখানে ছিলেন। আপনাকে জানাচ্ছি, কারণ জেনে নিশ্চয়ই খুশী হবেন আপনি—অশোচাবস্থায় তিনি মদ স্পর্শ করেননি। আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম ওর দৃঢ়তা দেখে। তাহলে ইচ্ছা করলে তো ও সব পারে। আমার সঙ্গে কিন্তু তিনি বাক্যালাপও করেননি। অশোচাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী নাকি একাধানে বসে নিষিদ্ধ—কিন্তু বাক্যালাপ করার বিধানও দিয়ে যাননি কি মনু-পরাশর? ঠিক জানি না। শ্রাদ্ধশাস্তি মিটে গেলে তিনি কর্মস্থলে ফিরে যাবার জন্ত প্রস্তুত হলেন। আমি কোন প্রকার সঙ্কোচ করিনি, সোজা গিয়ে প্রশ্ন করলাম—আমাকে তুমি কি করতে বল?

উনি আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, তোমার বিবেক যা বলে।

আমি বলেছিলাম—আমার বিবেক বলে, তোমার সঙ্গে যেতে।

আর তোমার এ সম্পত্তি?

তুমি যদি না নাও তাহলে দান করে যাব।

উনি অনেকক্ষণ কোন জবাব দেননি, তারপর আমার দিকে মুখ তুলে বললেন, অপেক্ষা কর কিছুদিন। আমি ভেবে তোমাকে জানাব।

এতকথা আপনাকে কেন লিখছি জানি না। মনে হচ্ছে আপনাকে সব কথা লিখলে মনটা হাল্কা হবে। একদিন আপনি সসঙ্কোচে প্রশ্ন করেছিলেন আমার স্বামীর সম্বন্ধে, তিনি একজন অমাত্য এই ধারণাই নিয়ে গেছেন আপনি। সেটা আপনার ভুল ধারণা, বোধ হয় এটা না জানিয়ে চলে যেতে পারছি না—তাই হয়তো এতকথা লিখে ফেললাম।

আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হল উনি গেছেন, ঠিক তিন সপ্তাহ নয়, আজ নিয়ে উনিশ দিন। কাল তাঁর চিঠি পেলাম। লিখেছেন আমাকে তৈরি হয়ে থাকতে। আগামী সোমবার তিনি আমাকে নিতে আসছেন। আরও লিখেছেন—না, থাক সে সব কথা!

মাস্টার মশাই, কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি। মনটা ভীষণ চঞ্চল

হয়ে রয়েছে। যাওয়াই স্থির করেছি। আপনাকে একটা অনুরোধ করছি। আগামী রবিবার সকালে আপনি শ্রীরামপুরে আসুন। আমি অবশ্য আজই কলকাতা যাচ্ছি, বাবাকে প্রণাম করে আসতে। কিন্তু আমি চাই না সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। কালই আমি শ্রীরামপুরে ফিরে আসব। আপনি যদি রবিবারে আসেন তা হলে এখানেই দেখা হবে। যাবার আগে আবার একটা দিন আপনাকে নিজে সামনে বসিয়ে যাওয়াতে ইচ্ছা করছে। এখানে সেদিনকার মত দুপুরে বিশ্রাম করে সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে যাবেন।

আশা করি, আমার এ ভিক্ষা মঞ্জুর হবে। প্রণাম নেবেন। ইতি।

চিঠিখানা পড়ে কৃশানু মনে মনে হাসে। ইভা নাকি তার বান্ধবী! বন্ধুকে কেউ শ্রীচরণকমলেষু পাঠ লেখে, না প্রণাম জানিয়ে শেষ করে চিঠি? এ কেমনতর বান্ধবী তার?

ইভার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সন্ধ্যাবেলা গেল সে হাজরা রোডের বাড়িতে। দীর্ঘ—দীর্ঘদিন ইভা ওর সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখেনি। সেই শ্রীরামপুর থেকে ফেরার পর থেকেই সে দূরে সরে গিয়েছিল। তারপর অবশ্য দার্জিলিং যাওয়ার দিন দেখা হয়েছিল, কিন্তু সে দেখা যেন না হলেই ভাল ছিল। সেদিন দেখা গিয়েছিল অভিমানী ইভাকে। তারপর এই চিঠি!

হাজরা রোডের বাড়িতে কিন্তু ইভার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। সে এসেছিল এবং চলেও গেছে। দেখা হল ভবতারণের সঙ্গে। বাক্যালাপও হল কিছুটা। কথা বলতে গিয়ে খেয়াল হয় কৃশানু'র দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে সে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎই করেনি। এটা অন্তায় হয়েছিল নিশ্চয়। আইভি অবশ্য নিজেই নিশ্চয় নিরাপদ পৌছান সংবাদ দিয়েছে—কিন্তু তারও উচিত ছিল ফিরে এসে সে কথা বলা। তাছাড়া যে উদ্দেশ্যে তাকে পাঠিয়েছিলেন ভবতারণ সে উদ্দেশ্যের যে যবনিকাপাত ঘটেছে এটাও আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য। সে কথার স্মৃতিতেই তাকে বাধা দিয়ে ঘোষাল সাহেব বলেন, আই নো, আই নো; ইভা আমাকে বলেছে সব কথা। দোষ আমারই। আমারই উচিত ছিল তোমাকে সাবধান করে দেওয়া। আমার খেয়াল হয়নি তুমি এভাবে আমার ট্রাম্প-কার্ডটা একপোস করে দিতে পার।



যথারীতি অবোধ্য মনে হয়েছিল কথাগুলো। কুশানু জানে অপেক্ষা করলে পরবর্তী কথার সূত্র থেকে বোঝা যাবে পূর্ববর্তী বক্তব্যে কি বলতে চেয়েছেন ঘোষাল সাহেব। এতদিনের পরিচয়ে এটুকু সে বুঝতে শিখেছে যে একবারে বোঝা যায় না ভবতারণের কথা। এবার কিন্তু পরবর্তী যোজনাটা আরও দুর্বোধ্য মনে হল ওর। ওয়াইন গ্লাসটা পূর্ণ করতে করতে ঘোষাল সাহেব বললেন, আই স্‌ড হ্যাড এ্যাডভাইস্‌ড যু টু ইলোপ উইথ হার বিহাইণ্ড মাই ব্যাক।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় কুশানু দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে।

কি, বুঝতে পারলে না আমার কথা? দেন রীড দিস্ লেটার—

টানা ড্রয়ার খুলে একটা খাম বার করে সেটা গুঁজে দেন কুশানুর হাতে। কুশানু খামটা খুলে পড়তে থাকে, আর আডচোখে লক্ষ্য করে পানরত ঘোষাল সাহেবকে। চোখ দুটো তাঁর ইতিমধ্যেই জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে।

চিঠিখানা লিখেছেন কানপুরের সেই বিখ্যাত ব্যবসায়ী চৌধুরী মশাই— লিখেছিলেন ঘোষাল সাহেবকেই। দ্রুত চোখ বুলিয়ে যায়। মেয়ে দেখে ফিরে গিয়ে কানপুর থেকে ভদ্রলোক চিঠিখানা লিখেছিলেন, তা বোঝা যায়। আশ্চর্য, চৌধুরী সাহেব জানাচ্ছেন, আইভিকে তাঁর পছন্দ হয়েছে। লিখেছেন, তিনি বিলাতী কেতার মাসুখ, তাঁর সংসারে প্রাচীন অন্ধ সংস্কারকে তিনি কোথাও ঢুকতে দেননি। কোতুক করে লিখেছেন সেইজন্মেই মেয়ে দেখতে ষাবার দিন চল্লিশ বছর পরে তিনি প্রথম ধুতি-পাঞ্জাবী পরেছিলেন। তিনি সত্যিকারের আলোকপ্রাপ্তা একটি আধুনিক মেয়ের সন্ধান করছিলেন। তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক নাকি সারা ভাবতে বিস্তৃত। নিজে বিবাহ করেছেন একটি মারাঠি পরিবারে—তাঁর ছোট ভাই একজন পাঞ্জাবিনীকে। সবকয়টি পরিবারই প্রগতিপন্থী। মেয়ে দেখার জন্য যে অভিনয় তাঁকে করতে হয়েছিল তা শুধু মেয়ে সত্যিকারের আধুনিক। কিনা তাই যাচাই করতে। না হলে বিবাহ ব্যাপারে তিনি পণপ্রথা এবং মেয়ে দেখানোর বিরোধী। শেষ দিকে ভদ্রলোক লিখেছেন, আপনি বলিতে পারেন, এতই যদি আপনি প্রাচীনতা-বিরোধী তাহা হইলে নির্বাচনভার পুত্রের উপর অর্পণ করেন নাই কেন? আমি বলিব তাহাই করিয়াছি। গত বৎসর আমার পুত্র দার্জিলিঙে বেড়াইতে যায়—সেখানে আইভির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। তবে

সে যে আমারই পুত্র এ কথা আপনার কণ্ঠা জানিত না। সম্ভবত এখনও জানে না। যাহাই হউক, আমি সর্বাস্তঃকরণে আপনার কণ্ঠাকে অমুমোদন করিতেছি। আমার পুত্রের নিকট জানিয়াছি আপনার কণ্ঠাও তাহাকে পছন্দ করিয়াছে। এখন আপনার কণ্ঠা এই প্রাচীনপন্থী স্বত্ত্বটিকে বরদাস্ত করিতে রাজী হইলেই শুভশ্রু শীঘ্রম্।

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, পুত্রের বিবাহে কোনও সর্ত আরোপ করিব না। কোন দাবী থাকিবেনা আমার তরফে। আপনার কণ্ঠাকে দেখিতে গিয়া বুঝিয়াছি আমার সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। আমার সেই সর্তটি হইতেছে নিম্নোক্তরূপ—আমি যেদিন আপনার কণ্ঠাকে আশীর্বাদ করিতে যাইব সেই দিন তাহাকে কলিকাতার উপকণ্ঠে আমার একটি বাড়ির দানপত্র এবং পঁচিশ হাজার টাকার একখানি কোম্পানীর কাগজ তাহাকে দিয়া আশীর্বাদ করিব। সর্ত এই যে আপনার কণ্ঠাকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে এবং আমাকে কথা দিতে হইবে যে ব্যবসায় আমি যদি সত্যি কোনদিন দৈবদুর্বিপাকে দেউলিয়া হইয়া পড়ি তবে ঐ মাঝাক প্রশ্নটি সে আর আমাকে কখনও করিয়া বসিবে না।

দেখলে? প্রশ্ন করেন ঘোষাল সাহেব।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ভয়ে ভয়ে বলে কুশানু।

বলতে পার এর পর কি হল? ঘোলাটে-লাল চোখ দুটো মেলে প্রশ্ন করেন ভবতারণ। তাবপর কুশানুর জবাবের অপেক্ষা না করেই বলেন, আইভি রাজি হয়নি এ সর্ত মেনে নিতে।

রাজি হয়নি! কেন?

একই ভুল! ট্রাম্প-কাডটা দেখে ফেলেছে আইভি! আর হার মানবে কেন। আর ভুল কি একা আইভি কবছে? সবাই আমরা ভুল করে যাচ্ছি শুধু আজীবন। ভুল করছি আর ভুলে যাচ্ছি; কিন্তু আমাদের সে ভুল সে কথা ভুলছে না—চক্রবর্ত্তিহারে মাণ্ডল আদায় করে নিচ্ছে সে। শী ইজ এ স্টার্ন মিস্ট্রেস!

নিঃসন্দেহে মাতলামী শুরু করেছেন এবার ভবতারণ। বড় মেয়ে চলে গেছে জীরাপপুরে; মেজ মেয়ে ছুটিতেও বাড়ি আসেনি, ছোট মেয়ে গেছে তার মাসীর বাড়ি। ভবতারণ শালীনতার মাত্রা ছাড়াতে বোধ হয় আর কোন বিধা বোধ করছেন না। মাত্ৰাতিরিক্ত মত্তপান করছেন নিজের ঘরে

বসে। আদালীটা দাঁড়িয়ে আছে পাশে। বরফ, সোডা, হুইকি, স্ম্যাকস্ যোগান দিয়ে যাচ্ছে—দিয়ে যাবেও যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে তাঁর। তারপর উনি যখন এলিয়ে পড়বেন ইজিচেয়ারটায়, তখন খুলে দেবে জুতো-মোজা-টাই-কলার। ধরাধরি করে শুইয়ে দেবে খাটে। প্রসাদের অবশিষ্টাংশটুকু গলাধঃকরণ করে রামপ্রসাদী ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ি ফিরে যাবে মধ্যরাত্রে।

চুপি চুপি পালিয়ে এসেছিল কুশানু ঘর থেকে।

এবার আর শুকে দেখে হাত তুলে নমস্কার করল না ইভা, চটুল ভদ্রিতে বলল না, স্বপ্ন, না মায়া, না গতজন্মের পুণ্যফল। কুশানুর সামনে এসে গলায় আঁচল দিয়ে ওর পদপ্রান্তে নামিয়ে দিল একটি সলজ্জ প্রণাম। প্রথম শ্রেণীর পুলিশ অফিসারের লরেটো-লালিত কণ্ঠ্যে এ আচরণ কিন্তু একটুও অসঙ্গত মনে হল না কুশানুর। বলল এসে গদি আঁটা একটি সোফায়। ঘরটার পরিবর্তন লক্ষণীয়। ছোবড়া-ওঠা সোফা সেটগুলো সংস্কার করা হয়েছে। জানলায় উঠেছে হালকা নীল রঙের কাজ করা পর্দা। টিপয়ের উপর সেদিনকার সেই উর্গনাভ অধ্যুষিত রূপার কাপগুলি ঝকঝক করছে। সারিবদ্ধভাবে সেগুলি সাজান, ছোট থেকে বড়—বড় থেকে ছোট। সমস্ত পরিবেশটাই ঝকঝক করছে। সে কথাই বলল কুশানু প্রথমে, আপনি তো ঘরখানাকে একেবারে ঢেলে মেজেছেন।

ওর কাঁধ থেকে শান্তিনিকেতনী হাতব্যাগটা খুলে নিয়ে আলনায় টাঙিয়ে রাখতে রাখতে ইভা বলে, মানুষজন থাকলেই ঘরের শ্রী ফেরে।

মানুষজন নয়, গৃহলক্ষ্মী থাকলেই লক্ষ্মীশ্রী ফেরে। আমাদের মেসের ঘরে আমরা চারজন মানুষ থাকি কিন্তু কই শ্রী তো ফেরে না।

হেসে ইভা বলে, চার বন্ধু তাহলে চারটি লক্ষ্মীর সন্ধানে বেবিয়ে পড়ুন।

আবার সেই চটুল লাশ্চর্য্যই ইভা।

কুশানুও আজকাল কথার পিঠে কথা বলতে শিখেছে, বলে, লক্ষ্মীলাভ করা কি অতই সহজ ইভা দেবী। লক্ষ্মীর পিছন পিছন হিমালয় পর্যন্ত তো ধাওয়া করলাম, লক্ষ্মীছাড়া কপালে কিছু জুটলো কি?

তার জন্তু আপনি নিজেই দায়ী। অবশ্য শুধু আপনার নয়, তুলে আমাদেরও

হয়েছে। অস্তুত আমার উচিত ছিল সব কথা বলে আপনাকে সাবধান করে দেওয়া।

কৌতূহলী হয়ে কুশানু বলে, ব্যাপারটা কি বলুন তো? আপনার বাবাও সেদিন এই ধরনের কি একটা কথা বললেন, বুঝতে পারিনি।

এখন অবশ্য পোস্টমর্টামের কোন মানে হয় না। যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে, সংশোধনের আর পথ নেই কোন। তবু যাবার আগে আপনার একটা ভ্রান্ত ধারণা ভেঙে দিয়ে যাব আমি। না হলে আমার বোনটির প্রতি আপনি অহেতুক অবিচার করবেন মনে মনে। আচ্ছা, জয়ন্ত শীল অথবা অর্ধেন্দু চৌধুরীকে সে বিয়ে করতে কেন রাজি হয়নি জানেন?

জয়ন্ত শীলের নাম শুনেছি, কিন্তু অর্ধেন্দু চৌধুরী কে?

কানপুরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী চৌধুরী মশায়ের একমাত্র ছেলে। কেশ্বিজের গ্র্যাডুয়েট, সুন্দর চেহারা, ভাল এ্যাথলেট, আর আইভির অস্তরঙ্গ বন্ধু।

বুঝলাম, এঁর বাবাই একটি বাড়ি আর কোম্পানীর কাগজ দিয়ে আশীর্বাদ করতে চেয়েছিলেন আইভিকে। কিন্তু আইভি রাজি হয়নি কেন?

তা যদি বুঝতেন তাহলে একথাও বুঝতেন কেন সেদিন হঠাৎ হোটেল থেকে চলে গিয়েছিল আইভি।

মাথা নীচু করে কুশানু বলে, আপনাকে তাহলে সত্যিই সে সব কথা লিখেছে?

সব। আপনি বিশ্বাস করুন মাস্টারমশাই, একটা কথাও সে মিথ্যা বলেনি আপনাকে। ওব অসংখ্য বয়-ফ্রেণ্ড আছে, কিন্তু আজও সে অনাত্রাতা। আপনার মত সেও একটা মানসিক অসুখে ভুগছে। আপনার মনোবিকলনের কাবণ অবশ্য আমি জানি না। হয়তো মনোবিদেরা তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন, কিন্তু রোগমুক্তির যে মহোষধ আইভি প্রেসক্রাইব করেছিল, আমার মনে হয় সেটাই একমাত্র অব্যর্থ। আপনি মাথা তুলুন মাস্টারমশাই, এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, অসুখ অসুখই। আর যে অসুখের যে ওষুধ।

তবু মাথাটা তুলতে পারে না কুশানু। স্বাহাকে সে সব কথা জানিয়েছিল, কোন সঙ্কোচ বোধ করেনি, বোধ হয় কাগজ-কলমের মাধ্যমে সেটা ঘটেছিল বলে। বলেছিল আইভিকেও—তখনও লজ্জা বোধ করেনি, কারণ তার পূর্বেই প্রগল্ভ আইভি খুলে দিয়েছিল নিজের মনের কপাট, তার লজ্জাকর



গোপন কথা অকপটে জানিয়েছিল কুশাক্ষকে। কিন্তু ইভার সঙ্গে ওর সে সম্পর্ক নয়। ইভাও প্রগল্ভ, কিন্তু স্বাভাব্য রেখে চলে সে। ক্ষণিক বিহ্বলতার একটি মুহূর্ত ছাড়া ওরা ‘আপনি’র দূরত্ব মেনে চলে আজও মৌখিক বন্ধুত্ব স্বীকার করলেও। তাই ইভা ওর গোপন কথা জেনে ফেলেছে শুনে কুশাক্ষ বেশ একটু আড্ডা হয়ে ওঠে। সেটা নজর এড়ায় না ইভারও। তাই সে নানা বাজে কথায় স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। ইভা বলতে থাকে—আমার দাদামশায়ের কথা আপনাকে আগেও একদিন বলেছি বোধ হয়। এখনও তিনি বেঁচে আছেন। বিরানী বছরের পঙ্গু বৃদ্ধ। আজীবন আচার নিষ্ঠাকেই আঁকড়ে আছেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত। এখনও স্বপাক আহার করেন। মাঝে তিনি ভীষণ অসুখে পড়েন। রান্না করার ক্ষমতা ছিল না। অথচ আমাদের ছোঁয়া তিনি খেতেন না। ডাক্তারে বলছে তাঁকে পুষ্টিকর খাবার খেতে, কিন্তু উঠে বসে বাঁধবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। মামীমা বলতেন, আমার রান্না খেলে কি সত্যিই আপনার জাত যাবে বাবা? আপনাকে রেঁধেবেড়ে খাওয়াতে কি আমাদের সাধ যায় না? আমার দাদামশাই হেসে বলতেন, জাত যাবে কেন মা। খাব, তোমার হাতে খাব, তবে তোমার কোলে আবার এসে যখন জন্মাব তখন খাব।

অসুখ যখন বেড়ে গেল তখন ডাক্তারবাবু বললেন, একে চিকেন ব্রথ খাওয়াতে হবে। না হলে বাঁচবেন না উনি। আমরা বুঝলাম, তাহলে মারাই যাবেন উনি এবাব। ও বাহুল্য অল্পবোধটা কেউ কবল না তাঁকে, করতে সাহসও পেল না। দাদামশাই বললেন, ডাক্তার এমন কোন ওষুধ দিতে পার, যাতে উঠে বসে দুটো ফুটিয়ে নিতে পারি? আমি ভাত খাই না, তাই এ বেটাবেটিদের মুখে অন্ন রোচে না।

ডাক্তারবাবু বললেন—পারি, কিন্তু আপনাকে চিকেন ব্রথ খেতে হবে।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ডাক্তারবাবুর দুঃসাহস দেখে। দাদামশাই একটু চুপ কবে থেকে বললেন, ডাক্তার, তাহলে এমন কোন ওষুধ দিতে পার, যাতে শিগগির শিগগির যেতে পারি?

এবারও ডাক্তারবাবু সেই দুঃসাহসিক হাসি হেসে বললেন, পারি—কিন্তু সেটা দেওয়া আমাদের শাস্ত্রে মানা। আপনি যেমন আপনার শাস্ত্র মেনে চলেন, আমাকে তেমনি আমার শাস্ত্রও তো মেনে চলতে হবে। উপায় নেই, এমন ভাবেই দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে হবে আপনাকে।

অনেককণ চিন্তা করে দাদামশাই বললেন, নিয়ে এস চিকেন ব্রথ। আমি খাব। যদি মরতেই না পারি, তবে এদের না খাইয়ে মারি কেন? আতুরে নিয়ম নাস্তি।

আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, দাদামশাই মুরগীর জুস খেলেন—আবার যেদিন গিয়ে বসতে শুরু করলেন উছনের পাড়ে, সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে গেল শুধু মুরগীর জুসই নয়, যাবতীয় ঔষধ।

দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে ইভা বলে, তাই বলছিলাম মাস্টারমশাই, অসুখ অসুখই। আর যে অসুখের যে ঔষধ।

গল্প শুনতে শুনতে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছিল কুশাহুর। কাহিনী শেষে সেই পুরানো কথাতেই যখন ফিরে যেতে চাইল ইভা তখন বাধা দিয়ে কুশাহু বলে, আপনি আইভির কথাই বলুন। কেন সে কাউকে পছন্দ করতে পারল না, জয়ন্তকে নয়, অর্ধেন্দুকে নয়, আমাকেও নয়।

সেই কথাই তো বলছি। আপনার রোগের উৎপত্তিস্থল কোথায় তা আমি জানি না—কিন্তু আইভির কথা জানি। আপনি জানেন, আমার মা তিল তিল করে আত্মহত্যা করেছিলেন। হ্যাঁ, আত্মহত্যা। গলায় দড়ি না দিয়ে, গলায় বাঁপ না দিয়েও মেয়েরা আত্মহত্যা করে, আর তার প্রমাণ আমার মা। সে দুর্ঘটনা প্রচণ্ড আঘাত করেছিল কিশোরী আইভির মনে। সে প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হল। বাবার যে উচ্ছৃঙ্খলতা মায়ের বুকে মৃত্যুশেল হেনেছিল, সেই শেলই আইভি চাইল দ্বিগুণ জোরে হানতে বাপের বুকে। মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্তে সে নিজের অগোচরেই শুরু করল উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে। কথায়-বার্তায়, চলনে-বলনে ও হয়ে উঠল একবিংশশতাব্দীর মেয়ে। সতীত্ব ওর কাছে একটা, কি যেন কথাটা—হ্যাঁ, ‘টারু’। নরনারীর সম্পর্ক একটা সাময়িক বিলাস। তার তর্ক শুনে, তার খিয়োরী শুনে মাহুশে তাকে ঘৃণা করতে বাধ্য হয়, ও সেটা রেলিশ করে। আরও খুশী হয় কেউ যদি সে কথা গিয়ে বলে দেয় বাপিকে। বাপিকে আঘাত করবার জন্তেই যে সে বুঁকে পড়েছে এদিকে। অথচ কী বিচিত্র এ দুনিয়া মাস্টারমশাই, মুখে ঋণিকবাদিনী হলেও মনে মনে ও ভীষণ পিউরিটান! তার জীবনের আদর্শ হচ্ছেন আমার মা। সেকথা সেও জানে না, জানি আমি। সেকথা যদি আমি ওকে বলি ও হেসে গড়িয়ে পড়ে বলবে, মিলি আইভিয়া। কিন্তু আর কেউ না চিনলেও আমি তাকে

ওতপ্রোতভাবে চিনেছিলাম। সে যদি মনে প্রাণে মায়ের মত পিউরিটান না হত তাহলে কখনই ওর অবচেতন মনে মায়ের মৃত্যুটা এতবড় আঘাত করত না, কিছুতেই প্রতিহিংসাপরাধতার উদগ্র নেশায় মাতাল হয়ে বিকৃত করে তুলত না নিজের জীবন। সে রাত্রে ছবি আঁকার জগ্রে সিটিং দেওয়ার আগে আপনি যে দুটি মর্ত আরোপ করেছিলেন, আমি জানি সে দুটিই ছিল বাহ্যিক—

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে কুশাফু বলে, কিন্তু কেন সে আমাদের সকলকে প্রত্যাখ্যান করল বারে বারে তা তো বললেন না—

তাইতো বললাম এতক্ষণ। আইভি এমন একজন পুরুষকে বিয়ে করতে চায় যাকে জামাতা বলে গ্রহণ করতে পারবে না বাপি। যাকে বিয়ে করায় রাগে-দুঃখে-অপমানে আমার বাবা ঘাড় ধরে বার করে দেবে আইভিকে রাস্তায়। শুনতে অদ্ভুত লাগছে, নয়? কিন্তু এ কথা সত্য, অসত্য সত্য! আমার ভয় হয় মাস্টারমশাই, এই বিকৃত মন নিয়ে সে না শেষ পর্যন্ত কোন গলিত-কুষ্ঠরোগীকে বিয়ে করে বসে।

শিউরে ওঠে কুশাফু।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে ইভার।

কুশাফু এবারও প্রসঙ্গটা পালটে নেয়। অন্য কথা পাড়ে। কেমন করে ইভার শ্বশুরের মৃত্যু হল—শ্রদ্ধাশাস্তির কথা, ইলুর একা পড়ে যাওয়ার কথা। অনেক আজীবাজে কথার পর ইভাব মনটা বোধ হয় হালকা হয়ে আসে। স্বাভাবিক চটুল কণ্ঠে সে বলে, আপনি বিয়ে করছেন কবে, বলুন। তখন আবার আসব বাংলাদেশে।

বিয়ে! পাত্রী কোথায়?

পাত্রীর অভাব কি? ভজ হলোও এটা রজভরা বঙ্গদেশ।

বঙ্গদেশ হলোই বা কি? আমি যাই বঙ্গে, তো কপাল যায় সঙ্গে। চালচুলোহীন এমন একটা বেকার ভবঘুরেকে বিয়ে করবে কে?

হেসে ইভা বলে, নিজের নিন্দা শুনতে এতই ভাল লাগে?

তার মানে?

তার মানে, এর জবাবে তো আমাকে বলতে হবে—আপনি যুনিভার্সিটির একজন অতি খারাপ ছেলে, সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করতে না পেরে আপনি নাইস হন, এম এতে কিছুতেই আপনার সেকেণ্ডক্রাস জুটবে না, তারপরে

কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় কিছুতেই ফেল করতে পারবেন না—বলতে হবে না-সাজলেও আপনাকে ধারাপ দেখায় না, আপনার—

থামিয়ে দিয়ে কুশানু বলে, আপনি স্নেহ করেন, তাই এ চোখে দেখেন—  
আর যিনি স্নেহের বদলে অন্য কিছু করেন, তিনি ?

কে ?

পাটনা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী স্বাহা মিত্র ?

কুশানু গম্ভীর হয়ে বলে, তাঁর সঙ্গেও সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে। দুখানা চিঠি লিখেও জবাব পাইনি, শেষে রেজিস্ট্রি চিঠি দিই, রিফিউস্‌ড হয়ে ফিরে এসেছে।

ইভা মুখ টিপে হাসে, ওমা, সে কি! ষাট, ষাট, আমাকে তাঁর ঠিকানাটা বলুন, আমিই না হয় সুপারিশ করে একখানা চিঠি দিই।

বেদনাহত কুশানু বলে, আপনি কি এভাবে অপমান করবেন বলেই আমাকে ডেকে এনেছেন ?

এবার সত্যিই লজ্জা পায় ইভা। বলে, ছি ছি! আপনি এতটা মর্মান্বিত হবেন বুঝতে পারিনি। আমারই ভুল, ওটা আপনার একটা বেদনার স্থান। আচ্ছা ও কথা আর বলব না। চা খাবেন তো এককাপ স্নানের আগে ?

কুশানুও মনটা হালকা করে বলে, খেতে পারি যদি আইভির মত বিনা চিনির চা সার্ত না করেন।

ইভা উঠছিল, বসে পড়ে বলে, তাহলে তো আমি নাচার। চায়ে চিনি মিশিয়ে সার্ত করা আধুনিক এটিকেট-বিরুদ্ধ।

কুশানু বলে, কিন্তু আপনি তো সে এটিকেট মানেন না—সে তো আপনার বোনের এটিকেট। আপনি তো চিনি মিশিয়েই চা সার্ত করেছেন এতকাল।

গালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে চোখ বড় বড় করে ইভা বলে, ওমা, কি মিথ্যুক আপনি! এমন এটিকেট-বিরুদ্ধ কাজ করতে পারি কখনও আমি। এমন করে আমার বদনাম করবেন না। সোসাইটিতে এ খবর রটে গেলে আমার মাথা কাটা যাবে না। আপনার চায়ে চিনি মেশাতে দেখেছেন কখনও ?

কুশানু বলে, তাহলে কবন্ধ হয়েই আপনাকে থাকতে হয়। চিনি মেশাতে না দেখলে কি হবে, খেয়েই বুঝেছি চিনি মেশান হয়েছে।



যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে ইভার, তাই বলুন। বাঁচালেন এতক্ষণে।  
গুটা আপনার তুল ধারণা; চিনি আমিও মেশাই না। আপনার মিষ্টি  
লাগে আমার হাতের গুণে।

বলেই উঠে পড়ে তড়িৎগতিতে। চটুল ভঙ্গি করে চলে যাওয়ার উপক্রম  
করে। কুশান্নর হঠাৎ কি যেন হয়—খপ করে ওর দোলায়িত আঁচলটা  
ধরে ফেলে বলে, একি, পালাচ্ছেন কোথায়?

ইভা খেমে পড়ে। তৎক্ষণাৎ কাপড়টা ছেড়ে দেয় কুশান্ন। ছি ছি!  
কী কেলেকারি! যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে আঁচলটা কাঁধের উপর ফেলে  
ইভা হেসেই বলে, বারে! চা করে আনি।

নতনেত্রেই কুশান্ন বলে, দাঁড়ান, আপনার জগ্রে দার্জিলিঙ থেকে একটা  
জিনিস এনেছি, দিই।

ইভা আবার বসে পড়ে, বলে, কী সৌভাগ্য! এতক্ষণ বলেননি—দিন দিন।

শান্তিনিকেতনী কাঁধব্যাগ হাতড়ে কুশান্ন বার করে একছড়া দার্জিলিঙ  
পাথরের মালা। দাঁড়ায় এসে ইভার সামনে। ইভা হাত পাতে না। গম্ভীর  
হয়ে বলে, স্মার্টকেশ নিতে হয় মাটিতে নামিয়ে, পান নিতে হয় হাতে-হাতে  
—কিন্তু মালা যে কি ভাবে নিতে হয় তা তো ছাত্রীকে শেখাননি  
মাস্টার মশাই।

সামনে হাত গুটিয়ে বসে ইভার দিকে তাকিয়ে দেখে কুশান্ন। ওর  
জোড়া জ্বর দু পাশে দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঠোঁটের কোণা দুটি  
নীচের দিকে একটু বেঁকে গেছে—মুখ টিপে হাসছে আর কি। কাছাকাছি  
বসায় ওর গা থেকে কেমন একটা প্রসাধনের মৃদু সৌরভ উঠছে। কুশান্নর  
স্নায়ুতন্ত্রী উপর সে গন্ধ যেন আবেশ-বিহ্বল একটা স্পর্শ বুলিয়ে গেল।  
পায়ের পাতা থেকে একটা সিরসিরানি উঠতে শুরু করেছে মেরুদণ্ড বেয়ে।  
এ অল্পভূতি ওর চেনা। এখনই একটা কিছু করতে হবে। তাড়াতাড়ি  
পায়ের বুড়ো আঙুলটা বাঁকিয়ে সমস্ত শরীরের চাপ দিল সে ঐ একটা  
আঙুলে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে সস্থিত ফিরে পায়। না, দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি  
তার। বেঁচে গেছে; আসন্ন আক্রমণের হাত থেকে অক্ষত ফিরে আসতে  
পেরেছে। বেদননীর পায়ের আঙুলটা কিছুই না। তীব্র একটা মর্মভেদী  
আর্তনাদ কোনক্রমে গলাধঃকরণ করে বসে পড়ে সোফার উপর।

ইভা কি বুঝল কে জানে। শব্দ না হলেও যন্ত্রণার একটা আভাস

নিশ্চয় পড়েছিল ওর মুখের কুঞ্চিত মাংসপেশীতে। কিছু একটা আন্দাজ নিশ্চয় করেছে ইভা। তাই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়, চা করে আনি, বসুন।

ইভা চলে যায়। মালাটা ধরাই থাকে কুশানুর হাতে।

আঙুলটা নীল হয়ে উঠেছে। রক্ত জমে যাচ্ছে বোধ হয়। আস্তে আস্তে বুড়ো আঙুলটায় হাত বুলাতে থাকে। তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও কুশানু খুলী হয়ে উঠেছে ভিতরে ভিতরে। রোগেব অবস্থা নিরাময় হয়নি, কিন্তু একটা টেম্পরারি রিলিফের সন্ধান সে পেয়েছে দৈবাৎ। দৃষ্টিবিলম্বকে সাময়িকভাবে ঠেকিয়ে রাখবার মত একটা কৌশল সে আয়ত্ত করেছে এতদিনে।

প্রায় দশ মিনিট পবে ঘরে এল—না ইভা নয়, বাড়ির একজন ঝি। ওর সামনে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে একগ্লাস ঘোলের সরবৎ। বরফ দেওয়া। চায়ের বদলে সরবৎ কেন এল তা বোঝা গেল না। তাড়াতাড়ি ভাসমান বরফের একটা বড টুকরো নিয়ে ঘষতে থাকে পায়ের বুড়ো আঙুলটায়। অনেকক্ষণ পরে ইভা যখন ফিরে এল তখন পায়ের ব্যথাটা অনেকটা সেরে গেছে। কুশানু ভেবে রেখেছিল ইভা এলেই ও বলবে—চা-টা বেশ ভালোই তৈরী করেছিলেন, কিংবা এই জাতীয় কিছু।

কিন্তু মাঝের গা-তাল্লা লাগান দরজাটা খুলে ইভা যখন এসে দাঁড়াল তখন সে কথা বলতে ভুলে গেল কুশানু। অত্যন্ত কঠিন একটা কথা এল ওর মুখে—কিন্তু সে কথাটাকেও গলাধঃকরণ করতে হল। ইভার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে—সে সম্পূর্ণ সচেতন নিজের অপরাধের গুরুত্ব বিষয়ে। তাই কোন কথা বলার আগেই কুশানুর নীরব তিরস্কারে মাথা নত করে দাঁড়ায় দরজার পাশেই। দৃষ্টি নত হয়ে পড়ে, মাথাটা আর তুলতে পারে না।

ইতিমধ্যে ইভা স্নান সেবে এসেছে। ভিজ়ে চুল বাঁধেনি। আইভির মত ছোট করে ছাঁটা নয় ওর চুল—ঘন-কালো গোছ গোছ চুল লুটিয়ে পড়েছে পিঠের উপর। সে জন্তে নয়—কুশানু মর্মান্বিত হয়েছিল অল্প একটা কারণে। স্নানান্তে ইভা বেশ পরিবর্তন করেছে। ও পরেছে হাল্কা টাঙ্গারঙের সেই শাড়িখানাই, ডীপকাট সেই লালরঙের জ্যাকেট আর সেই লকেট হার। ভুলে নিশ্চয়ই যায়নি সে—এত সহজে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে এ আচরণের অর্থ কি? ইভা তো আইভি নয়! প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল কুশানু মনে মনে। অনেক উঁচু একটা সন্মানের মঞ্চ থেকে মনে মনে

ইভাকে নামিয়ে আনল। সম্মানের অঙ্কার যে নৈবেদ্য সজ্জিত ছিল কুশান্নর অন্তরে এই মহিমময়ী নারীর উদ্দেশ্যে, মুহূর্তে যেন খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ল সেই নৈবেদ্যর থালাখানা। এত ছোট ইভা? এমন করে সে প্রলুব্ধ করতে চায় কুশান্নকে! সমস্ত কথা জানার পর। আজ বাদে কাল যে স্বামীর ঘর করতে যাবে তার পক্ষে এ আচরণ শুধু প্রগল্ভ নয়, আরও কদর্য কোন শব্দে তার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

মনে মনে শক্ত হয় কুশান্ন। না, কোন ভ্রান্ত পদক্ষেপ করবে না সে। ইভার কোন চটুলতায় আর সাড়া দেবে না। ওর পোশাক নিয়েও কোন কথা সে বলবে না। যেন সে লক্ষ্যই করেনি এ ইঙ্গিত।

হঠাৎ খেয়াল হল কুশান্নর প্রায় দু তিন মিনিট কেটে গেছে ইভা ঘরে আসার পর। ওরা দুজনেই নীরব রয়েছে। ইভা যেন প্রত্যাশা করে আছে কুশান্ন কিছু বলবে। যা বলার কথা, তা না বলে কুশান্ন স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললে, এবার তাহলে আমিও স্নানটা সেবে নিই।

এত জোরে স্বস্তির নিঃশ্বাসটা পড়ল ইভার যে এতদূর থেকেও তা স্পষ্ট শুনতে পেল কুশান্ন বললে, হ্যাঁ, আসুন, রান্না হয়ে গেছে।

আবার আগের মতই একটা ফুলকাটা আসনে তাকে খেতে দেওয়া হল। একসার বাটি-ঘেরা থালায় দেওয়া হল অন্ন। পাচকই পরিবেশন করল, সামনে বসে খাওয়াল ইভা।

আহাবাস্তে কুশান্ন বললে, এবার আপনি বরং খেয়ে আসুন।

ইভা বলে, না, ভাত খাবনা আজ আমি।

ভাত খাবেন না? কেন, শরীর খারাপ?

না, শরীর ভালই আছে। আজ আমার উপোস। একটা ব্রত আছে।

কুশান্ন বলে, বলেন কি। আপনি এসব ব্রত উপোস মানেন?

কেন, আমি কি খৃষ্টান?

না, তা নয়। তবে আপনাদের সমাজেও এসব আছে?

ইভা হেসে বলে, আমাদের সমাজ বলতে আপনি কি বোঝেন জানি না। আমার দাদামশায়ের হৈসেলে মাছ মাংস তো দূরের কথা ডিম পেঁয়াজ পর্যন্ত আসে না। আমার মা মাসের মধ্যে তিন চারটে উপোস করতেন।

বাধা দিয়ে কুশান্ন বলে, আশ্চর্য তো! আমি তো ভাবতেই পারিনি আপনাদের দেখে।

ইভা বলে, সব সংসারেই এমনি। একদল উগ্র আধুনিক, অন্য একদল উগ্র কনজারভেটিভ।

আজ আপনার উপোস আছে জানলে আমি আসতামই না। গত কাল আসতাম।

হয়তো এসে দেখতেন গতকালই আমার উপোসের তারিখ পড়েছে।

হেঁয়ালিটা বোঝা যায় না। বলে, যাক, এখন তা হলে ওঘরে একটু বিছানাটা পেতে দিন—একটু গড়িয়ে নিই সেদিনকার মত। এমন পরিপূর্ণ আহারের পর একটা মোরসী ঘুম না দিলে—

থামিয়ে দিয়ে ইভা বলে, কিন্তু আজ আর সেটি হচ্ছে না। আমাকে কাল যেতে হবে—আমি এখন গোছগাছ করব ও ঘরে। আজ একটু সকাল করেই যেতে হবে আপনাকে—কি, কিছু মনে করলেন না তো?

না না, সে কি! সত্যিই ও কথাটা আমার খেয়াল ছিল না। এত দূরের দেশে যাবেন, গ্রাচারালি আপনাকে গুছিয়ে নিতে হবে। আচ্ছা আমি তা হলে উঠি এবার।

তা বলে এখনই যেতে হবে না। একটু বসুন, আমি দেখে আসি বি চাকরেরা সব খেতে বসেছে। আপনি ততক্ষণ এই ছবির বইগুলো দেখুন বরং।

ইভা চলে যায়। ছবির বইতে কিন্তু মন বসে না কুশানুর। সে বসে বসে ভাবতে থাকে ইভার কথাই। অদ্ভুত মেয়ে তো। কাল সে চলে যাবে। জীবনে হয়তো আর দেখাই হবে না। ঘটনাচক্রে ইভার খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল সে, কিন্তু আজ বুঝতে পারে তাকে চিনতে পারেনি একতিলও। আইভি যখন সব কথা লিখেছে তখন ইভা নিশ্চয় জানে তাকে ভালোবাসে কুশানুর। তবু ভেঙে পড়েনি ইভা। চৌধুরীবাড়ির বধূটি নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই আতিথ্যধর্ম পালন করেছে। সে ওর মায়ের মত—দাদামশায়ের মত। লরেটো-লালিত মেয়েটি প্রণাম করে নত হয়ে, ব্রত উপবাস করে, দাসী-চাকরদের খাওয়ার সময় উপস্থিত থাকে। অথচ এটাই ইভার একমাত্র পরিচয় নয়—এর পেছনে আরও কিছু আছে। তা না থাকলে কোন লজ্জায় সে পরে আসে ঐ শাড়ি-ব্লাউস-মালা? কেমন করে ইঙ্গিত করে মালাটা গলার পরিয়ে দিতে! কোন ইভা সত্য? কী চায় সে সত্যি সত্যি কুশানুর কাছে?

একে একে অনেক দিনের কথা মনে পড়ে। বারে বারে ওকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে ইভা। একটি বেদনাদায়ক সন্ধ্যার ইতিহাসকে স্মৃতি থেকে



বলেছিল সে, একটি সুন্দর প্রভাতের গায়ে মুহূর্তের কালিয়াচিহ্ন মুছে নিতে চেয়েছিল আঁচল দিয়ে। সে যখন বলেছিল পাঞ্জাবির নীচেও একটা দাগ লেগেছে তখন কোথায় ছিল আজকের এই গলায় লকেট-দোলান প্রগল্ভ ইভা? লজ্জায় সরমে সে কেন মরমে মরে গিয়েছিল সেদিন? মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই একটিমাত্র ক্ষণিক বিশ্বলতায় নিঃশেষিত হয়ে গেল ওদের নাম ধরে ডাকার ইতিহাস। ওরা দুজনেই দুজনকে ভালোবাসে। শুধু তাই নয়, ওরা দুজনেই জানে অপরের ভালোবাসা তারা পেয়েছে; অথচ কেউ কারও কাছে সে কথা স্বীকার করল না। ইভা কি চায় কুশান্ন মুখ ফুটে কিছু বলুক? তাই কি স্নানের পরে এ সাজে সেজেছে সে? কিন্তু কুশান্নর প্রেমে তো জৈবিক প্রবৃত্তির কোন খাদ নেই। ইভার মধ্যে সে দেখেছে নারীর মহিমময়ী মূর্তি—ওর প্রাণপদেব উপর সেই-ই এনেছে সূর্যের প্রথম আলোর ছোঁয়া—ওর প্রেমের শতদল পাপড়ি মেলেছে সে স্পর্শে। ইভাকে সে নিঃসন্দেহে ভালোবাসে কিন্তু সে ভালোবাসা, যাকে বলে, প্লেটনিক; সে প্রেম একেবারে নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তার।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? নরনারীর ভালোবাসা কখনও ইন্দ্రిয়াতীত হতে পারে? তাই যদি হবে তাহলে বানের মুখে তরঙ্গশীর্ষে উঠে যখন সে ইভাকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করেছিল তখন ওদের সারা দেহ থরথর করে কেঁপে উঠেছিল কেন? সে কি শুধুই মৃত্যুভয়ে? একটি ভীত আর্ত নারীর দেহ মন প্রাণের ক্ষণিক আত্মসমর্পণ কেন ওর প্রতি বোমকুপে তুলেছিল পরম আনন্দের শিহরণ? দেহাতীত প্রেম কি সম্ভব?

বেলা বিপ্রহর অতিক্রান্ত প্রায়। প্রায় একঘণ্টা পরে ইভা ফিরে এল। মধ্যাহ্নের শুদ্ধতায় শুধু শোনা যায় পায়রার ক্লাস্ত কুজন। ইভা ফিরে এল; ওর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে কেন এত দেবী হল তার ফিরে আসতে। চোখ দুটো লাল, মুখটা থমথম করছে। কপালের উপর কয়েকগুচ্ছ চুলে জলের স্নান লীকর। স্নানের পরে যে টিপটা পরেছিল সেটা নেই। কেঁদেছে। এতক্ষণ নির্জনে কোথাও কেঁদে মনটা হালকা করেছে। কান্নাটাকেই ধুয়ে আসতে চেয়েছিল। সেই সঙ্গে ধুয়ে গেছে টিপটাও। সাজটা পালটায়নি কিন্তু।

অনেক দেবী করলেও নিজেকে যথেষ্ট সামলাতে পারেনি এখনও। চেহারায় রোদনের চিহ্নটা যে নিঃশেষে ধুয়ে মুছে যায়নি এটা সে জানে; আর

জানে বলেই বোধ হয় চোখে চোখে তাকাতে পারছে না। হয়তো অশ্রুর উৎস একেবারে নিঃশেষিত হয়নি তার।

প্লেটনিক-লভের ধ্বজাধারী কুশানুর মনে জাগল একটা ছরস্বাসনা। যাবার আগে সেই সেদিনের মত দৃঢ় আলিঙ্গনে আর একটি মুহূর্তের জন্ত বেঁধে ফেলতে চাইল তাকে—ওর রোদন-খিন্ন স্মৃতিধরে এঁকে দিতে ইচ্ছে হল একটি বিদায়-চিহ্ন। কিন্তু সে সব কিছুই করল না। বলল, এবার আমি চলি, কেমন?

নতনেত্রেই ইভা বলে, আর একটু বসে যান, রোদটা পড়ুক।

কিন্তু আপনার তো বিশ্রামের প্রয়োজন। ওবেলা বাঁধাছাঁদা আছে।

ই্যা, আমি এবার ও ঘরে শুতে যাব। একটু উঠে দাঁড়ান, প্রণাম করব।

কুশানু বলে, এই যে বললেন একটু বসে যেতে, তাহলে প্রণামটা এখনই সেরে রাখছেন কেন?

আমি ওঘরে বিশ্রাম করতে যাব। আর আসব না এঘরে। খানিকটা বিশ্রাম করে আপনি চলে যাবেন। তাই প্রণামটা এখনই সেরে রাখছি।

কুশানু উঠে দাঁড়ায়। ওর পদপ্রান্তে ইভা নামিয়ে রাখে আবার একটি বিলম্বিত প্রণাম। আর তাকায় না ওর দিকে। কুশানু হাতটা পকেটে ঢুকিয়েছিল, মালাটা বার করতে। বুঝতে পেরেছে এই ওদের শেষ সাক্ষাৎ। মালাটা ওর হাতে দিত, না গলায় পরিয়ে দিত তা ঠিক জানে না—কিন্তু সে স্মরণে এবারও পেল না কুশানু। ইভা তার আগেই টেবিলের উপর রাখে একটা বন্ধ খাম, বলে, যাবার আগে এই চিঠিখানা পড়ে যাবেন।

উত্তর দেবার সময় দেয় না। দ্রুতপদে একরকম ছুটেই চলে যায় পাশের ঘরে। কুশানু গিয়ে করাঘাত করে মাঝের গা-তাল লাগানো রুদ্ধ দরজায়। বলে, তোমার মালাটা নিয়ে যাও ইভা।

ততক্ষণে ওদিক থেকে চাবি পড়ে গেছে দ্বারে। ইভা সাড়া দেয় না। একটা চাপা কান্নার আবছা গুমরানি ভেসে আসে শুধু। কুশানু ধীরে ধীরে ফিরে এসে বসে নিজের আসনে। অনেকটা সময় লাগে স্থির হতে। তাকিয়ে দেখে যেখানে প্রণাম করেছিল ইভা, সেখানে তখনও পড়ে আছে একবিন্দু জল। শান্তিনিকেতনী কাঁধব্যাগটা নেয় আলনা থেকে। চিঠিখানাও তুলে নেয়। কুশানু জানে ওতে কি লেখা আছে। ওতে ইভা বলেছে সেই কথাটি, যেটি মুখে বলতে তার সরমে বেধেছে। ইভা যাবার আগে স্বীকৃতি

দিয়ে গেছে তার প্রেমকে ; কিন্তু দিয়েছে একেবারে শেষ মুহূর্তে—যখন আর কোন প্রতিদান দেবার সুযোগ কুশাল্য পাবে না। কিন্তু ইভা বলেছিল যাবার আগে চিঠিখানা পড়ে যেতে। তাই তখনই খামটা খুলে পড়তে থাকে। কোন সম্বোধন নেই পত্রে—দীর্ঘ পত্রে !

‘অবশেষে মনস্থির করলাম।

আমি জানতাম যে তুমি জানতে, যেমন তুমিও জানো যে আমি জানি। এই ভাল হল। জানাজানি হলে হয়তো এমন সুন্দরভাবে বিদায় নিতে পারতাম না। বিদায় দিতে পারতে না তুমি। নতুন করে ঘর বাঁধবার আগে মন বাঁধতে হবে আমাকে। মনের সে বনিয়াদে বিরাট একটা ফাটল থেকে যেত আজ যদি ধরা দিতাম তোমার কাছে। তোমার তরফেও সেই একই কথা। তোমার জন্তে উৎকণ্ঠ হয়ে যে প্রতীক্ষা করছে পাটনায় সেই তোমাকে ধন্য করবে নিঃসন্দেহে। আমার এ ভবিষ্যৎবাণী সুর্যোদয়ের মত সত্য।

পাঞ্জাবির নীচেকার রাঙা দাগটার জন্তে ভয় পেও না, ও দাগটাও ধুয়ে-মুছে শেষ হয়ে যাবে।

তোমাকে কেন নিমন্ত্রণ করেছিলাম জান ? জানতে যে রোগটা তোমার একেবারে সেরে গেছে কিনা। আইভি চিঠিতে অনেক কথাই লিখেছিল, কিন্তু একবারও লেখেনি যে তুমি তার দিকে বিহ্বলবিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলে কখনও। ভাবলাম, তবে কি গঙ্গার জোয়ারে ভেসে গেছে তোমার ব্যাধিটা! নিঃসংশয়ে সেটা জেনে যাবার জন্ত তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমার সেই অমোঘ অস্ত্র, সেই শাড়ি-ব্লাউস আর লকেট হারটা গুছিয়ে রেখেছিলাম হাতের কাছেই। সেগুলো পরবার অবশ্য প্রয়োজন হল না। দেখলাম তোমার রোগের আক্রমণ, দেখলাম পায়ের বুড়ো আঙুলটা হুমড়ে কেমন করে আত্মসংবরণ করলে তুমি। লজ্জার বরফ তো দূরের কথা, একগ্লাস ঠাণ্ডা জলও চাইতে পারলে না।

জানি, তুমি কি ভাবছ। তুমি ভাবছ, তাহলে সব জেনেও কেন এ নির্লজ্জের বেশ পরলাম স্নানের পরে। তাই না? বলব সে কথা। বিশ্বাস কর, যতটা নির্লজ্জ ভেবেছ তুমি আমাকে, ভাববে এ চিঠি শেষ করে সত্যিই অতটা নির্লজ্জ আমি নই। দাদামশায়ের গল্পটা তোমাকে শুনিয়োছ। আজীবন আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ মুরগীর জুস খেয়েছিলেন অমানবদনে। তাঁর

উপদেশ এখনও বাজছে আমার কানে—আতুরের নিয়ম নেই, যে রোগের যে চিকিৎসা।

জানি না কেন মতবিরোধ হয়েছে স্বাহার সঙ্গে তোমার। তবে আমি নিশ্চিত জানি এ লঘুক্রিয়া মাত্র। আমি স্বাহাকে দেখেছি, কথা বলেছি তার সঙ্গে। আমার মনে হয়েছে, সে তোমাকে জয় করে নেবেই। তার চরিত্রের মধ্যে অদ্ভুত একটা দৃঢ়তা লক্ষ্য করেছি অল্প সময়ের আলাপে। সামান্য কারণে মান অভিমান করবার মত মেয়ে তো সে নয়। আমার কি জানি কেন তাকে দেখে মনে হয়েছিল, সে হচ্ছে জোয়ান-অফ-আর্ক, রিজিয়াদের স্বগোত্র। সে বোধ হয় তোমার এ অদ্ভুত রোগের কথা জানে না, নয়? আমার মনে হয় তোমার কোন অসংবৃত মুহূর্তের বিহ্বল চাহনি দেখে সে একটা ভুল ধারণা নিয়ে দূরে সরে গেছে। ঠিক বলছি, তাই নয়? অথচ এই মনোবিকার নিয়ে তুমি সাহস পাচ্ছ না আবার তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। তোমার এতবড় অপমান আমি সহিতে পারছি না, পারব না। আমাদের অগ্নে রুচি নেই দেখে যেমন চিকেন ব্রথ খেতে রাজি হয়েছিলেন দাদামশাই, আমিও তেমনি মনস্থির করেছি।

তাই সেজেছিলাম নিলজ্জার মত। যাবার আগে তোমাকে দিয়ে যাব একমাত্রা ঔষধ—তোমার নিশ্চিত আরোগ্যের বিশল্যকরনী। হায়ার পোটেন্সির ঔষধ প্রয়োগ করার আগে সূচিকিৎসক অনেক সময় একমাত্রা নাক্সভমিকার বিধান দেন। আমার স্নানাস্তের পোশাক সেই একমাত্রা নাক্সভমিকাই।

আইভি ঠিকই বলেছিল। অবচেতন মন তোমার যে দৃশ্য দেখতে চায় চর্মচক্ষুকে সেই চিত্রখানি নিবেদন না করলে তোমার মুক্তি নেই!

শোন। ডেসিং-টেবিলটার বাঁ দিকের টানা ড্রয়ারে একটা চন্দন কাঠের ছোট বাক্স আছে। তার ভিতর আছে মাকের দরজার গা-তালার ডুপ্লিকেট চাবি। দরজাটা হৃদিক থেকেই খোলা যায়। এ দীর্ঘ চিঠি তোমার পড়া শেষ হওয়ার আগেই আমি এ ঘরে ঘুমিয়ে পড়ব। ঘুমব নিশ্চিত—কারণ ঘুমের কড়া ঔষধ খেয়েছি এইমাত্র; গাট ঘুমের মধ্যে আমি জানতেও পারব না তুমি কখন এলে আর কখন গেলে। বাহুল্য হলেও লিখছি, আগামী কাল আমার স্বামী আমাকে নিতে আসছেন—আমি দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে এতদিনে তাঁর কাছে যাবার ডাক শুনেছি; আশ্চর্যবশত



হরে আমার সে পথ বন্ধ করে দিও না যেন! ঘুমিয়ে পড়ব নিশ্চিত—তবু তোমার পদশব্দে যেন আমার ঘুম না ভেঙে যায়। কোন কথা বল না, ঘুমের মধ্যেও তোমার কণ্ঠস্বর সহ্য করতে পারব না আমি। তবু তুমি যে এসেছিলে তার একটা প্রমাণ রেখে যেও। মালাটা বরং রেখে যেও। না, গলায় পরাবার চেষ্টা কর না—তোমার স্পর্শ আমি সহিতে পারব না। মালাটা রেখে যেও আমার পাযের কাছে।

যাবার সময় যেখান থেকে নিলে চাবিটাকে সেখানেই রেখে যেও।

তোমার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না। আর চোখ তুলে তাকাতে পারব না কোনদিন তোমার দিকে। আমাকে তুমি চিঠিও লিখ না কখনও লক্ষীটি। তোমার রোগমুক্তির কথাও লিখে জানাবার দরকার নেই। সেটা অবশ্যস্বাবী, তোমার আরোগ্যের স্মৃতিচিহ্ন থাকবে আমার বুকে—ওই রঙিন পাথরের মালায়। এ চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেল, আর তুলে যেও কেমন করে তুমি স্তম্ভ মাহুষ হয়ে উঠেছিলে আবার।

বহ্নিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র পড়েছ তুমি? তাতে কিছুটা সংস্কৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি—যার বঙ্গানুবাদ দিতে পারেন নি সঙ্কোচে। কিন্তু ব্যাখ্যায় বলেছেন বৃন্দাবনের গোপনারীরা শ্রীকৃষ্ণকে দান করেছিল নারীজন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ—তাদের লাজবস্ত্র! তুমি কি সেই গোপবালাদের নির্লজ্জা বলবে কৃষ্ণাত্ম ?

আমার কথা যদি কখনও মনে পড়ে, আর যাই কেন না ভাব—নির্লজ্জা ভেব না আমায়, এই আমার অন্তিম অনুরোধ।’

\*

\*

\*

\*

পড়ন্ত বেলায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ইভা খাটের উপর। তাড়াতাড়ি পায়ের কাছে জড়োসড়ো হয়ে থাকা চাদরটা টেনে ঢাকে সারা গা। জানলাগুলো সব বন্ধ। জলছে নীল বাতিটা তখনও। দিনের বেলাতেই এ নির্জন ঘরে নেমে এসেছে রাত্রির মোহময় মদিরতা।

আশ্চর্য! এইভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি? অবাক হয়ে ভাবে ইভা। বালিশটা ভিজে গেছে। ঘুমের মধ্যে কঁাদছিল নাকি? অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে এতক্ষণ—স্বপ্ন, না আধো-তন্দ্রাচ্ছন্নের বাস্তব অভিজ্ঞতার আবছা কুয়াশা? যেন কে এসে দাঁড়িয়েছিল ওর পদপ্রান্তে; হঠাৎ যেন সে দর্শক আবিষ্কার করেছিল ইভাকে। ইভা স্মরুপ কি কুরুপ তা বিচার করেনি, সে

দেখেছিল ইভার নারীস্বরূপ—তার সত্যস্বরূপ। ঈশ্বরী পাটনি যে দৃষ্টিতে দেখেছিল সোনার সঁউতির উপরে দাঁড়ান ঈশ্বরীকে—তেমনি বিহ্বল ছিল সে দর্শকের দৃষ্টি। ঘুমের মধ্যেই সর্বাঙ্গকে অনুভব করেছিল সে দৃষ্টির স্পর্শ। এখনও মনে হলে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

উঠে বসে ইভা। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। তৈরি হয়ে নিতে সময় লাগে অল্প। তারপর জানলাটা খুলে দেয়। যেন এ ঘরের রুদ্ধ রহস্যকে দেখবার জন্য অপেক্ষা করছিল জানলার ধারে বিদায়ী সূর্যের শেষ কোতুহল, খুলে দিতেই ছুঁমুঁ করে ঢুকল এক ঝলক পডন্ত রোদ। হতাশ হয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

হঠাৎ পায়ের কাছে নজর পড়ে ইভার। কই, মালাটা তো নেই। অরিংপদে চলে আসে এ ঘরে। সেখানে কেউ নেই। একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবে। কেন রেখে গেল না কুশাহু তার উপহার ওর পদপ্রান্তে? ডেসিং টেবিলের ড্রযাবটা টেনে খোলে। চন্দন কাঠের বাক্সটার মধ্যে রয়েছে ডুপ্লিকেট চাবিটা। আর মালাছড়া, আর এক টুকরা কাগজ। তাতে লেখা, ‘পারলাম না। মাপ কর আমাদের। অমৃত দিতে চাইলে তুমি, কিন্তু অঞ্জলি পাততে পারলাম না নিজের দুর্বলতায়। তাই আরোগ্যকে পেলাম না কিন্তু নিয়ে গেলাম তোমার মহৎ প্রাণের উদাত্ত পরিচয়। তুমি মহীয়সী।’

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল ইভা। অশ্রুর উৎস তাহলে এখনও নিঃশেষ হয়নি তার।

কুশাহুর জীবনের প্রথম পঁচিশটা বছর আমরা এক নিঃশ্বাসে বাদ দিয়ে এসেছিলাম। কারণ কাহিনীর পক্ষে তা ছিল নিষ্প্রয়োজন। তেমনি এক নিঃশ্বাসে আমরা বাদ দিয়ে যাব পরের তিনটে বছরও।

এ তিনটি বছরে তার জীবনে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ছাত্রজীবন শেষ করে ইতিমধ্যেই সে নেমে পড়েছিল কর্মজীবনে—মাত্র তিনটি বছরেই চাকরিস্থলে পদোন্নতি হয়েছিল তার—সুনাম হয়েছিল কর্মক্ষেত্রে, আর তৃতীয় বছর শেষ হবার পূর্বেই কর্মজীবন ত্যাগ করে প্রবেশ করেছে অথও অবকাশের অবসরপ্রাপ্ত নৈকর্মে। সে সব বিবরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিকথা প্রয়োজন হতে পারে কুশাহুর জীবনীকারের, আমাদের তাতে প্রয়োজন নেই, কারণ

ওস জীবনের প্রথম অংশের মত এ তিনটি বছরও ছিল ত্রীভূমিকাবর্জিত। সিনেমার সেলুলয়েডে যেমন অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি বাদ দিয়ে দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়—আমরাও তেমনি তিনটি বছরকে বাদ দিয়ে ফিরে আসতে পারি আবার আমাদের কাহিনীতে। তিনটে বছর যে কেটে গেছে এটা মনে রাখবার জন্ত আমরা বলনা করতে পারি—একরাশ ক্যালেন্ডারের পাতা উড়ে গেল, অথবা একটা বকুলচারায় সুপার ইম্পোস হল একটা পরিণত গাছ, অথবা ওয়ার্নার ব্রাদার্সের গ্লোবটা পাক খেল বার তিনেক।

মোট কথা এবস্থিধ একটা ‘মণ্টাজ-এফেক্ট’ পাড়ি দিয়ে আমাদের কাহিনীর ক্যামেরা সোজা এসে ধরতে পারে হাজার রোড দিয়ে ছুটে-চলা একটা ট্যাক্সি-শিশুকে—লংসটে। ধাবমান ট্যাক্সি, পীচঢালা রাস্তা, দু-পাশে সারি সারি বাড়ি। আশুন মিডসটে,—ট্যাক্সিতে একটিমাত্র যাত্রী, আ-টুপি-হিল নিখুঁত সাহেবী পোশাক। কার্ট করে আশুন সেমি-ক্লোজআপে, ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রলোক নেমে এলেন একটা চামড়ার ফোলিও ব্যাগ হাতে—এই বইয়ের আগেকাব পাতা-উন্টে আসা আপনি তবু ঠুঁকে চিনতে পারছেন না। দোষ আপনার নয়, চরিত্রটিকে এসট্যাবলিস করলেও—তাকে চাক্ষুস দেখানো হয়নি। ক্যামেরা প্যান করে নিয়ে এসে পৌঁছে দিল ভদ্রলোককে ভবতারণ ঘোষালের বাড়িতে। ইনিই ডাক্তার অপরেশ মিত্র, মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার।

শুধু আগন্তুক নয়, গৃহস্থকে দেখলেও চেনা যায় না। অবসরপ্রাপ্ত ভবতারণ ঘোষাল মস্তদীক্ষা নিয়েছেন। জপতপ নিয়েই পড়ে আছেন তিনি। বড় মেয়ে দীর্ঘদিন প্রবাসী, মেজ মেয়েও বাপেব সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে চলে গেছে। সে নাকি আজকাল বোম্বেতে থাকে, অনেকগুলি ছবির কন্ট্রাক্ট পেয়েছে একসঙ্গে। আইভি চলে যাওয়ার পর থেকেই কেমন যেন বদলে যেতে থাকেন ভবতারণ। একটেনসান পেয়েছিলেন—নেননি। অর্ধেক পেনসেন কমুট করিয়ে তিন মেয়ের নামে গ্রাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনেছেন। ছোট মেয়েটিকে নিয়ে গেছে তার মাসীমা। সুতরাং একা মাহুষের সংসারে আধা পেনসনই যথেষ্ট। দুনিয়ার সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখেন না। নিজের ঘরেই সাধন ভজন নিয়ে পড়ে আছেন। মাঝে মাঝে গুরুতাই ছাড়া এ বাড়ির ফটকে কলিংবেল বাজায় না কেউ।

অপরেণবাবু নিজ পরিচয় দিয়ে বলেন, আপনার কাছে এসেছিলাম একটা বিশেষ প্রয়োজনে। আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী।

বৈষ্ণবসুলভ বিনয় প্রকাশ করে ভবতারণ বলেন, কিভাবে আপনার সাহায্য করতে পারি বলুন।

আমি আপনার কাছে এসেছি একটা সংবাদ সংগ্রহ করতে। কুশানু রায় বলে এক ভদ্রলোক আপনার মেয়েকে পড়াতেন, পরে তিনি আপনার অধীনে চাকরিও করেন। তাঁর বর্তমান ঠিকানাটা জানেন?

মাসতিনেক পূর্বে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনায়—

বাধা দিয়ে ডাক্তার মিত্র বলেন, জানি, সে দুর্ঘটনায় রাঘবন আর ইন্দ্রজিত নামে গুঁর দুজন সহকর্মী মারা যান। উনিই অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছেন এবং প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছেন। তাঁর চাকরি গেছে—

না, চাকরি যায়নি। তাঁকে এক বছরের বিনা মাইনেতে ছুটি দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসা করে যদি তিনি আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন তাহলে আবার চাকরিতে জয়েন করতে পারেন তিনি।

তাঁর আর্থিক কোন ক্ষতি হয়েছে কি?

না, বেচারির নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়েছে মাত্র। কোন রকম উত্তেজনা সহ করতে পারে না। বাড়ি থেকে বের হয় না—কোন কাজে সক্রিয় অংশ নিতে পারে না।

তাঁর বর্তমান ঠিকানাটা জানেন?

অস্তুত মাসখানেক আগে তিনি যে ঠিকানায় ছিলেন তা বলতে পারি। ইতিমধ্যে ঠিকানা বদলেছেন কিনা জানি না। মাসখানেক আগে তাঁর একটি চিঠি এসেছিল।

বেশ, সেই ঠিকানাটাই দিন।

ভবতারণবাবু বাক্স থেকে একটি চিঠি বার করে ঠিকানাটা দেখান।

ডাক্তার মিত্র যখন ঠিকানাটা টুকে নিচ্ছেন নোট বইতে তখন ঘোষাল সাহেব প্রশ্ন করে বসেন, আপনি কুশানুর খোঁজ করছেন কেন?—ডাক্তার মিত্র জবাব দেবার আগেই আবার তাঁকে ধামিয়ে দিয়ে বলেন, মাপ করবেন। হঠাৎ করে ফেলেছি প্রশ্নটা অভ্যাসের দোষে। জবাব দিতে হবে না আপনাকে।

অপরেণবাবু বলেন, না না, তাতে কি হয়েছে? এমন কিছু অসৌজন্য প্রকাশ পায়নি আপনার এ প্রশ্নে। বলছি—



কিন্তু ভবতারণ আবার বাধা দিয়ে বলেন, না থাক ! সংসারাত্মক মনে মনে ছেড়ে এসেছি আমি। এসব অবাস্তব আলোচনার মন বড় বিক্লিপ্ত হয়—সাধনার ব্যাঘাত হয়।

পুলিস অফিসার ভবতারণ ঘোষালের সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছিলেন অপরেশবারু—তাই তাঁর এ কথায় ভদ্রলোক যেন বেশ একটু অবাক হলেন। একটু আহতও হলেন যেন তাঁর নির্লিপ্ততায় ; বললেন, আপনার কন্যা আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে বলেছেন, সেটা উত্থাপন করাটাকে কি আপনি অবাস্তব আলোচনা মনে করবেন ?

হেসে ভবতারণবারু বলেন, আপনি আমার উপর রাগ করেছেন।

আজ্ঞে না, রাগ কবিনি ; আমাকে জেনে যেতে বলা হয়েছে আপনি কেমন আছেন।

অমায়িক উত্তর হল, শারীরিক সুস্থই আছি।

নমস্কার করে ডাঃ মিত্র উঠে পড়েন। তিনি অবাক হয়ে গেছেন রীতিমত। ভদ্রলোক কি সত্যই একেবারে নিম্পৃহ নিরাসক্ত হয়ে উঠেছেন। কোন কন্যা কোন সূত্রে তাঁকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে পাঠাল তা পর্যন্ত জানবার কৌতুহল নেই ?

ফেরার পথে কত কি ভাবছিলেন ডাক্তার মিত্র। ভবতারণ ঘোষাল স্বনামধন্য ব্যক্তি। যেসব দুর্ধর্ষ ক্রিমিনাল একদিন ধরা পড়েছিল ভবতারণের বিশ্লেষণ-জালে—তারা নিশ্চয়ই কঠিনতম অভিশাপ বর্ষণ করেছিল তাঁকে। তারা কি কখনও কল্পনা করতে পেরেছিল তাঁর এই পরিণতি ? তাঁর বাড়ি, গাড়ি, মেয়ে-জামাই বিষয় সম্পত্তি কিছুই নষ্ট হয়নি—তবু কিছুই ভোগে এল না তাঁর। স্বেচ্ছানির্বাসনে ঘরের মধ্যেই বানপ্রস্থ নিয়ে দিন গুনছেন ভবতারণ ঘোষাল।

সময় যেন কাটতে চায় না। ঘড়ির কাঁটা ছুটোর অবস্থা ওরই মত। অলস ছন্দে চলেছে টিকিয়ে টিকিয়ে নিতান্ত নিরুপায়ের মত। সেই কোন ভোরবেলায় এসে বসেছে ইজিচেয়ারটায়—ঘণ্টাকতক বসেই আছে। ঘড়ির কাঁটা ছুটো এখনও ন'টার ঘর পার হতে পারল না। অথচ এমন একদিন ছিল যখন পাঞ্জা দিয়েও কাঁটা ছুটোর নাগাল পাওয়া যেত না।

লাইব্রেরী থেকে যে গল্পের বইটা এনোছল কাল রাত্রেই শেষ হয়েছে সেটা।

খবরের কাগজ নেওয়া বন্ধ করেছে এ মাস থেকে\*। যতটা সম্ভব খরচপত্র কমিয়ে আনছে। সারাদিন চুপচাপ বসে থাকে জানলার ধারে। কোথাও আর কোন বন্ধন নেই কুশানুর। বই পড়ে, কী সব ছাইপাঁশ লেখে খাতায়, আর জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসে থাকে। এখনও মাঝে মাঝে আসে বন্ধুরা, সহকর্মীরা, সান্ত্বনা দেয়। কুশানু জানে এ সান্ত্বনার মধ্যে আর যাই থাক, সত্য নেই। সক্রিয় জীবনে আর সে ফিরে যেতে পারবে না। শরীরের কোনও অঙ্গ পঙ্গু হয়ে যায় নি কিন্তু মনটা ছুমড়ে মুচড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। চিকিৎসা তো যথেষ্ট হল, আর কেন? সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ অকর্গত্ত জীবন, ব্যাক্তের খাতায় নির্দিষ্ট পুঁজি। এই তিন বছরের উপার্জনের উদ্ভব। জমা আর পড়ছে না, পড়বে না—অথচ খরচের অঙ্ক পড়ছে খাতায়। যতদূর সম্ভব সঙ্কচিত করেছে দৈনিক ব্যয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হবে তা ও জানে না। এর চেয়ে হাসপাতাল থেকে না ফিরে এলেই বোধ হয় ভাল ছিল।

সেই কালরাত্রির বিভীষিকা ওকে মুক্তি দেয়নি। রাতের অন্ধকারে দুঃস্বপ্ন দেখে চীৎকার করে ওঠে আজও। ঘুম ভেঙে যায়, পায়চারি করে ঘরের মধ্যেই। আর ঘুমতে সাহস হয় না। ডাক্তার বলেছে ও ঘটনাটা ভুলে যেতে। কিন্তু ইচ্ছা করলে যেমন ভোলা জিনিস মনে করা যায় না তেমনি মনে যেটা অহরহ জেগে আছে তাকে ভোলাও যায় না।

একা একা বসে অনেক সময় পুরনো দিনের কথা ভাবে। স্মৃত্ত দাশ, সমর—এরা কে কোথায় আছে কে জানে। শুনেছিল আইভি বাপের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে নাকি চলে গেছে। সে বুঝি আজকাল বসেতে থাকে। একসঙ্গে অনেকগুলি ছবিতে কণ্ট্রাক্ট পেয়েছে। ইভার খবর আর পায়নি। অনুমান করা যায়, সে স্বামীর ঘব করছে ভালো ভাবেই। স্বাহার সঙ্গেও আর নূতন করে যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি। নিঃসন্দেহে ওকে মুক্তি দিয়ে গেছে স্বাহা। কুশানু এতদিনে নিজের ভুলটা বুঝতে শিখেছে। ঠিকই বলেছিল ইভা—পারলে স্বাহাই তাকে ধন্য করতে পারত। তাকে আরও খান তিনেক চিঠি লিখেছিল। জবাব পায়নি। শরীরে পাটনায় যেতে পারত কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের দিনে মিথ্যে পরিচয় দেওয়ার কি কৈফিয়ৎ দেবে ভেবে উঠতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত স্থির করেছিল তা সত্ত্বেও যাবে একবার পাঠনায়। সব দোষ স্বীকার করে বলবে, শাস্তি যা দাও মাথা পেতে নেব; কিন্তু শাস্তিও দাও

আমাকে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় সে সম্ভাবনাও আজ আর নেই। এখন কোন লজ্জায় সে গিয়ে দাঁড়াবে স্বাহার সামনে? যাবেই বা কি করে?

স্মার!

কে? মুখ তুলে দেখে জনাই এসেছে। ওর কন্বাইও হ্যাও। এটাকে এখনও ছাড়াতে পারেনি। জনাইয়ের পিছন পিছন এসেছে আধবয়সী সবুজ লুঙ্গি পরা একজন মুসলমান। জনাই বলে, আপনি একজন কাগজগুলোকে ডাকতে বলেছিলেন।

ও, এস তুমি।

তাক থেকে পুরানো খবরের কাগজগুলো নামিয়ে দিতে থাকে। একরাশ মাসিক আর সপ্তাহিক পত্রিকা। রিডার্স ডাইজেস্ট, ইলাস্ট্রেটেড উইকলি। পঞ্চানন ঘোষালের একসেট অপরাধ বিজ্ঞান, আর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বুলেটিং। কাগজগুলো অবশ্য বইগুলো নিল না। ফেরত দিল চিঠির বাগুিলটাও। এত ছোট কাগজে ঠোঙা বানানো চলবে না। ক্লশান্তুর দুঃখ হয়। এত ছোট লেটার প্যাডে কেন চিঠি লিখত স্বাহা। ফুলস্কাপ কাগজে লিখলে আরও সের দেড়েক ওজন হত নিশ্চয়। অর্থাৎ আরো পাঁচসিকে পয়সা বাড়ত ক্লশান্তুর। উপায় নেই।

পয়সা মিটিয়ে দিয়ে লোকটা চলে যায়।

এখন কি করবে ক্লশান্তুর? হাজার বার পড়া চিঠির বাগুিলটাই খুলে বসে আবার। গার্ড-ফাইলে স্বাহার চিঠি আর তার উত্তর তারিখ মিলিয়ে পরপর সাজানো। কতবার এগুলো পড়েছে তার ঠিকানা নেই। আজ আবার সবগুলো পড়তে থাকে গোড়া থেকে। এক্সিবিট নম্বর ওয়ান। মৃংলির বাচ্চা হওয়ার সংবাদ, রামাওতারের পাঠশালায় ভতি করবার জন্ম অন্তিমতি শিক্ষা। এর জবাবটা নেই ওর সফলনে। তখন নকল রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই এক্সিবিট নম্বর দুইও ফুলেশ্বরীর চিঠি...কলকাতা শহরকে ভয় পাই বলাতে অত ঠাট্টা কিসের?...নাগরি হরফের চিঠি পড়াতে কলকাতায় তোমার অসুবিধা হতে পারে মনে করেই বাংলা-জানা একজনের কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর সম্বন্ধে অত কোতূহল কেন? এই চিঠিখানার পর থেকেই বেড়ে গিয়েছিল কোতূহল দু পক্ষেরই। এখানাতেই স্বাহা লিখেছিল...কলকাতার মেসের মুখপোড়া বাবুদের কি ঘর দোর বলে কিছু নেই?

পাতা উলটে যায় কুশানু। তেতাল্লিশ নম্বর চিঠি। 'স্বাহা লিখছে...একটু রোমাঞ্চিক হয়ে গেল নয়? অনেকটা সেই 'গোড়ার গলদে'র বিনোদবিহারী-বাবুর মত।

আচ্ছা, 'গোড়ার গলদ' লিখেছিল কেন? 'শেষ রক্মা'ও তো লিখতে পারত! এটা কি স্বাহার মনের একটা প্রিমনিশান?

জনাই আবার এসে ওব হাতে তুলে দেয় একখানা আইভরি কাগজের ছোট্ট ভিজিটিং কার্ড। অবাক হয়ে যায় কুশানু—স্বাহার দাদা।

একটু পরেই ঘরে আসেন ভদ্রলোক। নিখুঁত সাহেবী পোশাক। দীর্ঘকায়, সবল বলিষ্ঠ মানুষ। স্বাহার মতই দৃঢ়চেতা মনে হয় তাঁকে প্রথম দর্শনেই।

আপনি আমাকে চিনতে পারবেন এটা আমি অনুমান কবেছিলাম কিন্তু কি প্রয়োজনে আজ আপনার কাছে এসেছি তা আপনার স্বপ্নেরও অগোচর।

সমস্ত কথা খুলে বলেন ডাক্তার অপরেশ মিত্র। কুশানু আর একবার মনে মনে বলে—বিচিত্র এ দুনিয়া।

আজ এক বৎসরের উপব ডাক্তার মিত্র দেশে ফিরে এসেছেন মনস্তত্ত্বের উপর বিশেষ ডিপ্লোমা নিয়ে। স্বাহাও পাশ করে বেরিয়েছে সেই বছর। কথা ছিল পাটনার সাবেক বাড়িতেই প্র্যাকটিসে বসবেন দুজন। যথারীতি সেই আয়োজনই হতে থাকে। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অপরেশবাবু বুঝতে পারেন, যে বোনটিকে ছেড়ে বছর পাঁচেক আগে তিনি বিদেশে চলে যান এ মেয়েটি সেই স্বাহা মিত্র নয়। ওর ভিতরে ইতিমধ্যে একটা ভূমিকম্পে সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। কোন কিছুতেই ওর মন নেই। সব সময়েই অশ্রুমনস্ক ভাব। কেমন একটা অদ্ভুত মেলাকোলিয়া যেন জগদল পাথরের মত চেপে বসেছে ওর মনের উপর। ক্রমশঃ তিনি বুঝতে পারেন যে মানসিক রোগের চিকিৎসাই যদি করতে হয় তাঁকে—তাহলে সর্বপ্রথম সেটা স্মৃক করতে হবে বোনকে দিয়েই। স্বাহা একেবারে নীরব হয়ে গেছে। অপরেশবাবুর মনে হয়েছিল কারও কাছে একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে স্বাহা। মনটা তার একটা নতুন অবলম্বন না পেলে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে না কোনদিন। তিনি খুলেই প্রশ্ন করলেন একদিন—তুই কি কাউকে ভালবাসিস?

স্বাহা হেসে বলেছিল—তাহলে সেটা কি তোমার কাছেও গোপন রাখতাম দাদা?



বোনের বিয়ে দিতে চাইলেন অপরেশবাবু। পাত্রের অভাব ছিল না। ভয় ছিল হয়তো স্বাহাই রাজি হবে না। সে কিন্তু কোন বাধা দিল না। বারবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন ডাক্তার মিত্র—এখনও ভেবে দেখ, তোর আপত্তি থাকলে এখনও ভেঙে দিতে পারি এ সম্বন্ধ।

এবারও হেসে স্বাহা জবাব দিয়েছিল—ভেঙে দেবার হলে আমিই দিতাম।

ওর অনুমতি নিয়েই বিয়েটা হয়ে গেল। বললেন অপরেশবাবু।

স্বাগুর মত বসে শুনল কুশানু। কত সহজে একটি মাত্র বাক্যে সংবাদটা পরিবেশন করলেন ডাক্তারবাবু। ও যেন একটা গল্প শুনছে—যে গল্পের নায়ক-নায়িকার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই!

কিন্তু বিয়ের পর থেকে ওর মেলাকোলিয়া ভাবটা যেন বেড়েই গেল। এ বিয়ে যে সুখের হয়নি তা বুঝলাম দু দিন পরেই। আমার ভগ্নিপতির প্রথমটা দোষ ছিল না—কিন্তু এক মাসের মধ্যেই সে বিরক্ত হয়ে উঠল। স্বাহা ফিরে এল আমার কাছে।

বাধা দিয়ে কুশানু বলে, কিন্তু এসব কথা আমাকে কেন শোনাতে এসেছেন, তা তো বুঝতে পারছি না।

একটু গাঢ়স্বরে ডাক্তার মিত্র বলেন, মিস্টার রায়, যে সব পারিবারিক গুপ্ত কথা সাধারণত লোকে গোপন করে—তাই শোনাচ্ছি আমি উপযাচক হয়ে। আমি পাগলের ডাক্তার, পাগল নই। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে কিছু।

কুশানু শান্ত হয়ে বলে, বেশ, বলুন।

অপরেশবাবু বলেন, আপনি জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন? জাতিস্মরে?

প্রশ্নটা অবাস্তর হলেও কুশানু এক কথায় জবাব দেয় না।

আমিও করতাম না। কিন্তু এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে আমাদের পরিবারে। বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই চৌধুরি, মানে আমার ভগ্নিপতি স্বাহাকে পৌঁছে দিয়ে গেল। বললে, স্বাহার নাকি মাথা খারাপ। সে মনে করে সে নাকি স্বাহা চৌধুরী নয়, সে চৌধুরীর স্ত্রীই নয়, এমন কি সে নাকি বিংশ শতাব্দীর মেয়েই নয়। তার ধারণা সে বুঝি কোন উজ্জয়িনী না অবন্তীর জনপদবধু। সব সময় নয়, কখনও কখনও ওর মনে এই ভাবটা জাগে। তারপর যখন সন্ধ্যা ফিরে পায় তখন একেবারে স্বাভাবিক হয়ে যায়। এ জাতীয় মনের অসুখের কথা জানা ছিল। নিজেই চিকিৎসা

হুক্ক করলাম। স্বাভাবিক অবস্থায় রোগিণীর মনেই থাকে না অসুখের আক্রমণের মধ্যে তার আচরণের কথা। তাই সে বিশ্বাসই করতে চাইত না যে সে অপ্রকৃতিস্থা। চৌধুরীর সঙ্গে ওর বনিবনাও হয়নি একেবারে, তাই ওর ধারণা চৌধুরী ওর নামে মিথ্যা অভিযোগ করে।

কুশানু বলে, তারপর ?

অপরেশবাবু কাহিনীর জাল বুনে যান। বোনকে তিনি জানাতে চান না যে সে অপ্রকৃতিস্থা। এ কথা রোগিণীর না জানাই মঙ্গল। কিন্তু বাড়ির দাসী-চাকর, পরিচিত লোকজন ওর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করে অবাক হয়ে যায়। সকলের মুখ চাপা দেওয়াও মুশকিল। একদিন স্বাহা এসে বললে, দাদা, তুমি লছমনিয়ার চিকিৎসা করো এবার। ও হতভাগী বলে মাঝ রাত্রে আমি নাকি সেতার বাজাই। ও নিজে কানে শুনেছে !

অপরেশবাবু প্রত্যহ মধ্যরাত্রে শোনে সেতারেব আওয়াজ, কিন্তু সে কথা বলেননি স্বাহাকে। এতদিনে উনি বুঝতে পারেন পরিচিত পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে না নিলে ওব চিকিৎসা করা যাবে না। দার্জিলিঙে একটা বাড়ি ভাড়া নিলেন উনি। সেখানেই আছেন আজ প্রায় মাসখানেক। ওকে স্টাডি করছেন নানাভাবে—এখনও রোগের উৎপত্তিস্থলটা ধরতে পারেননি। এই সময় একদিন স্বাহার অলক্ষিতে তিনি ওর বাক্স সন্ধান করেন। কুশানুর চিঠির বাঙালিটা উদ্ধার করেন। সেগুলি পড়ে ডাক্তার মিত্র বুঝতে পেরেছেন যে কুশানুব সাহচর্য ছাড়া স্বাহার রোগমুক্তি সম্ভব নয়।

সমস্ত কাহিনীটা শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে কুশানু। তারপর বলে, ডক্টর মিত্র, এমন একদিন ছিল যখন আমি নিজের গরজেই আপনার সন্ধান করতাম। . .

বাধা দিয়ে অপরেশবাবু বলেন, জানি, মিস্টার রায়। আমি আপনার সবগুলি চিঠি পড়েছি। বাই দ্য ওয়ে—আপনার সেই অসুখটা সেরে গেছে ?

একটু হেসে কুশানু বলে, সে অসুখ তো সারেইনি, বরং অন্য আর একটা মানসিক অসুখে ভুগছি আমি। কিছু দিন আগে একটা ভীষণ এ্যাকসিডেন্ট—

শুনেছি। রাদার কাগজে পড়েছি।

সেই দুর্ঘটনার পরে আমার একেবারে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে। প্রায়

প্রতি রাতেই দুঃস্বপ্ন দেখি। পায়চারি করে রাত কাটাই। ঘুমে চোখ ভরে আসে—অথচ নাইট-মেয়ারের ভয়ে ঘুমতে পারি না। দিনের বেলাতেও যখন পায়চারি করি—মনে হয় আমার পিছন পিছন কে যেন পায়চারি করছে। যেন মৃত্যু আমাকে অনুসরণ করে চলেছে প্রতিটি মুহূর্ত। মাঝে মাঝে সত্যিই পিছন ফিরে দেখি। মনে হয় কে যেন রয়েছে আমার পিছনে। যখনই বসি, দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসি, টুলে বসতে পারি না। নিজের পিছনকে আমার ভয়! কোন রকম উত্তেজনা সহ্য হয় না আমার। কোন যানবাহনে উঠতে পারি না, সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে পারি না। এ অবস্থায় আমি আপনার কী সাহায্য করতে পারি?

শেষ কথাটায় কান না দিয়ে অপরেণবাবু ওর রোগের সিমটম্‌গুলোই আরও বিস্তারিত শুনতে চান। কৃশানু একে একে জবাব দিতে থাকে। শেষে উনি বলেন, মিস্টার রায়, আপনার অসুখ সারবার নয়, এ কথাই বা ভাবছেন কেন? আপনি আমার সঙ্গে চলুন। স্বাহাকে আমি বলব যে আপনি আমার একজন পুরানো বন্ধু। চিকিৎসা করাতেই এসেছেন আপনি আমার কাছে। কথাটা নেহাৎ মিথ্যাও হবে না। আচ্ছা, স্বাহা আপনাকে তো চাক্ষুষ দেখেনি কখনও, নয়?

না, আমাকে দেখলে সে চিনতে পারবে না।

তাহলে আপনাকে একটা নতুন নাম নিতে হবে। নতুন করে আপনাকে তার সঙ্গে আলাপ করতে হবে, বন্ধুত্ব করতে হবে, ঘনিষ্ঠ হতে হবে। পরে সময় মত আপনাকে আত্মপ্রকাশ করতে হবে।

কৃশানু বলে, নতুন নাম নিতে হবে না, আমাকে দেখলে সে স্তব্ধ দাস বলে চিনবে।

অপরেণবাবু বলেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না তো?

কৃশানু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়। ওদের প্রথম সাক্ষাতের কথা বলে।

অপরেণবাবু খুসী হয়ে বলেন, এ তো সোনায় সোহাগা হল। পরিচয়ের প্রথম বাধাটা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কৃশানু রায়ের উপর ওর চেতন-মন একেবারে বিমুগ্ধ হয়ে আছে; অথচ অবচেতন মনে সে তাকেই চাইছে। স্তব্ধ কৃশানুর বন্ধু সেজে আপনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে পারবেন। দেখা যাক তার কি প্রতিক্রিয়া হয়।

কৃশানু অতটা খুলী হয়ে উঠতে পারে না কিন্তু; একটু চুপ করে থেকে

বলে, বেশ, ধরা যাক আমাকে সে স্ত্রুত দাস বলে গ্রহণ করল ; নতুন করে আলাপ হল, ঘনিষ্ঠতা হল—তারপর হয়তো স্বেচ্ছা মত আমি আমার সত্য পরিচয় দিলাম—তবু তার রোগমুক্তি আমাকে দিয়ে হবে কি করে ? সে বিবাহিত, আমার পক্ষে তো—

অপরেণবাবু বলেন, সে কথা ঠিক। কিন্তু কি জানেন, এসব ক্ষেত্রে রোগিণীকে মনটা হালকা করার স্বেচ্ছা দিতে হয়। টেনিসনের সেই ‘হোম দে ব্রট হার ওয়ারিয়ার ডেড’ কবিতাটা মনে আছে তো ? এটা কবি-কল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিক সত্য। স্বাহারও সেই অবস্থা। শী মাস্ট শুন অর আটার ক্রাই। কিন্তু স্বাহা আমার কাছে মন খুলতে পারছে না, কারণ এখানে রোগী-ডাক্তারের সম্পর্কের মধ্যে এসে যাচ্ছে ভাইবোনের সম্পর্ক। আমার মনে হয়, হয়তো আপনার কাছে সে মনটা হালকা করতে পারবে। আপনিই পারবেন তাব নিকঙ্ক কান্নার বাঁধটা ভাঙতে। জানি, আপনাকে অত্যন্ত বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলছি। কিন্তু আপনার প্রিয়বান্ধবীর জন্য এটুকু আপনি করবেন না ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৃশান্ত বলে, তাহলে প্রথম কথা, আপনি ওকে কলকাতায় নিয়ে আসুন। আমার পক্ষে তো আর দার্জিলিঙে যাওয়া সম্ভব নয়।

কেন নয় ? প্রশ্ন করেন ডাক্তারবাবু।

হেসে কৃশান্ত বলে, আপনি আমার অবস্থাটা ভুলে গেছেন। ট্রেনে ওঠা আমার পক্ষে অসম্ভব।

ট্রেনে উঠবেন না আপনি। প্লেনে যাবেন।

কৃশান্ত হো-হো করে হেসে ওঠে। অনেক—অনেকদিন পরে এমন প্রাণ-খোলা হাসি হাসল সে। বললে, শুনছেন, ট্রেনে মোটরেই চাপতে পারি না আমি, সি ডি দিয়ে ওঠানামা করতে হলে মাথা ঘোরে আমার—আমি যাব প্লেনে ?

অপরেণবাবু বলেন, সে দায়িত্ব আমার। আপনি মালপত্র গুছিয়ে রাখুন। আমি সীট বুক করে সময়মত আসব। আপনার মালপত্র বুকে নিয়ে আপনাকে এই ঘবেই ঘুম পাড়িয়ে দেব। ঘুম ভাঙলে দেখবেন আপনি দার্জিলিঙে পৌঁছে গেছেন।

কৃশান্ত বলে, যাহুমস্ত্রে নাকি ?

হ্যাঁ, বিজ্ঞান এ যাহুমস্ত্র শিখিয়েছে ডাক্তারদের।



দিন তিনেক হল কৃশানু এসেছে এখানে। ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট বাংলো-প্যাটার্ন-বাড়ি। ছবির মত দেখতে। পাথর-বাঁধানো একলা চলার সরু একটা পথ বাড়িটাকে ঘুরে উঠে গেছে ঢিলার চূড়ায়। পথের বাঁয়ে সবুজ কাঠের গেট দিয়ে না ঢুকলে আপনি পাকদণ্ডী বেয়ে উঠে যেতে পারেন আরও উপরে, একেবারে পাহাড়ের মাথায়। কৃশানু অবশ্য ঢিলার উপরে কোনদিন যায়নি, জানে না সেখানে কি আছে। বাড়ি থেকে ফুট-চল্লিশ নীচু দিয়ে একে বেকে চলে গেছে পীচমোড়া কাট রোড। ঢালু রাস্তা দিয়ে উপরে ওঠা বা নিচে নামার ক্ষমতা তার নেই। ফলে ত্রিশকুর মত কটা দিন সে বন্দীজীবন যাপন করছে বাড়ির লাগাও মরশুমী ফুলেভরা বাগানের চৌহদ্দিতে। বাগানে ঘুরে ঘুরে কৃশানু অনুভব করেছে এ বাড়িটার অদ্ভুত গঠনপদ্ধতি। পাহাড়ের ঢালে এমনভাবে বাড়িটা তৈরী করা যে নিচের দিক থেকে দেখলে মনে হয় বাড়িটা দ্বিতল অথচ পাহাড়ের উপর থেকে মনে হয় একতলা। চারখানি ঘর। দুকেই বড় একখানা হলঘর ড্রইং কাম ডাইনিং। তারই ডানহাতি ছোট একটা গেস্টরুমে থাকে কৃশানু। হলকামরার পিছনে দ্বিতলে যাবার কাঠের সিঁড়ি। দোতলায় পাশাপাশি দুটি ঘর। ভায়ের ও বোনের। সিঁড়ি ছাড়াও মাটি থেকে সোজা দ্বিতলের ঘরে যাওয়া যায়—এটাই বাড়িটির বৈশিষ্ট্য। দোতলার মেঝে উত্তর প্রান্তে পাহাড়ের ঢালে গিয়ে লেগেছে। সুতরাং উপর দিক থেকে সোজা দোতলায় যাওয়া যায়।

বাড়িতে তিনটি তো প্রাণী। পরিচয় হতে দেরী হয়নি, কিন্তু আলাপ হয়নি। সবাই আত্মকেন্দ্রিক আর সচেতন। স্বাহার স্বামীকে দেখেছে, পরিচয়ও হয়েছে; কিন্তু পরিচয়ের সূচনাতেই তিনি এড়িয়ে গিয়ে বললেন, পরে আলাপ হবে, আছেন তো কিছুদিন? তারপর তাকে উত্তর দেবার মত সৌজগতুকুও না দেখিয়ে ডাঃ মিত্রকে প্রশ্ন করেন স্বাহা আছে, না, বেরিয়েছে?

আছে বোধ হয়—ওপরে যাও না!

তখন সকাল সাড়ে সাতটা। বাইরের দিক থেকেই এসেছিলেন চৌধুরী সাহেব। হয়তো প্রাতঃভ্রমণ সেরে। ফিসিয়গনামি বিজ্ঞানটা যদি একেবারে গাঁজাখুরি না হয়, আর গোয়েন্দা কৃশানু রায় যদি সে বিজ্ঞানটা কিছুমাত্র আয়ত্ত্ব করে থাকে, তবে সে বলতে বাধ্য ভদ্রলোকের অতীত ইতিহাসটা একেবারে নিষ্কলুষ নয়। ডাক্তার মিত্র ইতিপূর্বেই বলেছিলেন স্ত্রী অপ্রকৃতিস্থ প্রমাণিত হবার পর নাকি ভদ্রলোক মাত্রাতিরিক্ত মত্তপান শুরু করেছেন

কিন্তু ওদের বিয়ে হয়েছে মাত্র কয়েক মাস। কুশানুর মনে হল ঠাঁর চোখের নিচে কালো হরফে খোদাই করা শিলালিপি বলতে চাইছে মস্তপানের ইতিহাসটা আরও অনেক পুরানো।

ডুইংকমেই বসেছিল ওরা। কুশানু বলে, মিস্টার চৌধুরী আমার পরিচয় কতটা জানেন?

যতটা স্বাহা জানে। আপনি সুরত দাস। আমার বন্ধু। মানসিক রোগে ভুগছেন। আমি বন্ধুরূপে কবতে আপনাকে এনেছি এ বাসায়।

আপনি এঁকে কতদিন ধরে চেনেন?

বিয়ের কিছুদিন আগে থেকে কেন, বলুন তো?

কুশানু একটু চুপ করে থেকে বলে অপবাধ বিজ্ঞান নিয়ে এককালে ডুবেছিলাম। এখানে যখন আপনাকে সাহায্য কবতে এসেছি তখন সব সম্ভাবনাই আমাকে ভেবে দেখতে হবে, রহস্যের কিনারা করতে।

ডাঃ মিত্র বলেন, কিন্তু আপনি তো কোন ডিটেকটিভ উপস্থাসেব নারক নন। অপবাধ বিজ্ঞান এখানে না ঘাঁটলেও চলবে। স্বাহা একটা মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে মাত্র।

কুশানুও হেসে বলে, আপনি মানসিক রোগের চিকিৎসক, তাই আপনি সেই চোখেই দেখছেন কেসটাকে। আমি গোয়েন্দা ছিলাম এককালে, তাই আমাকে গোয়েন্দার চোখে দেখতে হবে অনেক কিছুই।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ এমনও তো হতে পারে যে স্বাহা দেবী যে কথা বলছেন, তাই ঠিক। তিনি অপ্রকৃতিস্থা নন মোটেই। ঠাঁব স্বামী ঠাঁকে অপ্রকৃতিস্থা করে তুলছেন, পাগল প্রতিপন্ন কবতে চাইছেন।

জু কুঁচকে ওঠে ডাক্তার মিত্রের, বলেন, এতে তার লাভ? নিজের স্ত্রীকে পাগল প্রতিপন্ন করে কী সুবিধা হবে তার?

কুশানু প্রতিপ্রশ্ন কবে, ইনগ্রিড বার্গম্যান আব ওয়ান্টাব পীজনের গ্যামলাইট বলে সিনেমাটা দেখেছেন আপনি?

না, কেন?

দেখলে কেসটা বুঝিয়ে দিতে পারতাম।

অপবেশবাবু একটু চুপ করে থেকে বলেন, স্বাহার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

না; কিন্তু এখনি হবে। ঐ শুন্ন, ওরা দুজনে নেমে আসছে।

কাঠের সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। অপরেশবাবু বলেন, ওরা দুজনে নেমে আসছে তা কি করে বুঝলেন ?

হেসে কুশানু বলে, এসব আমাদের বুঝতে হয় ডাক্তার মিত্র। মানুষ যখন চতুষ্পদ হয় না, তখন ওরা দুজনেই আসছে।

জবাব দেওয়ার সময় হয় না। স্বাহাকে সঙ্গে করে নেবে আসেন মিস্টার চৌধুরী। প্রায় তিন বছর পরে স্বাহাকে আবার দেখল কুশানু। অনেক বদলে গেছে স্বাহা। রোগা হয়ে গেছে সে। চোখ দুটো যেন আরও গভীর বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। কারও দিকে সে তাকায় না। খোলা দরজার দিকে সমুখে তাকিয়ে সে চলে আসে। অপরেশবাবু হঠাৎ বলেন, বেকুচ্চিস নাকি ?

স্বাহা জবাব দেয় না। ওর স্বামী বলেন, হ্যাঁ, ঘুরে আসি একটু।

স্বাহার বাহুমূলে আকর্ষণ করেন তিনি। অপরেশবাবু কিন্তু ওদের অনায়াসে যেতে দেন না। চৌধুরীকে তিনি আগের প্রশ্নটা করেননি, তার জবাবটাও তাই কানে তোলেন না। স্বাহাকেই বলেন, তোর সঙ্গে আমার বন্ধুর আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি। আমার বোন স্বাহা চৌধুরী—আমার বন্ধু সুরত দাস।

নির্বিকারভাবে হাত দুটি তুলে নমস্কার করে স্বাহা। ভালো করে তাকায়না কুশানুর দিকে। কুশানুও উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেছিল, বলে, আপনাকে এর আগে কোথায় দেখেছি বলুন তো ?

এইবার পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে দেখে স্বাহা। একটু যেন চমকে ওঠে ; পরমুহূর্তেই আগের মত নির্বিকার হয়ে যায়। কুশানুই আবার বলে, আপনারও তাই মনে হচ্ছে না ? আগেও আমাকে কোথাও দেখেছেন বলে ?

জ্ঞ কুঁচকে স্বাহা স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলে, কই, না তো।

ডাক্তার মিত্র বলেন, তোমারই ভুল হচ্ছে সুরত। তুমি তোমার সেই হারিসন রোডের মেস ছেড়ে কোনদিন বের হওনি, আর স্বাহাও পাটনার বাইরে বড় একটা যায়নি কখনও। তোমাদের দেখা হবে কি করে ?

যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল কুশানুর। ও বলে ওঠে, মনে পড়েছে, আমাদের মেসেই এসেছিলেন আপনি একদিন। আমার এক বন্ধুর খোঁজে ; মনে পড়েছে ?

স্বাহা কিন্তু আর ওর দিকে তাকায় না, নতনেত্রেই বলে, আপনার ভুল হয়েছে ; আচ্ছা আসি, নমস্কার।

এবার সেই-ই আকর্ষণ করে চৌধুরীকে । যাবার জন্ত তাগিদ দেয় । এবার কিন্তু চৌধুরীরই যাবার গরজ নেই, বলে, বন্ধুর খোঁজ করতে ? হারিসন রোডের মেসে ? কে বন্ধু বলুন তো ?

নামটা উচ্চারণ করবার আগেই স্বাহা ধমকে ওঠে, তুমি যাবে, না আবোল-তাবোল বকবক করবে এখানে ?

চৌধুরী একটু সামলে নিয়ে বলে, না না, চল না ।

দুজনে বেরিয়ে যায় ওরা ।

ডাক্তার মিত্র বলেন, স্বাহা আপনাকে ঠিকই চিনতে পেরেছে ।

কুশানু বলে, ঠিক নয়, বেঠিক চিনতে পেরেছে বলুন । সূত্রত দাস বলেই চিনতে পেবেছে আমাকে ।

দুদিনেই হাঁপিয়ে ওঠে কুশানু । এ বাড়ির সকলেই গম্ভীর, সিরিয়াস, রহস্যময় । ডাক্তার মিত্র সর্বদাই চিন্তিত । চৌধুরী ওকে বোধ হয় সন্দেহের চোখে দেখছে । রীতিমত এডিয়ে চলছে সে । স্বাহা তো একেবারে শঙ্ক-বৃষ্টি অবলম্বন করেছে । চিনেও চিনতে পারছে না তাকে । আর আছে এক নেপালী দম্পতি—আউট হাউসে । স্বামী-স্ত্রী মিলে ঘরের কাজ করে তারা । তাদের ঠোটগুলোও যেন সেলাই করা ।

কুশানু বাড়ির বাইরেও যেতে পাবে না । বডজোর বাগানে গিয়ে বসে । তার চেয়ে দূরে যেতে হলে হয় পাকদণ্ডী বেয়ে পাহাড়ে উঠতে হয়, নাহলে নামতে হয় ক্যালকাটা রোডে । দুটোই সমান অসম্ভব । চেষ্টা করলে হয়তো উপরে ওঠা যায়—কিন্তু নামবে কি করে ? ঘরে বসে বসেই তাই লক্ষ্য করে সব কিছু । হিচককের রিয়াব উইণ্ডোর কথা মনে পড়ে যায় ।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা । অপরেশবাবু বৈকালিক ভ্রমণে বেবিয়ে গেলেন । ক্যালকাটা রোডের লাগাও গ্যারেজ । গাড়ি বের করে কোথায় বেরিয়ে গেলেন একাই । চৌধুরী বেরিয়েছেন অনেক আগে । বাড়িতে স্বাহা একা আছে । একটু পরে সেও বেরিয়ে এল । কুশানু বসেছিল বাইবেল ঘরেই । স্বাহা উপর থেকে নেমে আসতেই কুশানু দাঁড়িয়ে উঠে কি একটা কথা বলতে গেল । কি বলত জানে না, কিছু একটা কথা বলে আলাপটা শুরু করতে চেয়েছিল আর কি ; কিন্তু ওকে সে স্বেচ্ছা না দিয়েই বেরিয়ে গেল স্বাহা । বাগানে একটু দাঁড়ায়, ফুলগাছের চারাগুলোকে একটু দেখে তারপর ধীরপদে পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে উপরে উঠতে থাকে । একবার কুশানুর দিকে দেখেও



নিল মোড় ফেরার সময়। টিলার মাথায় গেল না। মাঝামাঝি পথে একটা চওড়া পাথরের উপর বসল, এদিকে পাশ ফিরে।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে কুশানুও বেরিয়ে আসে। স্বাহা নিশ্চয় তাকে চিনতে পেরেছে, কিন্তু স্বীকার করছে না কেন? তার ঐ পাশ ফিরে বসার ভাঙ্গটায়, ঐ আনমনে দাঁত দিয়ে ঘাসের ডগা ছেঁড়ার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন আমন্ত্রণ ছিল। স্বাহা তো অনায়াসে ওর দৃষ্টিপথের বাইরে গিয়েও বসতে পারত, তা সে গেল না কেন?

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে কুশানু। পাকদণ্ডীর কাছে এসে ইতস্তত করে একটু। উঠবে নাকি? উপরে তাকাতেই নজরে পড়ে স্বাহা ওকে লক্ষ্য করছে। চোখোচোখী হতেই একেবারে পিছন ফিরে বসে।

অগ্রমনস্কের মতই ধীরে ধীরে উঠে এল কুশানু—অমোঘ আকর্ষণে। পদশব্দে স্বাহা এ পাশে ফিরে তাকায়। একটু চমকে ওঠে, অথবা চমকে ওঠার ভান করে।

আপনাকে এমন চুপটি করে বসে থাকতে দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। একা একা সারাটা দিন কথা বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠি।

স্বাহা জবাব দেয় না। একটা ঘাসের ফুল তুলতে হঠাৎ সে ভারি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু গরজ বড় বালাই; কুশানু আবার বলে, সকালবেলা আমাকে চিনতে চাইলেন না কেন বলুন তো?

হঠাৎ মুখ তুলে স্বাহা বলে, মানে? আপনি কি বলতে চান আপনাকে চিনতে পেরেও অস্বীকার করেছি আমি?

ঠিক তাই।

অর্থাৎ আমি মিথ্যাবাদী? কেন এভাবে আমাকে অপমান করছেন?

মিথ্যাবাদী আমি আপনাকে বলিনি স্বাহা দেবী, কিন্তু সকালবেলা আপনি যে সত্য গোপন করেছিলেন তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। কিন্তু কেন?

কি কেন?

কেন চিনতে চাইলেন না আমাকে? আপনি আমাদের মেসে একদিন এসেছিলেন আমার এক বন্ধুর খোঁজে। আমাকে আপনি নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন, কিন্তু সেটা স্বীকার করছেন না কেন?

অনেকক্ষণ স্বাহা কোন জবাব দিল না।

কি হল? জবাব দিলেন না যে?

কি জবাব দেব ? আমি আপনাদের মেসে যাইনি কখনও ।

কুশানু বলে, রামনন্দনকে চেনেন আপনি ? রামনন্দন কাহার ?

কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে স্বাহা । কি একটা কথা বলতে চায়, বলে না । ঠোট দুটো বুঝি একটু কঁপে ওঠে । গাঢ়তর হয় নিঃশ্বাস ।

আপনি এখনও বলবেন আমাকে চিনতে পারেননি ? আমার বন্ধুর ফটোখানি নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেননি সেদিন ?

মুখ নীচু করে প্রায় ধমক দিয়ে ওঠে স্বাহা, কে আপনার বন্ধু ? আমি চিনি না তাকে ।

কুশানু বুঝতে পারে এ ধমকটা নিজেকেই দিয়েছে স্বাহা । তার সংবেদনশীল স্পর্শকাতর মনকেই ধমক দিয়েছে । প্রত্যেকটি শব্দ পরিষ্কার উচ্চারণ করে কুশানু বলে, আমার বন্ধুর নাম কুশানু রায় ।

বিদ্যুতবেগে উঠে দাঁড়ায় স্বাহা । কী যেন বলতে চায়—তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বসে পড়ে আবার । ওপাশ ফিরে বসে । নিচুস্বরে বলে, মাপ করবেন, আমাকে একটু একলা থাকতে দেবেন ।

দেব, কিন্তু আপনি বলুন আমার বন্ধুকেও কি চিনতে পারলেন না আপনি ?

স্বাহা ধীরে ধীরে এ পাশে ফেরে । কেমন যেন বেদনার্ত পাণ্ডুর দেখাচ্ছে তাকে । বলে, একদিন আমার কৌতুহল আপনি জোর করে থামিয়ে দিয়েছিলেন স্তব্রতবাবু । সেদিন আপনি অসুস্থ ছিলেন ; একা থাকতে চেয়েছিলেন । বিশ্বাস করুন, আমিও আজ তেমনি অসুস্থ । আমাকে মাপ করবেন ।

এর পরে আর কথা চলে না । কুশানু ফিরে যাবে বলে উঠে দাঁড়ায় । কিন্তু নামবে কি করে ? উঠবার সময় নিচের দিকে তাকাতে হয়নি । কিন্তু এখন ? মিনিট খানেক অপেক্ষা করে বেচারি বলতে বাধ্য হয়, আমি যে একা নামতে পারব না স্বাহা দেবী ।

স্বাহা কোন কথা বলে না । নীরবে কুশানুর হাতটা ধরে ঘর পযন্ত পৌঁছে দেয় । নীরবেই উঠে যায় দ্বিতলে নিজের ঘরে ।

রাত সাড়ে আটটায় সবাই একসঙ্গে ডিনার খায় । মিস্টার চৌধুরী অবশ্য প্রায়ই অল্পপস্থিত থাকেন । পরিপূর্ণ নৈশ আহারের পর কুশানু এসে শোয় তার ঘরের ইজিচেয়ারে । নীলরঙের শেড দেওয়া বাতিটা জ্বলে । ডাক্তার

মিত্র তখন রুদ্ধদ্বার কক্ষে এসে বসেন মনঃসমীক্ষণে। রাত নয়টাই দার্জিলিঙে মধ্যরাত্রি। চরাচর স্তব্ধ হয়ে যায়। ধূপদানীর নীলাভ ধূপের রেখা বিচিত্র আলপনা আঁকে বদ্ধঘরে। চিকিৎসা শুরু হয় তখন। বড় অদ্ভুত সে চিকিৎসাপদ্ধতি। ডাক্তার মিত্র ওর চোখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে ওকে ঘুম পাড়ান। অর্ধ অচেতন হয়ে পড়ে কুশানু। সম্মোহিত হয়ে পড়ে না কি? একের পর একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলে। কখনও কোন প্রশ্নই করেন না ডাক্তারবাবু। ওকে বলেন দেহটা সম্পূর্ণ শ্লথ করে দিতে। সব চিন্তা মন থেকে দূরে সরিয়ে নিতে। মনটাকে করতে বলেন নিদাগ প্লেটের মতই সাদা। তারপর সেই মনের প্লেটে আপনা থেকে যে সব কথা ফুটে উঠতে থাকে তা অকপটে বলে যেতে হয় কুশানুকে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুনে যান ডাক্তার মিত্র— নোট লিখে চলেন পাতার পরে পাতা।

দিনকতক এইভাবে সিটিং দেওয়ার পর আজ অপরেশবাবু একটা নতুন পদ্ধতিতে আলাপ শুরু করলেন। নীলবাতি জ্বলা ঘরে রোজকার মতই ধূপের ধোঁয়ার গন্ধ একটা মোহময় আবেষ্টনী সৃষ্টি করেছে। গুরুভোজনে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে কুশানু কন্ডলটা মুড়ি দিয়ে শুয়েছে আরাম-কেদারায়। অপরেশবাবু বলেন, আজকে একটু অণু ধবনের পরীক্ষা হবে। প্রতিদিনের মতই মনটাকে ভেকেন্ট করবার চেষ্টা করুন। তারপর আমি একটা কথা সাজেস্ট করব। সেই কথাটা শুনে আপনার মনে যে সব কথা উদয় হবে তা অকপটে আমাকে বলে যাবেন। বুঝলেন?

ঘাড় নেড়ে কুশানু জানায় সে বুঝেছে। চোখ বুজে সে চেষ্টা করতে থাকে মনটাকে ফাঁকা করতে। কোন একটি বিষয়ে মনকে একাগ্র করা যে কত কঠিন তা জানা ছিল কুশানুর—কিন্তু বিষয়হীন নিছক শূন্যের উপর মনকে একাগ্র করা যে সে তুলনায় কতটা কঠিনতর তা এতদিনে বুঝতে শিখেছে। অনেকক্ষণ পরে অপরেশবাবু বলেন, আমি আপনাকে কথাটা বলছি—বলুন কি মনে পড়ছে আপনার।—গয়া।

চোখ বুজেই কুশানু বলতে থাকে—গয়া স্টেশন, ফক্কনদী, শ্রীপাদপদ্ম, শ্রীচৈতন্যদেব, মোটরের হর্ন, গয়া পাটনা ব্রাঞ্চলাইন, ফুলওয়ারি গ্রাম;—আর কিছু মনে পড়ছে না।

অপরেশবাবু বলেন, বেশ, চোখ খুলুন এবার।

কুশানু এতক্ষণে তাকায়। অপরেশবাবু ওই কথাগুলির সূত্র ধরে অনেক-কিছু প্রশ্ন করেন। তারপর বলেন, আজকের মত এই থাক।

কুশানু বলে, কোথাও কিছু নেই, আপনি একেবারে আমার পিণ্ডানের ব্যবস্থা করলেন কেন? ‘গয়া’ বললেন কেন?

অপরেশবাবু বলেন, আপনি মশাই রোজ কত কি আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছেন—আমি তো কোনদিন প্রতিবাদ করিনি। আজ না হয় আমিই একটা বেতলা কথা বললাম।

আচ্ছা, মোটরের হর্নের কথা কেন বললাম আমি? গয়ার সঙ্গে তো মোটরের কোন ভাব-সাম্য নেই।

মোটরটা আপনার চিন্তারাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছে। ঠিক ওই সময় নিচেকার রাস্তায় হর্ন বাজিয়ে একটা গাড়ি যাচ্ছিল। সেটা আপনার কানে গেছে। তাতেই আপনার একাগ্রতা নষ্ট হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি গয়া ছেড়ে ব্রাহ্ম লাইনে রওনা হয়েছেন। হয়তো সেইজন্মেই যা খুঁজছিলাম তা পেলাম না।

অপরেশবাবু চলে গেলেন, কিন্তু ঘুম এল না কুশানুর। জেগে শুয়ে রইল সে। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ গয়ার কথা বললেন কেন ডাক্তারবাবু? গয়াতে সে কখনও নামেনি। গ্র্যাণ্ডকর্ড দিয়ে যাতায়াতে গয়া স্টেশনকে দেখেছে শুধু। ওর মনে হল—সবটাই বুজুকি। মনঃসমীক্ষণ না হাতী! গয়ার সঙ্গে তার কোন দিক থেকে কোন সম্পর্ক নেই।

দার্জিলিঙে আসার পব ওর ঘুমটা গাঢ়তর হয়েছে। মাত্র দুদিন দুঃস্বপ্ন দেখেছে। বাকি কদিন ঘুমিয়েছে ভালই। আজ কিন্তু তার ঘুম এল না। এলোমেলো চিন্তায় মনটা ঘুমের কথা ভুলে গেল। একটু তন্দ্রামত এসেছে—হঠাৎ একটা শব্দে ঘোরটা কেটে যায়। গুরুপক্ষের রাত। এদেশে চাঁদের কদর নেই। নিস্তরূ রাত্রে একা জেগে আছে বেচারী তারাভরা আকাশে। কাচের সারি দিয়ে কুশানু দেখতে পায় বাড়ি থেকে কে একজন বেরিয়ে যাচ্ছে গেট খুলে। চট করে ঘড়ির দিকে নজর পড়ে ওর। রাত এগারোটা। কে লোকটা? সর্বাঙ্গ একটা কালো ওভারকোটের ঢাকা। মাথায় শেখ আবদাল্লা মার্ক। গরম টুপি। এত রাত্রে কে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে? ডাক্তার মিত্রের তুলনায় লোকটা বেঁটে, বাহাদুরের তুলনায় লম্বা। তবে কি চৌধুরী? এত রাত্রে তার বাইরে যাবার কি কারণ থাকতে পারে?



ক্যালকাটা রোডে গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ হল। স্পষ্ট শুনতে পেল মোটরের হর্ন। ডাক্তার মিত্রের গাড়ির হর্ন। তারপর চরাচর আবার শুক্ন হয়ে আসে। কুশানুর ঘুম ছুটে গেছে একেবারে। ঘরময় পায়চারি করতে থাকে। চকিতে কান পেতে কি শোনে। হ্যাঁ, সেতারের আওয়াজ। ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছে। অলসভাবে কে যেন আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছে সেতারের তারে। আশাবরী? না কানাড়া? উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে। মধ্যরাত্রে দরবারী কানাড়ায় আলাপ করছে কে? ত্রিসীমানায় অণু কোন বাড়ি নেই। দোতলার ঘরে অবশ্য রেডিও থাকতে পারে—কিন্তু ভারতীয় স্টেশন এখন তো সব বন্ধ। তা ছাড়া—হ্যাঁ কান পেতে শুনল, সেতারের সঙ্গে তবলা বাজছে না। একাই কেউ বাজাচ্ছে সেতার। রেডিও নয়। দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। বাড়িটা ঘুমাচ্ছে। হলকামরার দেওয়াল-ঘড়িটা শুধু অতন্দ্র প্রহরা দিচ্ছে; সেতারের আওয়াজ আসছে দোতলা থেকে। কৌতূহল সন্মরণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে ক্রমে। সিঁড়ি দিয়ে চুপিসারে দ্বিতলে উঠে আসে। স্বাহার রুদ্ধঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে বাঁকা একটা আলোর রেখা। সেতার বাজছে স্বাহার ঘরেই। মধ্যরাত্রে একা ঘরে দরবারী কানাড়ায় আলাপ করছে স্বাহা। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে কুশানু। হাড় কাঁপানো শীত; কিন্তু ওর মনে হল শীতে নয় মীড়-গমকের মূর্ছনায় সেতারের তারের সঙ্গে ‘রেসনেন্স’ কাঁপছে ওর সারা দেহ! পাহাড়ের গায়ে জ্বলছে একসার স্থির জোনাকীর আলো। ওটা ঘুমের দেশের আলোকমালা। মাথার উপর জ্বলছে একমুঠো তারা। সবাই কাঁপছে শব্দ-তরঙ্গের কম্পনে!

সম্মিত ফিরে পেল সমের মাথায় হঠাৎ বাজনাটা থেমে যাওয়ায়। চকিতে আত্মস্থ হয় কুশানু। স্বাহার ঘরে খুটখাট শব্দ উঠছে। বোধ হয় সেতারটা তুলে রাখছে স্বাহা। হয়তো এখনই একবার বাইরে আসবে সে। দেখতে আসবে চৌধুরী ফিরল কিনা। দ্রুত লঘুপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে কুশানু।

এত রাতে গেলেন কোথায় চৌধুরী গাড়ি নিয়ে? কি প্রয়োজন হতে পারে? ঘরে ফিরে এসে অনেকক্ষণ নিবিড়ভাবে সে কথাই ভাবতে থাকে। রাত বাড়ছে। অথচ চৌধুরী ফিরে এল না। রাত দুটো পর্যন্ত দেখে ঘুমের চেষ্টা করতে থাকে। হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হল। দোতলা থেকে নামল কখন? নামল কেমন করে? এতক্ষণ তো এদিকটা মনেই পড়েনি।

পরদিন সকালে সব কথা খুলে বলতে গেল অপরেশবাবুকে—আর তখনই বুঝতে পারল কুশানু, কিছু একটা কথা তার কাছ থেকেও গোপন রাখছেন ডাক্তারবাবু। সমস্ত কাহিনীটা শুনে হেসে উঠছেন অপরেশবাবু;—বিশ্বাসই করতে চাইলেন না চৌধুরীর নৈশ অভিযানের কথা। মধ্যরাত্রে সেতারের শব্দটা অবশ্য এমন কিছু নতুন কথা নয়। কিন্তু গুঁর গাড়ি করে চৌধুরীর বেরিয়ে যাওয়ার কথায় বললেন, আপনি নিশ্চয় ভুল দেখেছেন মিস্টার রায়। আমার গাড়ির চাবি আর গ্যারেজের চাবি দুটোই আমার কাছে ছিল। দ্বিতীয়ত সকাল সাড়ে ছটার সময় আমি বাইরে এসে দেখেছি চৌধুরী টুথ-ব্রাশ করতে করতে পায়চারি করছে।

কুশানু চুপ করে যায়। দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে না তার, সে স্পষ্ট দেখেছিল গেট খুলে একটি লোককে বেরিয়ে যেতে। ডাক্তার মিত্র আর বাহাদুর ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই—সুতরাং ভুল তার হতে পারে না। বললে, আপনার গ্যারেজের অথবা গাড়ির ডুরিকেট চাবি কার কাছে থাকে?

ডুরিকেট চাবি নেই।

গতকাল রাত্রে চাবিটা আপনি কোথায় রেখেছিলেন?

অপরেশবাবু হেসে বলেন, আপনি যা ভাবছেন তা হয়নি। চাবিটা আমি বালিশের নিচে নিয়ে শুই, আর আমার ঘর বাত্রে ভিতর থেকে বন্ধ থাকে।

কুশানু আর কোন কথা বলে না।

কি হল? চুপ করে গেলেন যে? মনে হচ্ছে আমার কথাটা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না আপনি।

হেসে কুশানু বলে, আপনিই আমাকে এ রহস্যের কিনারা করতে ডেকে এনেছেন, সুতরাং আপনার কথা অবিশ্বাস করব কি করে? তবে কি জানেন, গোয়েন্দা হিসাবে সব রকম সম্ভাবনাই আমাদের যাচাই করে দেখতে হয়, আর তাই সবাইকেই সন্দেহের চোখে দেখতে হয়।

অপরেশবাবু ইঙ্গিতটা বুঝতে পারেন নিশ্চয়—কিন্তু এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা বলেন না। আর তাতেই সন্দেহটা দৃঢ়তর হল কুশানুর। বুঝলে ডাক্তার মিত্র জ্ঞাতসারে একটা সত্য গোপন করছেন। কিন্তু কী তাঁর স্বার্থ?

একটু পরে অপরেশবারু বলেন, আপনি বোধ হয় স্বাহার মধ্যে পাগলামীর কোন লক্ষণ দেখেননি, নয় ?

মাঝরাতে উঠে সেতার বাজানো নিশ্চয় পাগলামীর পর্যায়ে পড়ে না।

বেশ, আজ সন্ধ্যায় আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব, পারবেন যেতে ?

কোথায় ?

সন্ধ্যার সময় স্বাহা রোজ্জ বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত আটটা নাগাদ। লক্ষ্য করেছেন বোধ হয়। ও কোথায় যায়, আমি জানি। আপনি যদি কাঁট রোড পর্যন্ত নামতে পারেন তাহলে আপনাকে দেখিয়ে আনতাম।

কোথায় যায় সে ?

কোথায় যায় তা আগে থেকে বলব না। দৈবক্রমে আজ যদি সে ওখানে না যায়, তাহলে আপনি আবার আমার সম্বন্ধে অন্য কিছু ভেবে বসতে পারেন। গোয়েন্দা হিসাবে সকলকেই সন্দেহের চোখে দেখেন কিনা আপনারা !

শেষের কথাটার মধ্যে যে গ্লেশ ছিল সেটা বুঝতে না পারার ভান করে কুশানু সংক্ষেপে বলে, বেশ, যাব আমি।

নামতে পারবেন তো আমার হাত ধরে ?

পারতেই হবে আমাকে।

চৌধুরী যে দিনের বেশীর ভাগ সময়েই বাড়ির বাইরে থাকে এটা লক্ষ্য করেছে কুশানু। রাত্রেও যে সে বাইরে থাকে এটা অবশ্য স্বীকার করেননি অপরেশবারু ; কিন্তু দিনের বেলাতেও বাইরে বাইরে কটায় এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। জ্বর সঙ্গে তার বনিবনাও হয়নি, স্তূতরাং এর একটা যুক্তি আছে ;—কিন্তু কি জানি কেন কুশানুর মনে হয় চৌধুরীর এই দীর্ঘ সময় বাইরে থাকার পিছনে আরও কিছু হেতু আছে। সেই হেতুটা ডাক্তার মিত্র হয়তো জানেন, কিন্তু গোপন করছেন।

সন্ধ্যার পর স্বাহা প্রতিদিনের মতই বের হয়ে গেল একা। একটু পরেই নেমে এলেন ডাক্তার মিত্র। কুশানু তৈরি হয়েই ছিল। অল্প কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার মিত্রের হাত ধরে টর্চের আলোয় ধীরে ধীরে নেমে আসে পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে। মনের দুর্বলতাকে সে জোর করে চেপে রাখল ; —না মাথা ঘুরলে চলবে না। ওর প্রিয়বান্ধবী জড়িয়ে পড়েছে একটা রহস্যময় ষড়যন্ত্র জালের মধ্যে ! তাকে উদ্ধার করবে কুশানু। এতদিনে

ওর বিশ্বাস হয়েছে স্বাহা প্রকৃতই অপ্রকৃতিস্থা নয়—তাকে এরা পাগল করে তুলছে! আর যদি সত্যিই তার মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দিয়ে থাকে—তার জন্ত দায়ী কে? কার জন্তে আজ মৌনশুদ্ধতা মুখর করে তোলে স্বাহা সেতারের করুণ কান্নায়? কার নাম পর্যন্ত সহ করতে পারে না সে?

ছোট্ট এ্যাথামাডার গাড়িটা ড্রাইভ করে নিয়ে চলেন ডাক্তার মিত্র। ড্রাইভারের সীটের পাশেই দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকে কুশানু। খাদের ধার ঘেষে যাওয়ার সময় এক একবার সিরসির করে উঠছে হাড়ের মধ্যে। একটা বাঁকের মুখে চাপা আর্তনাদ করে চোখ বন্ধ করে—ভয়ে। ডাক্তার মিত্র তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামিয়ে প্রশ্ন করেন—ফিরে যেতে চায় কিনা। দাঁতে দাঁত চেপে কুশানু বলে, না, চলুন।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তার ধারে। একটা সিগারেট ধরিয়ে সীটে জুত করে বসেন অপরেশবাবু। বলেন, আমি যাব না, আপনি একাই যান। সামনের ওটা একটা বুদ্ধিস্ট মনাস্টরি।

কুশানুও তাই চায়। টর্চটা হাতে নিয়ে এগিয়ে যায়। শহরের একান্তে নির্জন নিস্তর্র বৌদ্ধ মন্দিরাম। সিংহদ্বার অতিক্রম করে চওড়া একটা চাতাল। লোকজন বিশেষ নেই। ওদিকে একটা ঘরে বাতি জ্বলছে। একজন বৌদ্ধ শ্রমণ কি একটা গ্রন্থ পড়ছেন। এ ধারে একসার গোল গোল ড্রাম। নেপালী ভাষায় তার গায়ে কি সব লেখা। পাথরের থাম—স্তর্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। চাতালটা পার হয়ে জুতো খুলে মন্দিরের মণিকোটার প্রবেশ করে। বেশ বড় ঘর—ভিতরটা। সামনের পিতলের বিরাটকার বুদ্ধমূর্তি। ধূপদানীতে পুডছে স্নগন্ধী ধূপ। দীপাধারে জ্বলছে একসার প্রদীপ। সম্মুখে একটা বড় ব্রোঞ্জের থালা। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু নিমীলিত নেত্রে ধ্যানে বসে আছেন। আর তাঁর থেকে কিছু দূরে নতজানু হয়ে বসে আছে স্বাহা। বৃকের কাছে হাত দুটি জোড় করা। মুখের একটা পাশ প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা যেন! স্তর্র বিশ্বয়ে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকে কুশানু।

আধো-অন্ধকারে এই বৌদ্ধ মন্দিরের নিভৃত কোণায় স্বাহার যেন একটা নতুন রূপ ফুটে উঠেছে। কুশানুর মনে হল—ওর চোখের সামনে বসে থাকা ঐ মেয়েটি যেন স্বাহা মিত্র নয়—ও যেন স্থানকালপাত্তের অতীত কোন এক বিদেহী সত্তা—তার স্থূল দেহের একটা ছায়ামাত্র পড়ে আছে ওখানে।



ও যেন কোন হারিয়ে-যাওয়া অবস্খী-উজ্জ্বলিনীর বৌদ্ধ ভিক্ষুনী তথাগতের পদপ্রান্তে নামিয়ে দিতে এসেছে জাগতিক বেদনার ভার।

চোখ দুটো জলে ভরে এল সেন্টিমেন্টাল কুশানুর। কেমন যেন অপরাধ প্রবণতার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ক্রমশঃ।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে কি জানি কেন ঘণ্টা বেজে ওঠে। বোধ হয় রাত্রে মত মন্দিরদ্বার বন্ধ হওয়ার সঙ্কেত। বৌদ্ধ ভিক্ষু পুঁথি বন্ধ করে উঠে পড়েন। স্বাহাও প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়।

ফেরার পথে ডাক্তার মিত্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দেখলেন? উত্তরে কুশানুর সংক্ষেপে বলেছিল, দেখলাম। কি দেখল, তা আর জানতে চাইলেন না ডাক্তারবাবু—কুশানুর কিছু বলল না।

বাড়ি ফিরে এল ওরা রাত সাড়ে নটায়। তখনও স্বাহা ফেরেনি। চৌধুরী বসেছিলেন বাইরের ঘরে। ওদের আসতে দেখে উঠে গেলেন উপরের ঘরে। স্পষ্টই বোঝা যায় চৌধুরী এড়িয়ে চলতে চাইছেন।

আহারাদির পর গুঁর ঘরে আবার এসে বসলেন ডাক্তার মিত্র। তাঁর হাতে এক প্যাকেট ছবি। কুশানুরকে একের পর একটা ছবি দেখাতে থাকেন। কুশানুরকে বলে যেতে হবে কি দেখছে সে। এ যেন এক অদ্ভুত পাগলের খেলা। কুশানুর মনে হল দিনের পর দিন এভাবে চিকিৎসা চলতে থাকলে ভালমানুষও পাগল হয়ে যায় বোধ হয়। তবু অপ্রতিবাদে বলে যায়—পাখী, আলপনার নক্সা, রাক্ষসের মুখ, একগুচ্ছ করবীফুল—

নোট নিতে থাকেন ডাক্তার মিত্র। ছবির বাঙালিটা শেষ হলে বলেন, বেশ, আবার মনটা ফাঁকা করুন। আজ আবার একটা কথা সাজেস্ট করছি—আপনার যা মনে হচ্ছে বলে যান।

কয়েকটা নিম্নরূপ মুহূর্তের পরে ডাক্তারবাবু বলেন, গোয়া!

নিমীলিত নেত্রে কুশানুর বলে যায়, সালাজার-পতুর্গাল স্পেন-মাদ্রিদ—সমুদ্রের ঢেউ—প্লাবন—শ্রীমতী—মাইলোমিটার।

তারপরেই থেমে যায়। তাকায় চোখ খুলে। হেসে বলে, কি কি বললাম বলুন তো?

খাতা দেখে মিত্র বলেন, গোয়া থেকে সালাজার, আচারালি পতুর্গাল। তা থেকে স্পেন, মাদ্রিদ। তারপর বলেছেন সমুদ্রের ঢেউ, প্লাবন, শ্রীমতী আর মাইলোমিটার।

কিন্তু এমন অদ্ভুত কথাগুলো কেন বলে গেলাম আমি ? মাজিহ পর্যন্ত চিন্তাধারার একটা সামঞ্জস্য আছে—কিন্তু তারপর ?

গোয়া এবং পর্তুগালের প্রসঙ্গে সমুদ্রের ঢেউ মনে আসা অস্বাভাবিক নয় । সমুদ্রের ঢেউ থেকে মনে পড়তে পারে প্রাবনের কথা ।

কিন্তু শ্রীমতী ?

ওটাও আন্দাজ করতে পারি । সমুদ্রের ঢেউটা মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়েছে ভাবসমুদ্রের প্রাবনে । বৌদ্ধধর্মের প্রাবন ব্রাহ্মণ্য সমাজের উপর । সন্ধ্যার অমুভূতিটা আপনার মন থেকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি । তাই নটীর পূজার শ্রীমতীর কথা মনে পড়েছে আপনার । কিন্তু আমি ভাবছি, হঠাৎ মাইলোমিটার মনে হল কোন্সূত্রে ? স্পীডোমিটার হলেও না হয় একটা অর্থ পাওয়া যেত ।

কুশাহু একটু চুপ করে থেকে বলে, একটা কথা । আপনি এ সব অদ্ভুত প্রশ্নই বা করছেন কেন, আর আমার এসব আবোলতাবোল উত্তরগুলোই বা লিখে রাখছেন কেন ?

ডাক্তার মিত্র একটু ভেবে নিয়ে বলেন, ক্রিমিনলজি নিয়ে যখন আপনার কারবার, তখন সাইকোলজির মোদা কথাগুলো নিশ্চয় আপনার জানা আছে । সুতরাং আপনার বুঝতে অসুবিধা হওয়া উচিত নয় যে আপনার এই অসুখের উৎপত্তি নিজ্ঞান-মনের কোনও নিরুদ্ধ কামনার উৎস থেকে । বহুদিন আগে হয়তো একেবারে শৈশবে, কোন একটা ইচ্ছা আপনার মনে জেগেছিল । সেটা আপনি দমন করতে বাধ্য হয়েছিলেন । হয়তো সামাজিক বাধা, নয়তো অশ্লীল মনে হওয়ায় জোর করে ইচ্ছাটাকে দমন করেছিলেন । এখন চেষ্টা করেও না সে ঘটনা, না সেই কামনার বস্তুটি কিছুই আপনি মনে করতে পারেন না । সম্মোহিত অবস্থায় যখন আপনার মনের প্রহরী ঘুমিয়ে পড়ে তখন সেই গুপ্ত কথার দু একটা আভাস ভেসে ওঠে । দু একটা অসংলগ্ন কথা আপনি বলেছেন যা থেকে আমার ধারণা হয়েছে, আচ্ছা, আপনি কোনদিন গয়া অথবা গোয়াতে গিয়েছেন ?

না তো ।

গয়া অথবা গোয়া বন্দরে আপনার পরিচিত কেউ কখন ছিল ? এই দুটি স্থানের কোন ঘটনা কোনভাবে আপনার মনে প্রভাব বিস্তারি করতে পারে ?

অনেকক্ষণ ভেবে কুশাহু বলে, কই, মনে তো পড়ে না ।

আজ তবে এখানেই থাক। চেষ্টা করে মনে আনতে পারবেন না, পারা যায় না। তবে খুঁজে একদিন আমি বার করবই।

অপরের বাবু চলে যান। কুশানুর ঘুম আসে না। রাত বাড়ছে। জানলা দিয়ে জোনাকি-জলা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে কুশানু। স্বাহা কি সত্যিই পাগল হয়ে যেতে বসেছে? কিন্তু পাগলামীর কি লক্ষণ সে দেখেছে এ পর্যন্ত? স্বাহা ওকে চিনতে পারেনি। পারেনি নয়, চায়নি। খুব স্বাভাবিক সেটা। কুশানু রায়কে সে ভুলতে চায়, তাই স্তব্ধ দাসকেও সে অস্বীকার করতে চায়। স্বাহা মধ্যরাত্রে উঠে সেতার বাজায়, বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে উপাসনা করে। সেগুলো অস্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু পাগলামী কি?

ঢং ঢং করে দেওয়াল-ঘড়িতে এগারোটা বাজল। ঘুম আসছে না। স্বপ্ন পরিসর রুদ্ধদ্বার কক্ষে পায়চারি করতে থাকে। হঠাৎ একটা শব্দে চোখ তুলে তাকায়। না, ভুল হয়নি তার, কালো ওভারকোট পরা একজন লোক গেট খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে। কুশানুও ওভারকোটটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে আসে নিঃশব্দে। প্রচণ্ড কনকনে শীতের একটা ঠাণ্ডা চাবুক এসে পড়ে ওর মাফলার-জড়ানো মুখে। কিন্তু থামে না সে—পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে গেট খুলে। পাথর বাঁধানো পাকদণ্ডীর পথে টর্চের একটা গোল আলো যেন অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নেমে যায় ক্যালকাটা রোডের দিকে। কুশানুও ঢালু পথ বেয়ে খানিকটা নেমে আসে। নীরন্ধ অন্ধকারে আর এগিয়ে যেতে সাহস পায় না। প্রয়োজনও ছিল না। একটা মোটর গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। অপরের বাবুর গাড়িটাই নাকি? অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে ফিরে এল কুশানু।

তারাতারা আকাশের প্রচ্ছদপটে শুক বাড়িটা যেন গ্রহরা দিচ্ছে। আশ্চর্য, দোতলার কাচের জানলায় আলোর আভাস। স্বাহার ঘরে; কিন্তু বিজলি বাতি তো নয়। প্রচণ্ড শীতে যেন থরথর করে কাঁপছে আলোটা—নাকি উত্তেজনায় কাঁপছে ওটা? স্বাহা জেগে আছে, সেতারের আওয়াজ উঠছে আজও। ঘরে গেল না কুশানু। পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে বাড়িটার পিছন দিকে এগিয়ে যায় যেখানে দ্বিতল জমির সমতল। ওর মনে পড়েছে, ঐখানে একটা বড় পাথর আছে; তার উপর দাঁড়ালে জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। পথ এটা ঠিক নয়। পাথর আর গাছের শিকড় আঁকড়ে হাতে পায়ে টেনে ভুলতে হল নিজেকে। একেবারে তন্ময় না হয়ে পড়লে সে বুঝতে পারত তার

মত নার্তাস নিউরটিক রুগীর পক্ষে এ পথটা প্রশস্ত নয়। এসব কথা খেয়ালই হল না তার। জানলার প্রায় সমতলে এসে কাচের সারি দিয়ে ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই স্তম্ভিত হয়ে যায় একেবারে।

চৌধুরী নেই। ঘরে জ্বলছে একটা বড় প্রদীপ। কাঠের একটা তেপায়ার উপর পিতলের ছোট্ট একটা বুদ্ধমূর্তি। সামনে জ্বলছে ধূপদানীতে একসার ধূপকাঠি। ধুহুচিতে পুড়ছে কী একটা স্নগন্ধী। গলগলে ধোঁয়ায় প্রদীপজ্বলা আবছা অন্ধকারের বুকে লেগেছে কুয়াশার প্রলেপ। আর সেই মোহাঙ্ককার নির্জনকক্ষে ওই বুদ্ধমূর্তির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে স্বাহা সেতার বাজাচ্ছে।

তিল তিল করে সেজেছে স্বাহা। সে সাজ এ সহস্রাব্দির নয়! মাথার উপর দিয়ে সূক্ষ্ম চীনাংশুকের ওড়না। অজস্তা-ফ্রেসকোতে দেখা পিছনে ফাঁস দেওয়া ময়ূরকণ্ঠি রঙের একটা দৃঢ়বন্ধ বক্ষবন্ধনী। মপিল বেণীতে রূপালী জরির ফিতের সাথে সাদা কি একটা ফুলের মালার জড়াজড়ি। সূর্য্য আঁকা টানা চোখের পল্লব ভিজা ভিজা। মনিবন্ধে, গলায় ফুলের মালা।

গুটি কেটে যেমন হঠাৎ বেরিয়ে আসে বিচিত্রবর্ণা প্রজাপতি, কালো মেঘের বুকে জেগে ওঠে সপ্তবর্ণা ইন্দ্রধনু—তেমনি জাগতিক স্তূলতার বন্ধন কেটে ওই অভিশপ্ত মেয়েটি যেন নূতন রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে এই মধ্যরাত্রির স্তব্ধ নির্জনতায়,—রূপে রসে সুরের মুছানায় মেলে ধরেছে তার প্রাণের রঙ তারাতারা আকাশের নিঃসীমায়। কুশানুর আজও মনে হল—ওর বোধশক্তি বুঝি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তার মুছানাত চेतনার সামনে থেকে জগৎ যেন হারিয়ে যাচ্ছে অসুভূতির ওপারে—যেমন করে মিলিয়ে যায় বনের অন্ধকারে পলাতক জোনাকির শেষ আলো।

ঘরে ফিরে এসেও ঘুম এল না কুশানুর। এ কেমনতর পাগলামী? ডাক্তার মিত্র বলেছিলেন—মাঝে মাঝে ওর নাকি আত্মবিলুপ্তি ঘটে, তখন সে ভুলে যায় বর্তমানকে। অতীত ইতিহাসের কোন জনপদবধূর সঙ্গে তখন সে অসুভব করে একটা ক্ষণিক একাত্মবোধ। কিন্তু এ তো হঠাৎ-আসা রোগের আক্রমণ নয়! এর জন্ম যে প্রস্তুতের প্রয়োজন। কে এনে দিয়েছে তাকে ফুলের মালা? কখন বেঁধেছে সে দীর্ঘ কবরী? নিঃসন্দেহে একবেলা ধরে নিজেকেই নিজে সাজিয়েছে স্বাহা। চৌধুরী কি জানতে পারেনি? কিন্তু দর্শকহীন এ সঙ্গীতসভার জন্ম এত কেন সেজেছে স্বাহা?



পরদিন সকালে উঠতে বেশ বেলা হয়ে গেল। প্রাতরাশের টেবিলে আগেই এসে বসেছেন সবাই। কুশাঙ্কু দেবী করে ফেলার জন্য একটু কুণ্ঠা প্রকাশ করল,—কেউ জবাব দিল না। চৌধুরী সকালের খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে রইলেন। স্বাহা চা তৈরী করতে ব্যস্ত। কাজলকালো চোখ দুটি ছাড়া গতরাত্রেই ইতিহাস যেন মুছে ফেলেছে সে নিঃশেষে।

কুশাঙ্কু সরাসরি চৌধুরীকে প্রশ্ন করে বসে, কালরাত্রে কি আপনি বাইরে বেরিয়েছিলেন মিষ্টার চৌধুরী?

স্বাহার হাতটা একটু কঁপে ওঠে ওর হঠাৎ প্রশ্নে। চায়ের লিকার উছলে পড়ে টেবিলক্লে। উসখুস করে ওঠেন মিত্রসাহেব। কাগজ থেকে মুখ না তুলেই কক্ষস্বরে প্রতিপ্রশ্ন করেন চৌধুরী, রাত্রে? কত রাত্রে?

প্রত্যেকটি শব্দ পরিষ্কার উচ্চারণ করে কুশাঙ্কু বলে, রাত এগারোটা পঁচিশে?

এবার কাগজটা নামিয়ে রাখেন চৌধুরী। চকিত চাহনিত কুশাঙ্কুকে একনজর দেখে নিয়ে আবার তুলে নেন কাগজটা। জবাব দেন না।

নৈশব্দ নাকি স্বর্ণময়। কিন্তু সেটা চায়ের টেবিলে নয় নিশ্চয়। তাই ডাক্তার মিত্র তাড়াতাড়ি পরিবেশটা হালকা করতে বলে ওঠেন—একবার ঘুমালে আমার ভগ্নিপতিটি একেবারে কুস্তকর্ণ! রাত্রে উঠবে ও?

কাগজ থেকে চোখ না তুলেই চৌধুরী বলেন, তোমার চিকিৎসায় তা হলে কিছুই হচ্ছে না দেখছি?

হেসেই জবাব দেন মিত্র, কেন? আমার চিকিৎসা আবার কি দোষ করল?

ভদ্রলোক এখনও রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখছেন!

পরিবেশটা হালকা তো হলই না, বরং আরও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল ডাক্তার মিত্রের হো-হোকরা হাসিতে।

চা-পর্ব এরপর আর জমল না। ডাক্তার মিত্রের অবশ্য চেষ্টার জটিল ছিল না—কিন্তু বাকি তিনজনেই এমন গোমড়া মুখ করে রইলেন যে চায়ের বাটিগুলো খালি হতে যেন সবাই নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। স্বাহা উঠে গেল—চৌধুরীও তার পিছন পিছন।

কুশাঙ্কু বলে, আপনি কি এখন বের হবেন ডাক্তার মিত্র?

ই্যা, এয়ার অফিসে যাব একবার—একটা টিকিট বুক করতে। দিন কয়েকের জন্তু কলকাতা যেতে হবে আমাকে একটা কাজে।

আমিও আপনার গাড়িতে এলে অসুবিধা হবে? চূপচাপ ভাল লাগে না।  
না না, আসুন না আমার সঙ্গে, ঘুরে আসবেন বরং।

একটা কথা,—গতকাল রাত্রেও গাড়ির চাবি আপনার কাছে ছিল?

উত্তর দিতে একটু দেরী হল ডাক্তারবাবুর। তারপর শুধু বলেন, ই্যা।

আর কোন কথা না বলে তৈরী হয়ে নেয় কুশাহু।

আজ আর হাত ধরতে হল না। নিজেই নেমে এল কাট রোড পর্যন্ত। নিজেব চিন্তাতেই সে বিভোর। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে দরজাটা খুলে ভিতরে আসবার জন্তু আমন্ত্রণ জানালেন অপরেণবাবু। কুশাহু কিন্তু গাড়িতে উঠল না, পাদানিতে একটা পা রেখে বলে, এয়ার অফিসেই যখন যাচ্ছেন, তখন একখানা নয় দুখানা টিকিটই কেটে আনবেন কাইওলি। আমিও ফিরে যাব কলকাতায়।

একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে ডাক্তার মিত্র বলেন, হঠাৎ এ সিদ্ধান্ত?

হঠাৎই একটা সত্য আবিষ্কার করলাম যে এইমাত্র।

কি সত্য?

একটু হেসে কুশাহু বলে, আমার প্রফেসনের একটা এটিকেট আছে ডাক্তার মিত্র,—সেটা হচ্ছে এই যে গোয়েন্দার কাছে কোন কথা গোপন করতে নেই। আপনি তা করছেন। সুতরাং আর তো আপনাকে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না।

অনেকক্ষণ চোখ বুজে কি যেন চিন্তা করলেন ডাক্তার মিত্র। তারপর তিনিও একটু হেসে বলেন—বুঝলাম। কিন্তু আমার প্রফেসানেরও একটা এটিকেট আছে মিস্টার রায়,—সেটা হচ্ছে এই যে ডাক্তারের কাছে কোন কথা গোপন করতে নেই। আপনিও তা করছেন।

আমি? কেমন করে?

কালরাত্রে কেন মাইলোমিটারের কথা আপনার মনে হল আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনি তার জবাব দেননি। কিন্তু সাইকোলজিস্ট হিসাবে আমি বলতে বাধ্য যে উত্তরটা জানতেন আপনি। কাল রাত্রে ফিরে এসে যখন গাড়ি গ্যারেজে তুলেছিলাম তখন আপনি গাড়ির মাইলোমিটারের রিডিং

দেখে রেখেছিলেন—শুধু আমার উপরে গোয়েন্দাগিরি করবার জন্তই। বলুন ঠিক কিনা ?

হ্যাঁ ঠিক। কিন্তু আপনিই বিচার করে বলুন এক্ষেত্রে প্রফেসনাল এটিকেট কে আগে লঙ্ঘন করেছে। আপনি চৌধুরীকে গাড়ির চাবি দেন—অন্তত মাইলোমিটারের রিডিং যে বেড়ে যায় এটা আপনার অজানা থাকতে পারে না।

ডাক্তার মিত্র হেসে বলেন, ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরগেট ! কেন মিথ্যা কথা বলেছিলাম, আসুন যেতে যেতে বরং সে কথাই বলি।

বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়িতে উঠে বসে কুশানু।

ডাক্তার মিত্রের কথা আশ্চর্য শুনে ওর আহত মনে আবার নতুন করে আঘাত লাগল। কী ভুলই করেছে সে সেন্টিমেন্টালের মত গানসীর প্রেমে পাগল হয়ে মানবীর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে ! ঠিকই বলেছিল ইভা—পারলে স্বাহাই পারত তাকে আবার সুস্থ স্বাভাবিক করে তুলতে। সে চেষ্টা করেনি কুশানু। জয়লক্ষ্মীকে লাভ করতে হলে যে চরমমূল্য দিতে হয়, তা কি দিয়েছে সে ? কেন সে ছুটে যায়নি পার্টনায় ? কেন জোর করে ছিনিয়ে নেয়নি তাকে ? তাই আজ সে জীবন্মৃত একটা নিউরটিক রোগী, আর স্বাহা তিল তিল করে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে একটা কুৎসিত ক্রেদান্ত অক্টোপাসের করাল আলিঙ্গনে ! চৌধুরী লোকটাকে প্রথমদিন থেকেই সে বিষ নজরে দেখেছে। ভেবেছিল, ঈর্ষার দৃষ্টিতে বুঝি মানুষটাকে বেশী কালো করে এঁকেছিল। এখন বুঝতে পারে দৃষ্টি তার ভুল করেনি।

বিবাহের কয়েকদিনের মধ্যেই—ঘনিষ্ঠ আলাপ হওয়ারও আগে চৌধুরী আবিষ্কার করে স্বাহার বাক্য থেকে—চিঠির বাঙাল। আর সেই থেকেই একটা কুৎসিত সন্দেহ জেগেছে ওর মনে। স্বাহা নাকি চৌধুরীকে বিবাহ করেছে তার প্রাক্‌বিবাহজীবনের কোন বন্ধুর এক অবাঞ্ছনীয় দান অঙ্গে ধারণ করে ! লোকটা এতদূর নির্লজ্জ যে সে অভিযোগ সে স্পষ্ট উচ্চারণ করেছে ডাক্তার মিত্রের কাছে। তার অসুমান যে সত্য, এটা প্রমাণ করতেই সে স্বাহার সঙ্গে রাজিবাস করে না। আর সেইজন্তই এই ডাক্তার ভাইবোনের চোখের আড়ালেও সে যাবে না আরও কয়েকমাস !

একটা অসহ্য যন্ত্রণায় কুশানুর হৃদপিণ্ডটা মুচড়ে ওঠে। একটা বিষমিষা ওর নাড়িতে পাক দিয়ে ওঠে। মোটর চালানো সে ভালই শিখোছিল চাকরিতে

চুকে। এখন অবশ্য ঠিগ্গারিঙে বসার কথা কল্পনাও করতে পারে না; কিন্তু সে তো ভয়ে। এখন তো ভয় নয়—গাড়িতে যেতে যেতে ওর অঙ্গে যে পাক দিয়ে উঠছে সেটা আতঙ্কে নয়—ঘণায়! কী বীভৎস একটা জন্তর কবলে সে ঠেলে দিয়েছে তার প্রিয়-লিপিবাঙ্কবীকে!

আজও বিকালে বাইরে গেল না স্বাহা। চুপ করে গিয়ে বসল পাইন গাছের আবছায়ায়, পাথরের উপর। শেষ সূর্যের স্নান আলো মূর্ছিত হয়ে পড়ল ওর গায়ে। কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় আবীরের প্রলেপ—এখনই মিলিয়ে যাবে তা। একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে বসেছিল স্বাহা।

আজও কুশাহু নিজেকে আবিষ্কার করল ওর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে। স্বাহার এই আধো-আড়ে বসার ভঙ্গিটার কেমন যেন একটা গোপন আমন্ত্রণের সঙ্কেত। এ যেন সরাসরি ডেকে নেওয়া নয়, আভাসে পাঠানো নিমন্ত্রণ। সরাসরি সবুজ আলো নয়—তবু সবুজ আলোর নিশ্চিত সম্ভাবনাময় হলদে আলোর সিগন্যাল।

পায়ে পায়ে কুশাহু উঠে আসে ওর সমতলে। একবার চোখ তুলে তাকায় স্বাহা, তারপর নত করে দৃষ্টি। না আবাহন, না বিসর্জন। একটু দূরে চুপ করে বসে থাকে কুশাহু। কী বলবে ভেবে পায় না। সমবেদনায় ওর মনটা কানায় কানায় ভরা কলসীর মতই টলমল করে। স্বাহাও কিছু বলে না।

যে মেয়ের মন ছুঁতে পেরেছ তুমি তার পাশাপাশি এমনি নিশ্চুপ বসে থাকাও রোমাঞ্চিক। না-বলা কথার মৌনতা দুজনের মনেই তোলে গুঞ্জন, সিনেমার পর্দায় যেমন বাজতে থাকে নেপথ্যে আবহসঙ্গীত। কথা সেখানে হারিয়ে যায়—মনে মনে কোন অজ্ঞাত ওয়েভ-লেংথে হয় ভাবের বিনিময়। একজনের চুলের স্বেদ, মুখের প্রোফাইল, শাড়ির তরঙ্গ আর একজনের মনে তোলে আলোড়ন—আর জনের মনের কথাও সিগারেটের নীলচে ধোঁয়ার মত ঘিরে ঘিরে পাক খেতে থাকে একজনের মনের চারিদিকে। পাইন বনের ঝিরঝিরানিতে, অন্তর্যমান সূর্যের শেষ আশীর্বাদ মাথা মহামৌন কাঞ্চন-জঙ্ঘাকে সাক্ষী করে ওরা আজ সেই চুপ করে বসে থাকার দুর্লভ মুহূর্তটির সন্ধান পেয়েছে। তবু খুশী হয়ে উঠতে পারে না কুশাহু—কেমন যেন খিঁগ-বিষগ্ন বোধ হয় তার। ওর বারে বারে এই কথাটাই মনে পড়ে যে স্বাহার মন ছুঁয়ে এই দুর্লভ মুহূর্তটিতে যে আছে সে ও নয়, সে ওর বন্ধু কুশাহু রায়! দার্জিলিং



পাহাড়ের স্বল্পমধ্যে সে নায়কের চরিত্র অভিনয় করছে না—একটি পার্শ্বচরিত্র অভিনয়ের অধিকার পেয়েছে সে। তাই এই অমূল্য নৈশব্দকে চূর্ণ করে হঠাৎ সে বলে ওঠে, সেদিন আপনি অসুস্থ ছিলেন, আজও কি শরীরটা ভালো নেই আপনার ?

নতনেত্রেই স্বাহা জবাব দেয়, না, ভালোই তো আছি।

বিরক্ত হননি তো ?

না না, বিরক্ত হব কেন ? একা একা আমারও ভাল লাগে না। সেদিন—

বাধা দিয়ে কুশাহু বলে, সেদিনের কথা থাক্। বুঝতে পেরেছি আমার বন্ধু আপনার সঙ্গে সহ্যবহার করেনি। তার প্রসঙ্গে আলোচনা আপনার ভাল লাগছে না। তাই মনে করা যাক—দার্জিলিংএ এসেই প্রথম আলাপ হয়েছে আমাদের।

স্বাহা কোনও জবাব দেয় না।

কেমন লাগে আপনার দার্জিলিং ?

স্বাহা যেন নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করে। বলে, ও প্রশ্নটা তো আমারই জিজ্ঞাসা করার কথা। আপনিই নতুন এসেছেন। আপনার কেমন লাগছে বলুন ?

আমি তো কিছুই দেখিনি এ পর্যন্ত।

দেখলেই পাবেন ঘুরে ঘুরে। অনেক কিছু দেখবার আছে এখানে। মহাকালের মন্দির, রেস কোর্স, জলাপাহাড়, বুদ্ধিস্ট মনাস্ত্রি।

আপনি সব দেখেছেন ঘুরে ?

না, আমিও কিছুই দেখিনি, ভালোই লাগে না।

বৌদ্ধ মন্দিরটা কোন দিকে ?

আমি ঠিক জানি না—দাদাকে বলবেন, নিয়ে যাবেন উনি।

মুখ দেখে তো মনে হয় না ও মিথ্যা কথা বলছে !

আপনি কখনও যাননি ঐ মন্দিরে ?

না, আমার ভাল লাগে না কোথাও যেতে।

এর পর কি বলবে ভেবে পায় না কুশাহু। ক্রমশঃ উপলব্ধি করে যে অনর্গল কথা বলে যাওয়ার মধ্যে দিয়েই হয়তো স্বাহার মনের অর্গলমোচন হবে। অপরিচয়ের দুরত্বটাকে ভয় করতে হলে অনায়াসে আলাপ চালাতে

হবে শুকে। কিন্তু কি নিয়ে আবার কথা শুরু করবে বুঝতে পারে না। স্বাহাই বলে, দাদা বলছিলেন, আপনি নাকি একটা মানসিক অসুখে ভুগছেন। কী অসুখ? আই মীন—আপত্তি যদি না থাকে—

কথার একটা সূত্র খুঁজে পেয়ে খুশী হয় কুশানু। বলে, না, আপত্তি আর কিসের? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন এ যুগের মানুষ নই। আমি যেন বর্তমানে নেই। অতীতে আছি। কখনও মধ্য এশিয়ার কোন নাম-না-জানা মরুভূমিতে নিজেকে আবিষ্কার করি। পথের বাঁকে যেখানে উদ্ভূত হয়ে থাকে রাইফেলের কালো নল, আবছায়া বিসপিল পথে চলতে থাকে আকরোট পেস্তা-বাদামের ছালার সঙ্গে কোকেন নিয়ে উটের ক্যারাতান—রাতের আধারে পাঁচ আমীর হাত বদলায় সুন্দরী নারীর ভাগ্য! আবার কখনও নিজেকে খুঁজে পাই অন্ধকার গুহার মধ্যে—মশালের আলোয় আমি তখন এক বৌদ্ধ শ্রমণ, এঁকে চলেছি পাথরের দেওয়ালে তথাগত বুদ্ধের জীবনালেখ্য। পরিধানে আমার গৈরিক কাষায়, মুণ্ডিত মস্তক, হাতে আমার জ্বরত গোলা রঙের বাটি।

স্বাহা অবাক হয়ে বলে, আশ্চর্য তো!

কুশানু উত্তেজিত হবার অভিনয় করে, লোকে বলে আমি নাকি পাগল হয়ে যেতে বসেছি। কিন্তু আমি তো তা বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় এ রকম অতীতের আমার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। যে কোন মানুষের এমন হতে পারে। এ যেন খুবই স্বাভাবিক। সকলেরই হয়। তাই মনে হয় না আপনার?

স্বাহাও কি অভিনয় করছে? সে কি সত্যই অবাক হয়ে বলল, কিন্তু আমার তো শুনে অদ্ভুত লাগছে! এমন হতে পারে তা তো শুনি নি কখনও? আপনার তখন কি মনে হয়? বর্তমানটা নেই?

কুশানু একটু ভেবে বলে, বর্তমান আপনি কাকে বলেন?

আর পাঁচজন যাকে বর্তমান বলে তাকেই—যা না-অতীত, না-ভবিষ্যৎ।

একটা অদ্ভুত খিওরি মুখে মুখে খাড়া করে তোলে কুশানু। বলে, বর্তমান কথাটা একটা মিসনোয়ার, বর্তমান বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না! আমি আপনি নেই। বর্তমানে এই যে ছুনিয়াটা দেখছি, এটা নেই।

স্বাহা বলে, নেই মানে? আপনি-আমি নেই? সামনের ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়টা নেই?

না নেই ! কাঞ্চনজঙ্ঘা বর্তমানে নেই । অতীতে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে ।

শঙ্করের মায়াবাদ ?

না, দর্শনের ছাত্র নই আমি, এটা আমি ম্যাথমেটিক্যালি রিয়ালাইজ করেছি । তাই আমি অতীতকে স্বীকার করি, স্বীকার করি অপ্রতিবাদে ভবিষ্যৎকেও । আমি ছিলাম, আমি থাকব এ দুটি অনস্বীকার্য । কারণ গত আর অনাগতের মাপ আছে, ব্যাপ্তি আছে, তৌল করা যায় তাকে । গত কালটা আমার অতীত, সমস্ত দিনটাই আমার স্মৃতির সঞ্চয়, তাকে আমি উপলব্ধি করেছি নিবিড়ভাবে ভালোয় মন্দে, কাঁদায় হাসায় । তেমনি মেনে নিতে রাজি আছি ভবিষ্যৎকেও—কারণ তার ব্যাপ্তি আছে, আছে বিস্তার, অস্তিত্ব ।

কিন্তু বর্তমান ?

বর্তমান নেই । আমি আছি, কিন্তু আছি কি সময়ের মাপে ? তাকে তৌল করব কোন সময়ের যুনিটের মানদণ্ডে । এই ঘণ্টাটা আমার বর্তমান নয়—কারণ ঘণ্টার আদিতে অস্তটা ছিল অনাগত, আবার অস্তে পৌঁছে আদিকে দেখছি অতীতরূপে । এই মিনিট ? মিনিটের সূরুতেও শেষটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ—শেষে পৌঁছে সূরুকে যেমন দেখছি অতীতরূপে । মিনিট ভেঙে এল্যাম সেকেন্ডে—স্প্লিট-সেকেন্ডে । সমাধান হয় না তাও । তবু সময়ের সেই অতি সূক্ষ্ম খণ্ডের থেকে যায় একটা আদি আর অস্ত । আমার বর্তমানটা যখন আদিতে অস্ত তখনও আসেনি, যেমন আদি হয় অতীত যখন অস্তটার আমার বর্তমান ।

একটা দুর্বোধ্য গদ্য-কবিতার মত কথার ফুলঝুরি কেটে সমে এসে থামল কুশালু । একটু দম নিল । হয়তো মাথামুণ্ডু নেই তার যুক্তিতে, কিন্তু সে যা চাইছিল তা হচ্ছে, হতে চলেছে । স্থির হয়ে গেছে স্বাহার দৃষ্টি । পলকহীন দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে স্নানায়মান কাঞ্চনজঙ্ঘার শেষ রক্তবিন্দুটির দিকে । সূর্য অস্ত গেছে—কোথাও নেই এককণা রোদ্দ ; শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘার নীলিমায় এখনও মুছে যায়নি তার শেষ রক্তিম চুখন । একটা অতীন্দ্রিয় মিষ্টিক আচ্ছাদনে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে স্বাহা । হয়তো এবার সেই কথা বলে উঠবে । তা কিন্তু সে বলে না । তাই আবার সূরু করে কুশালু, আমি ভাবি, তবে কি আমার বর্তমানের ব্যাপ্তিটা এতই সূক্ষ্ম যে তার আদি ও অস্ত হারিয়েছে তাদের পৃথক সত্ত্বা ? মিশে গেছে এক হয়ে ? যেমন মিশে যায়

জ্যামিতিক বিন্দুর স্বরূপ ও শেষ? জ্যামিতিক সরল-রেখায় যেমন প্রস্থের বিস্তার? সময়ের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খণ্ডাংশকে আমি বর্তমান বলছি,—যে অংশে আমি ‘আছি’—তার অস্তিত্বের তবে কি নেই কোন ম্যাগনিচ্যুড? তার মানে বাস্তবে আমি নেই?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বাহা বলে, আশ্চর্য যুক্তি তো আপনার। অদ্ভুত।

একটা আর্ত-জিজ্ঞাসায় ভেঙে পড়ল কুশাহু, এ সব কথা আপনার কখনও মনে হয় না? কখনও মনে হয়নি—আপনার বর্তমানটা ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল—যেমন করে এই মাত্র মিলিয়ে গেল কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথা থেকে সূর্যের শেষ রক্তিম স্বাক্ষর? কখনও আবিষ্কার কবেননি নিজেকে তক্ষশীলার, তাম্রলিপ্তিতে, উজ্জয়িনী অথবা অজন্তায়?

যেন একটা সরীসৃপ নেমে গেল স্বাহার গা বেয়ে। হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে স্বাহা, বলে, চলুন, ঘরে গিয়ে বসি।

প্রত্যুত্তর করার সময় দেয় না এক মুহূর্ত। দ্রুতচ্ছন্দ পাহাড়ী হরিণের মত তরতরিয়ে নেমে যায় সে পাকদণ্ডী বেয়ে, একবারও ফিরে দেখে না কুশাহু এল, না বসে রইল তার অদ্ভুত থিয়োরীর মোহাবেশে স্তব্ধ হয়ে।

কুশাহু লক্ষ্য করে সকলেই সতর্ক হয়ে গেছে রীতিমত। এ রহস্যময় পুর্বোক্তে সকলেই সকলকে সন্দেহেব চোখে দেখছে। ডাক্তার মিত্র কলকাতা যাওয়াটা পিছিয়ে দিলেন। চৌধুরীর গতায়াতটাও কমে গেছে। স্বাহাও অলক্ষিতে গুটিয়ে নিল নিজেকে। সকলেই ওকে সন্দেহ করছে নাকি? ডাক্তার মিত্রকে আরও প্রশ্ন করে কুশাহু জেনেছে যে স্বাহাদের বিবাহ হয়েছিল বেজিষ্ট্রি করে। চৌধুরী ব্রাহ্ম, তাই হিন্দুমতে সে বিবাহ করতে রাজি হয়নি। ওব কেমন যেন মনে হল ডাক্তার মিত্র এখনও ওকে সব কথা বলেননি, কি যেন গোপন করছেন তিনি। একটা নতুন সম্ভাবনার কথা মনে হল ওর। গোয়েন্দা হিসাবে সব সম্ভাবনাই ওকে যাচাই করে দেখতে হবে। তাই সকলের অলক্ষিতে একদিন সে বেরিয়ে পড়ল পথে। আজকাল একা একা পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে ওঠানামা করতে আর সে ভয় পায় না।

সৌভাগ্যক্রমে দার্জিলিং থানা থেকে এখনও বদলি হয়ে যান নি জগদীশ দে। চিনতে পারেন তিনি কুশাহুকে। শুধু আইভির সহযাত্রী হিসাবেই



নয়, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের প্রাক্তন অফিসার হিসাবেও। মনিমাল পরিবেশিত  
চা আর অমলেট আপ্যায়ন করলেন পুরানো বন্ধুকে।

কতদিন এসেছেন দার্জিলিং? খোঁজ করেননি কেন এতদিন?

আপনিই যে আছেন এখানে তা জানব কেমন করে?

উঠেছেন কোথায়? হোটেলে? কেন গরীবখানা তো ছিলই।

না হোটেলে নয়, আমার এক বন্ধুর গেস্ট হয়ে আছি এখানে।  
হিলি-রোড থেকে ডাইনে বেরিয়ে গেলে টিলার মাথায় একটা বাড়ি আছে  
দেখেছেন? হিল-পয়েন্টে? সেখানেই উঠেছি।

হ্যাঁ, ও বাড়িটায় একজন বাঙালী ভদ্রলোক ভাড়া নিয়ে আছেন  
মাগধানেক। ছোট একটা এ্যাসাসাডার গাড়িও আছে, নয়?

কিছুই আপনার দৃষ্টি এড়ায় না দেখছি। আলাপ হয়েছে ভদ্রলোকের  
সঙ্গে?

না আলাপ হয়নি। তবে খবর কিছুটা রাখতে হয় বইকি।

সোজা কাজের কথায় নেমে আসে কুশাহু। বলে, আমি আপনার কাছে  
এসেছি একটা বিশেষ প্রয়োজনে। ছুটিতে আছি, জানেন বোধ হয়—

হ্যাঁ, শুনেছি, সেই এ্যাক্সিডেন্টের পর— আচ্ছা কি হয়েছিল বলুন তো  
সে রাত্রে?

হেসে কুশাহু বলে, ডাক্তার বলেন সে রাত্রে দুর্ঘটনার কথা মনে না  
আনতে। অবশ্য আপনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন বলি—

বাধা দিবে জগদীশবাবু বলেন, না না, তবে থাক ও কথা। তার  
চেয়ে কাজের কথা কি বলছিলেন তাই বলুন।

আমি আপনার কাছে এসেছি একটি নিভুল সংবাদ সংগ্রহ করতে।  
খবরটা অত্যন্ত গোপনীয়। আপনি পার্টনার পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সে চিঠি  
লিখে একটা খবর আনিয়ে দিন আমাকে। পার্টনার ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার অফিসে  
গত সতেরোই আগস্ট লেট পি মিত্র বার-এ্যাট-লর একমাত্র কন্যা ডাক্তার  
স্বাহা মিত্রের সঙ্গে কারও বিবাহ লিপিবদ্ধ করা আছে কিনা। থাকলে ব্রাইড  
গুমের নাম কি, এবং তার প্রাক্‌বিবাহজীবন সম্বন্ধে মোটামুটি কি খবর  
পাওয়া যায়।

জগদীশবাবু সব নোট করে নিয়ে বলেন, রেডিওগ্রামই করে দিচ্ছি।  
দ্বিদিন পাঁচ ছয় পরে খবর নেবেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো?

কুশানু হেসে বলে, রহস্যটা এখনই পরিষ্কার করি কেন? তবে যদিও এ্যামেচারিস্ট হিসাবে এ রহস্যের সন্ধানে নেমেছে তবু আপনার সাহায্য যে কোন মুহূর্তে প্রয়োজন হতে পারে। আশা করি তা পাব।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

নমস্কার করে চলে এসেছিল কুশানু। একেবারে গোড়া বেঁধে কাজ করবে সে।

পরের চার পাঁচ দিন চৌধুরী এ বাড়িতে একেবারেই এল না। অপরেশবাবুর কাছে কুশানু শুনেছিল চৌধুরী বুঝি কোন এক হোটেলে উঠেছে। হোটেলের নামটাও বলেছিলেন তিনি। কুশানু জগদীশবাবুর সাহায্য ব্যতিরেকেই সন্ধান নিয়ে জেনেছে যে সে হোটেলে মিস্টার চৌধুরী নামে কোন বোর্ডার নেই। এ কথা অপরেশবাবুকে সে অবশ্য বলল না। জগদীশবাবুর কাছ থেকে জবাব পাওয়ার আগে সে অপবেশবাবুকেও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। ডাক্তার মিত্রের মত বুদ্ধিমান লোক যে এ খবরটা নেননি এটাই সে বিশ্বাস করতে পারেনি। ওর চিকিৎসাও বন্ধ আছে এ বয়সদিন। কুশানুই আপত্তি করেছিল—কেন আপত্তি করছে জানতে চাননি ডাক্তার মিত্র। আর এই কৌতূহলহীনতাই আরও সন্দিক্ত করে তুলেছে কুশানুকে। ওর মতে ডাক্তার মিত্রের এই চিকিৎসা বন্ধ রাখার ব্যাপারটা বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়ার মধ্যে আছে গিণ্ট-কনসালেনস। স্বাহার সঙ্গে আলাপটা আরও অন্তরঙ্গ হয়েছে ইতিমধ্যে। দু একবার দু জনে একসঙ্গে বেড়াতেও গেছে। আলাপ আলাপ হয়েছে—মনেব দ্বার খোলেনি স্বাহা, তবু সে যে অন্তরীণ এটা আকারে ইঙ্গিতে জানতে দিয়েছে কুশানুকে। সেদিন বিকালে সেই যে ছুটে পালিয়ে এসেছিল স্বাহা, তারপর আব মধ্যরাত্রে গানের আসর বসেনি দ্বিতলের নিজস্ব কক্ষে। স্বাহা যেন অত্যন্ত সতর্ক হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য সে একাই কোথায় বেরিয়ে যায়। নিশ্চুপ বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একবার দোতলায় উঠে আলাপ করতে গিয়ে পা টিপেই ফিরে এসেছে কুশানু। ওর টেবিলে একটি চিঠির প্যাডের উপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদছিল স্বাহা। অপরেশবাবুও তখন ছিলেন না বাড়িতে। স্ত্রীত দাসের সঙ্গে স্বাহার সম্পর্কটা এতটা ঘনিষ্ঠ নয় যে এমন একটা মুহূর্তে ওর পিঠের উপর একটা হাত রাখবে কুশানু। নিঃশব্দে নেমে এসেছিল নীচে। মনে মনে ধিক্কার দিয়েছিল ওর বন্ধু কুশানু রায়কে।

দিন সাতেক পরে জগদীশবাবুর কাছে ছড়ান্ড সংবাদ পাওয়া গেল।  
 পাটনা অফিস থেকে জবাব এসেছে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অফিস থেকে জানা  
 গেছে যে সন্তেরই আগস্ট লেট প্রভুল মিত্র বার-এ্যাট-লর কন্যা ডাক্তার  
 স্বাহা মিত্র এম.বি. বি এস-এর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে মিস্টার এম চৌধুরীর।  
 পাটনা অফিস আরও লিখেছে যে ব্রাইডগ্রুম পাটনারই ছেলে—বিয়ের পরই  
 সস্ত্রীক কোথায় চলে গেছে। লিখেছে, মিস্টার চৌধুরী ইতিপূর্বেও একবার  
 বিবাহ করেছিলেন। সে মেয়েটি আত্মহত্যা করে। এ নিয়ে খুবই ক্যাণ্ডেল  
 হয়। প্রতিবেশীরা সন্দেহ করেছিল—আত্মহত্যা নয়, হত্যাই করা হয়েছিল  
 হতভাগিনীকে অথবা আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছিল তাকে। যদিও  
 প্রমাণাতাবে পুলিশ কেস চালায়নি। এ সব কথা পাটনার লোকেরা না জানে  
 তা নয় তবু কেন যে ডাক্তার মিস মিত্র তাকেই বিবাহ করেন এবং তাঁর দাদা,  
 ( চিঠিতে বলা হয়েছে দাদাই অভিভাবক, এবং তিনি বিলাতী ডিগ্রিধারী উচ্চ  
 শিক্ষিত ডাক্তার ) কেন যে এ বিয়ে অনুমোদন করলেন সেটা অনেকের কাছেই  
 রহস্যজনক। পাটনার অফিস জানতে চেয়েছে এ বিষয়ে কেন প্রশ্ন করা হল  
 এবং আরও কোনও বিস্তারিত সংবাদ চাই কি না।

টাইপ-করা চিঠিখানা জগদীশবাবুর হাত থেকে নিয়ে নিজেই পড়ল কুশানু,  
 একবার দুবার—তারপর ফেরত দিল।

এনি মোর ডিটেলস ?

হ্যাঁ চাই। চৌধুরীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কি ভাবে মৃত্যু হয়। সে ধর্মীর  
 কন্যা ছিল কি না। তাঁর মৃত্যুতে স্ত্রীর সম্পত্তি সে পেয়েছে কি না।  
 ডাক্তার অপরেশ মিত্র, মানে স্বাহার দাদার সঙ্গে এই চৌধুরীর কতদিনের  
 আলাপ। বস্তুত ঐ চৌধুরীর সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ আমি বিস্তারিত জানতে  
 চাই।

জগদীশ বলেন, কিন্তু এবার তো আমাকে বলতে হবে কেন এত কথা  
 জানতে চাইছেন। অফিসিয়ালি এসব খবর বিস্তারিত জানতে চাইলে—

অফ কোর্স। থামিয়ে দেয় কুশানু তাঁকে। সংক্ষেপে জানায় স্বাহা এবং  
 চৌধুরীর কথা। ডাঃ মিত্রের কথাও। বলে, সে সন্দেহ করে চৌধুরী তার  
 দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে হত্যার বদলে পাগল প্রতিপন্ন করতে চাইছে—হয়তো  
 সত্যিই পাগল করে তুলেছে তাকে। নিঃসন্দেহে স্বাহার পৈতৃক সম্পত্তিটাই  
 তার লক্ষ্য। উপসংহারে বলে, একটা জিনিস শুধু বুঝে উঠতে পারছি না।

আমি। ডাঃ মিত্র কেন রাজি হলেন এমন একটি ছেলের সঙ্গে যোনের বিয়ে দিতে। এতবড় স্ক্যাণ্ডলটা শুনতে পেলেন না তিনি পাটনার বসেও ?

জগদীশবাবু নির্বিকারভাবে বলেন, তার একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর এই যে, যে সন্দেহ করছেন আপনি চৌধুরীর উপর, ডাক্তার মিত্রকেও দিতে হয় তার অংশ। ধরে নিতে হয় যে ওঁরা দুজনে মিলে এটা করছেন।

কুশাম্বু জবাব দেয় না। গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে যায় ক্রমে।

জগদীশবাবুই আবার বলেন, আমি বরং ভাবছি অন্য কথা। চৌধুরী পাটনার ছেলে, স্বাহা দেবীও পাটনা কলেজে পড়েছেন। স্ক্যাণ্ডলটা তো তাঁরও শোনা উচিত। তিনিই বা রাজি হলেন কেন ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কুশাম্বু বলে, তার কারণটা আমি অনুমান করতে পারি। অন্য এক জায়গা থেকে একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সে সময় ওর মনটা প্যারালাইজড হয়ে ছিল।

এবার নীরব হতে হয় জগদীশবাবুকে।

প্রাতরাশের টেবিলে গত এক সপ্তাহের মধ্যে একদিনও যোগ দেননি চৌধুরী। আজও তিনি অনুপস্থিত। ডাক্তার মিত্র চা পান করতে করতে বলেন, আমি কাল কলকাতা নামছি স্বাহা। দিন সাতেক দেরী হবে ফিরতে।

স্বাহার মুখে হঠাৎ ঘনিয়ে ওঠে একটা আতঙ্কের আভাস। সামলে নিয়ে বলে, দেরী কর না যেন।

চা পর্বের শেষে স্বাহা উঠে গেল উপরে। একটা আড়ামোড়া ছেড়ে ডাক্তার মিত্রও উঠে পড়েন। কুশাম্বু বলে, একটা কথা ডাক্তারবাবু। আপনি কি জানতেন মিস্টার চৌধুরী আগেও একবার বিবাহ করেছিলেন ?

ডাক্তারবাবু একটু চমকে ওঠেন যেন, সামলে নিয়ে বলেন, হ্যাঁ জানতাম। কেন বলুন তো ? আপনি জানলেন কি করে ?

একথাও কি আপনি জানতেন যে চৌধুরীর প্রথমা স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিলেন ?

অপরেণবাবুর দৃষ্টিটা কঠিন হয়ে ওঠে। অত্যন্ত দ্রুত কয়েকটা চিন্তা তাঁর মনে আগল এটা বোঝা যায়। একটু দেরী হয় তাঁর জবাবটা দিতে, কিন্তু জবাব বখন দিলেন তখন কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার কোন অভাব ছিল না। ডাক্তার মিত্র বললেন, মিস্টার বাবু, সেদিন আপনি আমাকে দুখানা টিকিট



কাটতে বলেছিলেন। আমিই বাধা দিয়েছিলাম। আজ মনে হচ্ছে ভুল করেছিলাম। দুখানা টিকিটই কেটে আনব আজ। আপনি বরং তৈরী হয়ে নিন।

কথা শেষ করে আবার উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন ডাক্তার মিত্র। রহস্যটা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে আসছে, তাই কুশান্ন বলতে পারে, কিন্তু বাবার ইচ্ছেটা যে আমার একেবারে চলে গেছে ডাক্তার মিত্র।

স্বৈচ্ছায় আপনি আসেননি, না হয় স্বৈচ্ছায় নাই বা গেলেন।

কিন্তু আপনার তরফেই বা হঠাৎ এমন তাগিদ দেখছি কেন?

তাগিদ একমুখ যে গোয়েন্দাগিরি করবার জন্য আপনাকে এখানে আনি নি আমি। এনেছিলাম আমার বোনের চিকিৎসায় সাহায্য হবে বলে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি সেকাজ আপনাকে দিয়ে হবে না। আপনার চিকিৎসা করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার মনের গোপন রহস্য খুঁজে বার করা আমার সাধ্যাতীত; কারণ আপনি সজ্ঞানে তার চতুর্দিকে একটা প্রাচীর খাড়া করে রেখেছেন। আপনি আমাকেই সন্দেহ করছেন, তাই কোনদিনই আমার কাছে মন খুলতে পারবেন না আপনি। অতএব আপনার এখানে থাকারটা এখন নিরর্থক।

একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিল কুশান্ন। প্রয়োজন হল না। দ্বিতলের সিঁড়ির মুখ থেকে স্বাহা ডেকে উঠল, দাদা!

দুজনেই মুখ তুলে তাকায়।

তুমি ফিরে আসা পর্যন্ত অন্তত উনি থাকুন। একা বাড়িতে—

বেশ, থাকুন। একটু রাগ করেই বেরিয়ে যান অপরের বাবু।

যেন অপরাধী মনে হয় নিজেকে, তবু অস্বোয়াস্তিটা ঝেড়ে ফেলে কুশান্ন বলে, আমাদের সব কথাই শুনেছেন নিশ্চয় আপনি?

স্বাহা জবাব দেয় না।

আপনিও কি বিয়ের আগে জানতেন এসব কথা?

জানতাম।

তবু কেন রাজি হয়েছিলেন এ বিয়েতে?

কারণটা না হয় আপনার বন্ধুকেই জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। কথাটা বলে স্বাহা আর দাঁড়ায় না। দ্রুতবেগে উঠে যায় দ্বিতলে। কুশান্ন কিন্তু এ সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়। সেও উঠে আসে উপরে। দরজাটা ভেজানো। বাইরে থেকে কুশান্ন ডাকে, ভিতরে আসতে পারি?

একটু দেৱী করে স্বাহা বলে, আহ্নন ।

ঘরে ঢুকে একটা ইজিচেয়ারে গিয়ে বসে । বলে, কথা দিয়েছিলাম, বন্ধুর প্রসঙ্গ তুলব না । আপনিই তুলেছেন প্রথমে । আপনি জানেন তার অধুনাতন খবর ?

দেওয়ালের দিকে মুখ করে স্বাহা বলে, জানি । ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে বড় চাকরি করছেন, একজন বড় পুলিশ অফিসারের মেয়েকে বিয়ে করেছেন—

তুল শুনেছেন আপনি । কৃশাঙ্কুর কণ্ঠে দৃঢ়তা ।

তুল শুনেছি ? চমকে ফিরে তাকায় স্বাহা ।

হ্যাঁ, তাই । কৃশাঙ্কু আজও অবিবাহিত, তার ধারণা আপনিও তাই । সে আজও প্রতীক্ষা করে আছে ।

বিশ্বয়ে বিস্ফারিত হয়ে যায় স্বাহার চোখ দুটি । তারপর হঠাৎ পিছন ফিরে সে অশ্রুগোপনের চেষ্টা করে বুঝি । আর কোন সঙ্কোচ বোধ করে না কৃশাঙ্কু । উঠে এসে দাঁড়ায় ওর খাটের পাশে, বলে, ভেঙে পড়লে তো চলবে না স্বাহা দেবী । আমাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করুন । আমি কৃশাঙ্কুকে আসতে লিখে দিই ।

না, না, না—এখন আর কোন উপায় নেই ।

বুকের মধ্যে মুচড়ে ওঠে কৃশাঙ্কুর । মনে মনে তীব্র একটা ঈর্ষা বোধ করে । ঈর্ষা হয় কৃশাঙ্কু রায় নামে একটি ছেলেকে । ও যদি এই মুহূর্তে স্ত্রীত দাশ না হয়ে কৃশাঙ্কু রায় হত, তাহলে ঐ কান্নায় ভেঙে-পড়া মেয়েটিকে বুকে তুলে নিয়ে আশ্রয় দিতে পারত । ওর অশ্রুসজল চোখ দুটির উদ্ভাপ মুছে নিতে পারত অধরোষ্ঠের নিষ্পেষণে ।

আমাকে একটু একা থাকতে দেবেন ?

উপায় নেই । আজ এই মুহূর্তে সে আর কৃশাঙ্কু রায় হতে পারে না । সে যা, তা সে আর নয় । জন্মগত অধিকারকে সে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছে । নিজের দুর্ভাগ্যকে ধিকার দিয়ে নেমে আসা ছাড়া ওর আর পথ কি ?

ঘটনা ঘটল পরের দিন রাত্রে । অপরেরাবার সকালেই চলে গেছেন কলকাতায় । চৌধুরী এসেছেন অনেক দিন পর । কৃশাঙ্কুর সঙ্গে বাক্যালাপ হয়নি । সোজা উপরে উঠে গেছেন । কৃশাঙ্কুর অহুসন্ধিৎসু বষ্ঠ ইঞ্জির বলে দিচ্ছিল নেপথ্যে একটা কিছু ঘনিরে উঠছে । সন্ধ্যা থেকেই কি বেন

একটা বোঝাপড়া হচ্ছে দ্বিতলে ছুটি একান্তবাসী নরনারীর মধ্যে। ওদের স্বামী-স্ত্রীর বোঝাপড়ার ভিতর কুশাহুর কোন স্থান নেই,—কিন্তু উৎকর্ষ না হলেও উদ্গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করে সে এর ফলাফলের। রাত বাড়ল। ওরা ডিনার খেতে নামলেন না কেউ। একাই আহার সমাধা করতে হল কুশাহুকে বাহাহুরের অসুযোগে। আহারান্তে নিজের ঘরে এসে বসে থাকে চুপ করে। ঘুম আসে না। প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে। উপর মহল থেকে ভেসে আসছে একটা চাপা উত্তেজনা। কথা কাটাকাটির একটা আভাস। মাঝে মাঝে উষ্ণ বাক্যবিনিময় যখন উঠছে ক্লাইম্যাক্সের শিখরে তখন এক-আধটা ছুটকো শব্দ ভেসে এসে উতলা করে তুলছে ওকে। আবার নিথর হয়ে যাচ্ছে বিশ্ব-চরাচর পরমুহূর্তেই। রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ নেমে এলেন চৌধুরী। এবার আর পিছনের দরজা দিয়ে নয়—সামনের সিঁড়ি দিয়েই। সদর খুলে বেরিয়ে গেলেন সদর্পে। ঠিক পরমুহূর্তেই ছুটে নেমে এল স্বাহা। দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকল পিছন থেকে, শোন, শুনে যাও একটা কথা।

ফিরলেন না চৌধুরী। টর্চের গোল আলোর রেখাটা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গেল পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে কাট রোডের দিকে। কি করবে বুঝতে পারে না কুশাহু। ঠিক সেই সময়েই সদর দরজার কাছে ভারী কিছু একটা পড়ে যাবার শব্দ হল। নিজের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল কুশাহু। খোলা দরজার উপরেই বসে পড়েছে স্বাহা—শুয়েই পড়েছে ষালা উচিত। স্থলিত আঁচলটা লুটোচ্ছে মেঝেতে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ক্রম্প নেই তার। পড়ে আছে সম্মোহিত স্বাগুর মত। হিষ্টিরিয়া আছে নাকি ওর?

কাছে গিয়ে স্পর্শ করাতেও সন্ধিৎ ফিরে আসে না স্বাহার। দাঁতে দাঁত লেগে আছে। হ্যাঁ, ফিটই হয়েছে তাহলে। আর ইতস্তত করার মানে হয় না। পাঁজা-কোলা করে তুলে এনে ওকে শুইয়ে দেয় একটা সোফায়। চোখ দুটি নিম্নলিত, চোয়াল দৃঢ়নিবদ্ধ, হাত মুষ্টিবদ্ধ। মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া উচিত বোধ হয় এখন। হিষ্টিরিয়ার প্রাথমিক চিকিৎসায় বৃকের ষোতামণ্ডলো খুলে দেওয়ার নির্দেশ আছে না? কিন্তু কিছুই করতে পারে না কুশাহু। দু হাতে তুলে ওকে সোফার উপর শুইয়ে দেওয়াতেই বৃষ্টি সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। কণিকের ভক্ত কুশাহুর জীবনে

কিছু এসেছে মাঝগলার হারিয়ে যাওয়া একটা মুহূর্ত। রোগের আক্রমণের পরিচিত অসুস্থতা নয়, তবু কেমন যেন একটা মিরসিরানি বোধ করে অনুভব। বাহাদুরকে এখন ওর ডাকা উচিত—তার জী এসে আলগা করে দিতে পারে ওর অন্তরবাস, ঢিলে করে দিতে পারে নীবীবদ্ধ। সমস্ত শরীরে রক্ত চলাচল হওয়া দরকার। কিন্তু অবশ্য কুশাহু কিছুই করে উঠতে পারে না।

হঠাৎ নজরে পড়ে, স্বাহার দৃঢ়মুষ্টিতে কি যেন একটা ধরা আছে। জোর করে মুঠি খুলে নিতেই বেরিয়ে পড়ে একটা ছোট হোমিওপ্যাথিক শিশি আর এক টুকরো কাগজ। ভাঁজ খুলে লেখাটা পড়তেই একটা হিমপ্রবাহ খেলে যায় ওর সর্বাঙ্গে। লেখা আছে আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়—স্বাহা।

শিশিতে কি ছিল তাহলে?

পাপপুণ্য ভালোমন্দ বিবেচনা করবার সময় নেই। কাগজটা ছুঁড়ে সে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকে। গালের উপর গাল রেখে অনুভব করতে চায় ওর উত্তাপ। না, শরীর তো এখনও গরম। বুকের উপর কানটা চেপে ধরে অনুভব করতে পারে ক্ষতস্পন্দিত জীবনছন্দের পরিচয়।

ধরধরিয়ে কেঁপে ওঠে স্বাহা।

ঠিক তখনই ঘরের কাছ থেকে অদ্ভুত ব্যঙ্গভরা গলায় চৌধুরী বলে ওঠে, চমৎকার!

কখন ফিরে এসেছে সে? কিন্তু সে কথা ভাববার মত মনের অবস্থা নেই কুশাহুর; বলে, এর মানে কি?

কিন্তু কিসের মানে? না সেই কাগজের টুকরা, না ছোট শিশিটা। সে দুটি আগেই হস্তগত করেছে চৌধুরী। সে হেসে বলে, সেটাই তো আমার প্রথম দাশ সাহেব, এর মানে কি?

স্বাহা উঠে বসেছিল, চৌধুরীকে বলে, চলে যাও তুমি।

আচারালী! হাসে চৌধুরী, কিন্তু তাহলে একমাত্র কুশাহু রাগই নয়, স্তব্ধ দাশও তোমার ফ্রেণ্ড!

নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার। দাঁতে দাঁত চেপে বলে স্বাহা।

কুশাহু স্বাহাকেই প্রশ্ন করে, তুমি ওটা একটুও খাওনি তো?

কোনটা?

যেটা ধাবে বলে স্বীকারোক্তি লিখেছিলে এইমাত্র।



স্বাহা লোভা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। জামাকাপড় সামলে নিয়ে বলে, কী যা-তা বলছেন ?

এবার সামলে নিতে হয় কুশান্নকেই, বলে, মানে ? আপনিও অস্বীকার করতে চান ? আপনার হাতে একটা শিশি ছিল না ? আর চিঠি ?

স্বাহা তখনও তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টে চৌধুরীর দিকে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলে, কেলেকারী অনেক দূর হয়েছে। এবার শুতে যান। আমার হাতে কিছুই ছিল না। যেন সন্মোহিত মানুষ স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে।

চৌধুরী আবার হেসে বলে, কিন্তু আমার হাতে যে একটা টর্চ ছিল স্বাহা দেবী। আমি তো অন্ধ নই।

স্বাহা উপরে যাওয়ার জন্ত পা বাড়িয়ে ছিল। এ কথায় হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়। যেন ছুটে গেছে ওর স্বপ্নের ঘোর। দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠে, যাও। আমার সহেরও একটা সীমা আছে।

এবার স্বাহার দৃষ্টিতে চৌধুরী কি দেখল সেই জানে। লগুড়াহত কুকুরের মতই সসঙ্কোচে সরে পড়ল সে।

যান শুতে যান। কুশান্নকে প্রায় আদেশের ভঙ্গিতে বলে উপরে উঠে গেল স্বাহা।

কিন্তু কুশান্নর রক্তে তখন জেগেছে তুফান। দুঃসাহসী রাঘবন আর ইন্দ্রজিতের সহযাত্রী হিসাবে দুর্ধোগের বাত্রে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষবার স্পর্ধা নিয়ে একদিন রাত্রে যাত্রা করেছিল যে কুশান্নর রায়—সে তাহলে মরে যায়নি দুর্ঘটনায়। কিসের জন্ত এ জীবন, কিসের পরোয়া ? এইভাবে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকতে হবে ? আর তার দুর্বলতার স্বযোগ নিয়ে ঐ নরকের কীটটা তিল তিল করে বিষপ্রয়োগে হত্যা করবে তার জীবনের প্রথম প্রেমকে !

ঘরে এসে স্ট্রটকেশটা খোলে। তুলে নেয় ছোট্ট কালো বস্ত্রটা। দুর্ঘটনার পর আর হাতে তোলেনি এটাকে। প্রয়োজনও হয় নি। এটা ওর ব্যক্তিগত সম্পত্তি—জমা দিতে হয়নি মালখানায়। না, কাঁপলে চলবে না হাত। টর্চটা তুলে নেয়, ওভারকোটটাও। নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে গেট খুলে। যাওয়ার সময় গাড়িটা মেরামত করতে দিবে গিয়েছিলেন ডাঃ মিত্র—কথাটা জানা ছিল। তাই কুশান্ন জানত হেঁটেই ফিরতে হবে আজ চৌধুরীকে, যদি না পথচলতি ট্যাক্সি পেয়ে যায়।

ফলো করার কায়দাটা ভুলে যায়নি তালে। সামনের পঞ্চাশ গজ দূরের আলোকবর্তিকাটার সঙ্গে সমান দূরত্ব বজায় রেখে বিনা আলোয় সেও নেমে এল কাঁট রোডে। বড় রাস্তায় উজ্জ্বল বিজলি বাতি—দূরত্বটা বাড়াতে হল তাই। আচমকা দুই একটা রাত্রিচর গাড়ির গা ঘেঁষে ছোট্টা। নৈশ গ্রহরীর খট খট বুটের শব্দ। স্থির স্তম্ভ মস্তিষ্কে ও অনুসরণ করে চৌধুরীকে। না, ম্যালের দিকে নয়, ক্যালকাটা রোড ধরে চৌধুরী চলল ঘুমের দিকে। কনকনে শীত। কুয়াশায় দেখা যায় না বেশী দূর। প্রায় পঁচিশ মিনিটের পথচলা শেষ হল একটা ছোট বাংলো বাড়ির সামনে। কড়া নাড়বার প্রয়োজন হল না; ভিতরে আলো জলছিলই। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কে যেন খুলে দিল দরজা। একটি মেয়ে। মহিলাই বলা উচিত। যেন প্রতীক্ষাতেই ছিল সে। ঘন কুয়াশা ভেদ করে স্পষ্ট দেখা যায় না মেয়েটিকে এত দূব থেকে। আগন্তুক প্রবেশ করতেই রুদ্ধ হয়ে গেল দরজা। কুশানু ঘড়িতে দেখল রাত তখন বারোটা দশ।

পরের সমস্তটা দিন কাটল নিশ্চিদ্র নিঃসঙ্গতায়। চৌধুরী আসেনি সারাদিন। অপবেশবাবুও কলকাতায়। স্বাহা নীচে নামল না একটি বারের জন্যও। বাহাদুর মারফত খবর পাওয়া গেল মাইজির তবিয়ত নাকি খারাপ। নিজের ঘরে বসে সিগারেটের ধোঁয়ার সাথে পাকিয়ে পাকিয়ে মন্থরগতিতে মিলিয়ে গেল মুহূর্তগুলো। পরিস্থিতিটা মনে মনে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে থাকে কুশানু। অপবেশবাবু কোন্ পক্ষে তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। অত্যন্ত বুদ্ধিমান তিনি। মাইনোমিটারের কাঁটাটা গ্যারেজের ভিতরেই রাতারাতি বেড়ে যেতে দেখেই যে সে ধরে ফেলেছিল তাঁকে, এই সূক্ষ্মসূত্রটা অনুভব করবার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার আছে। অথচ তিনি খবর নিয়ে দেখেননি সত্যিই কোন হোটেলে উঠেছে কি না চৌধুরী? এতটা অনবধানতা তাঁর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায়? তাছাড়া চৌধুরীর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু-ইতিহাস জানতে চাওয়ায় তিনি ওভাবে ক্লেপে গেলেন কেন? সূতরাং ডাক্তার অপবেশ মিত্র এখনও রহস্যের ভিতরেই রয়ে গেছেন। কিন্তু চৌধুরী আজ পড়া শেষ ডিটেকটিভ নাটকের মতই মুক্ত-রহস্য। তার কথা জানতে আর বাকি নেই কিছু। এখন কুশানুর একমাত্র কর্তব্য স্বাহার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ানো। তাকে ভরসা দেওয়া, আশ্বাস দেওয়া, তাকে বুঝতে দেওয়া যে মৃত্যু ছাড়াও

তার উদ্ধারের পথ আছে। কিন্তু সে আশ্বাসবাণী স্ত্রুত দাশ আনতে পারে না। সে আশ্বাসবাণীর একমাত্র বাহক হতে পারে কুশাহু রায় যাকে স্বাহা একদিন ভালবেসেছিল হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই আজও বাসে। তাই আত্মপরিচয় দেবার শুভলগ্ন উপস্থিত বলেই মনে হল তার। অনেক ভেবে সে স্থির করে একখানা চিঠিতে সব কথা লিখে সে পাঠাবে দ্বিতলে বাহাদুরের হাতে। দেখবে কি প্রতিক্রিয়া হয় তাতে। কাগজ কলম নিয়ে বসতে যাবে, হঠাৎ বাহাদুরই ওর হাতে এনে দিল একখানা বন্ধ খাম। স্বাহার চিঠিই। খামটা খুলতে গিয়ে এত দুঃখেও হাসি এল কুশাহুর—এবার খামের উপরে রামনন্দন কাহার নয়, কুশাহু রায়ও নয়—লেখা আছে স্ত্রুত দাশের নাম।

ছোট চিঠি। কোন সম্বোধন নেই তাতে। স্বাহা লিখেছে, ‘তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। তুমি লিখলাম বলে কিছু মনে করলে না তো? আমি জানি তুমি শ্রদ্ধার দূরত্ব রাখতে চাও না, আমিও না। যে কথা তোমাকে বলতে চাই অমন শ্রদ্ধাস্পদ দূরের লোককে তা বলা যায় না। আজ রাতে চৌধুরী আবার আসবে আমি নিশ্চিত জানি, আমার মন বলছে। হয়তো কাল তোমাকে এ কথা বলার সুযোগ পাব না। তাই আজই সব কথা বলে ফেলতে চাই। এ কথা কাউকে কখনও বল না, দাদাকেও নয়। স্বাহা।’

আশ্চর্য মাহুষের মন। চিঠিখানা পেয়ে কোথায় খুলী হয়ে উঠবে, তা নয়, কোথায় যেন খচখচ করে ব্যথা বোধ হতে থাকে। এ পাগলামির কোন মানে হয়? বসে বসে ভাবে কুশাহু।

তুমি একটা মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছ। অবস্থাগতিকে সে কথা তুমি স্বীকার করতে পারছ না। যাকে মিষ্টি নামে কানে কানে ডাকতে চাও তার সঙ্গে দূরে বসে আপনি-আজ্ঞে করতে হচ্ছে। এমন যখন অবস্থা তখন সেই মেয়েটিই তোমাকে লুকিয়ে চিঠি লিখল। জানলাম সেও তোমাকে নাম ধরে ডাকার নৈকট্যে আসতে চায়। তখন তুমি কি করবে? খুলীয়াল আনন্দে অধীর হয়ে আকাশে ডানা মেলবে, না নিঃশেষিতপ্রায় স্টাম্প থেকে জালিয়ে নেবে আবার একটা সিগারেট গুমরে-মরা মনের মত ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাতে?

ও কি সত্যই আজ দুঃখ বোধ করছে কোন এক হারিয়ে যাওয়া কুশাহু রায়ের জন্তে? ও? স্ত্রুত দাশ? কুশাহু রায়ের কাছে ছাড়া অন্য কারও

কাছে স্বাহা মনের বোঝা নামিয়ে ফেলতে উত্তত দেখেই কি ওর এই গুমরানি ?  
কিন্তু এ কি ছেলেমানুষী ! এত রোমান্টিক মধ্যযুগীয় মন কেন ওর ? না হয়  
নেপথ্যেই থাক না কুশান্ন রায়, স্ত্রুত দাশই আজ নতুন করে জয় করুক না  
স্বাহা দেবীকে—তাতে ওর কি ক্ষতি । ছায়া হয়ে মিলিয়ে যাওয়া কুশান্ন রায়কে  
স্বাহা যদি ভুলে গিয়ে নতুন করে বাঁচতে চায় ওর হাত ধরে, স্ত্রুত দাশের হাত  
ধরে—তা হলে তার ক্ষুদ্র হবার কি আছে ?

নিজের মনটাকে গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে শেষে । সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে । ঘর  
খোলাই ছিল । স্বাহা নিশ্চুপ বসে আছে একটা ইজিচেয়ারে । ও গিয়ে  
চুপিসাড়েই বসে পড়ে খাটের এককোণে ।

খুব অবাক হয়ে গিয়েছ নয় ?

মোটাই নয় । আলতো হাসে কুশান্ন ।

তোমার বন্ধুর কথা সেদিন বলতে চেয়েছিলে—কোথায় আছেন তিনি ?

এবার সত্যি কথাটা মুখে এল, কিন্তু সামলে নেয় নিজেকে । হয়তো যে  
কথা বলার জন্য স্বাহা তাকে ডেকেছে তা আজ শুধু স্ত্রুত দাশকেই বলা যায়,  
কে জানে । কথাটা জানার আগে তাই আত্মপরিচয় দেওয়াটা হয়তো সঙ্গত  
হবে না, তাই বলে, তার কথা থাক । তোমার কথা বল । সময় হয়তো  
অল্প ।

স্বাহা একটু চুপ করে থাকে, তারপর বলে, বলব বলেই তো ডেকে  
পাঠিয়েছি । কিন্তু এখানে কেমন যেন নিরাপদ মনে হচ্ছে না । ও এখনই  
এসে পড়তে পারে ।

তাহলে ?

দরজাটা বরং বন্ধ করে দাও ।

কুশান্ন উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসে । খিলটা লাগাতে  
লাগাতে অনেকদিন আগেকার একটা দিনের কথা মনে পড়ে ওর । আইভির  
কথা । রুদ্ধদ্বার কক্ষে একটি নারীর সান্নিধ্য হঠাৎ মনে পড়িয়ে দেয় সেই  
অদ্ভুত মেয়েটির কথা ।

ফিরে এসে বসে আবার নিজের জায়গায় ।

কুশান্ন রায়ের কথাটা তুমি এড়িয়ে গেলে কেন ?

এড়িয়ে বাইনি তো ।

গেলে বইকি । সেদিন আমিই তার কথা আলোচনা করতে চাইনি,



আজ তুমিই প্রসঙ্গটা চাপা দিলে। আমি জানি, কেন আজ আর তার কথা আলোচনা করতে চাও না তুমি।

কেন ?

আজ তুমি কুশানুকে ঈর্ষা কর।

ঈর্ষা ? হঠাৎ ঈর্ষা করতে যাব কেন ?

কারণটা তো তুমিই জান। নাই বা বলালে আমাকে দিয়ে। কিন্তু ধারণাটা তোমার ভুল, একদিন হয়তো তোমার সেই বন্ধুকে ঘিরে আমার মনে নানান স্বপ্ন বাসা বাঁধত। আজ আর বাঁধে না। ভুলেও মনে পড়ে না তার কথা।

চূপ করে থাকে কুশানু। এ কথায় সে খুশী হবে, না দুঃখিত হবে ? মানুষ তার অতীত সত্যকে বেশী ভালবাসে, না বর্তমানের ছদ্মবেশকে ? এই কদিন আগে স্বাহা যখন উদ্গত কান্নাকে রোধ করে চাপা আর্তনাদে বলে উঠেছিল, না না না, এখন আর উপায় নেই। তখন সে সত্যিই ঈর্ষা বোধ করেছিল কুশানু রায়কে—সে স্ত্রত দাশ। মনে হয়েছিল সে যদি জন্মসত্তাকে অস্বীকার না করত তাহলে ওই দুর্লভ মুহূর্তটিকে সার্থকতা দান করতে পারত সে। কিন্তু আজ সে ঈর্ষার বিন্দুমাত্রও নেই। আজ দিনান্তে একবারও কুশানু রায়ের কথা ওর মনে পড়ে না শুনে উল্লসিত হয়ে উঠতে পারা গেল না। প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার কদর্থ হতে পারে জেনেও সে বলে, কি বলবে বলে ডেকেছিলে আমাকে ?

জবাব না দিয়ে স্বাহা ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে দাঁড়ায় জানলার কাছে। পিছন ফিরে। এক মিনিট, দু মিনিট। চূপ করে দাঁড়িয়েই থাকে। যেন সে মনে মনে সাহস সঞ্চয় করছে। অনেক—অনেকদিন পবে এই নীরব মুহূর্তটিতে আবার একটা অতি পরিচিত অমুভূতি কুশানুর স্মৃতিশ্রীগুলিকে অবশ করে তোলে। পায়ের পাতা থেকে একটা সিরসিরানি মেরুদণ্ড বেয়ে দ্রুত উঠে আসছে মস্তিষ্কের দিকে। মুখটা শুকিয়ে আসছে, জিবটা আঠা আঠা। চোখ ফেটে জল আসে কুশানুর। ওই মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে পিছন-ফেরা মেয়েটির অঙ্গাবরণ। কিন্তু না, কিছুতেই এ দুর্ঘটনাকে ঘটতে দেওয়া চলবে না। এর অব্যর্থ ঔষধ জানা আছে। দাঁড়িয়ে ওঠে কুশানু। আর পরমুহূর্তেই সন্ধিৎ ফিরে বসে পড়ে ; পায়ের আহত বুড়ো আঙুলটা চেপে ধরে। স্বাহা জানতেও পারে না। সে কি কাঁদছে ?

অনেক পরে ও পাশ ফিরেই বলে, মাপ কর তুমি। আমি বলতে পারব না।

আহত আঙুলটাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে কুশাল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ওর ঠাণ্ডা রক্তহীন হাতটা ভুলে নেয় আলতোভাবে। বলে, বলতে তোমাকে হবেই স্বাহা। না শুনে তো আমি যাব না। সব কথা বলতে হবে আমাকে।

ধরধর করে কেঁপে ওঠে স্বাহার ঠোঁট দুটো। বলে, আমার মাথাটা ঘুরছে, মনে হচ্ছে ফিট হবে আমার।

মনকে শক্ত কর তুমি।

না, এখানে পারব না। চল, বাইরে যাই। বেড়াতে বেড়াতে নির্জনে কোথাও গিয়ে বসব। সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসবে, অন্ধকারে যখন আর হুজুনকে দেখতে পাওয়া যাবে না, তখন বলতে পারব হয়তো সব কথা। যাবে?

বেশ, চল।

তুমি তাহলে বস, আমি কাপড়টা পালটে আসি।

কাপড়-জামা নিয়ে পাশের বাথরুমে ঢুকে যায় স্বাহা। শুকনু হয়ে বসে থাকে কুশাল। সত্যিই কাপড় বদলাতে গেল তো ও? না কি এই ছুতোয় কেঁদে মনটা হালকা করে নিতে চায়? আজ বাবে বারে ঘুরে ফিরে আইভির কথাটাই মনে পড়ছে। এই শহবেই আর একটি ঘরে একদিন ওকে এমনি ভাবেই অপেক্ষা করতে হয়েছিল—পাশের বাথরুমে স্নান করতে গিয়েছিল আইভি। মনে পড়ে, সে সময়ে ওর মনে হয়েছিল হয়তো মানসিক রোগটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে। তাই মনে মনে পাটিশান দেওয়ালটার উপর ইরেজার ঘষবার দুঃসাহস হয়েছিল সেদিন। সে দুঃসাহসের কণামাত্র আজ আব অবশিষ্ট নেই। সে জানে গোটা মনের কোন গোপন গহ্বরে লুকিয়ে আছে মাত্র, মরেনি।

ডাক্তার মিত্র বলেছিলেন, অবচেতন মনে বাসা-বাঁধা কোন নিরুদ্ধ কামনাই এ রকম রোগের উৎপত্তিস্থল। এমন উৎসুটে ইচ্ছা কেন বাসা বেঁধেছে তার অবচেতন মনে? বেঁধেছে কোন্ সূত্রে? জীবনে অনেক বার এসব কথা ভেবেছে, আজও অপেক্ষা করার অবসরে মনে মনে উজান বেয়ে চলে যায় স্মৃতির প্রান্তরাজ্য পর্যন্ত। শৈশবকাল পর্যন্ত। কই, এমন কোন ঘটনার কথা তো মনে পড়ে না—যার সূত্র ধরে এই মানসিক রোগের বীজাণু এসে আশ্রয়

নিল ওর মনের মাঝখানে। স্বপ্নার বীজাণুও চোখে দেখা যায় না, তবু রক্ত-  
রশ্মিতে তাকে ধরা যায়, কিন্তু ওর অবচেতন মনের এই গোপন রোগকে  
ধরার মত স্বপ্ন আজও আবিষ্কৃত হয়নি। ডাক্তার মিত্রের সেই মনঃসমীক্ষণের  
চিকিৎসা? সেটা নেহাৎ বুজুকি।

হঠাৎ বাধক্ৰমে একটা শব্দ হল। পড়ে গেল নাকি স্বাহা? হিষ্টিরিয়ার  
আক্রমণ নয় তো? বাধক্ৰমের কাছে এসে বার দুই তিন ডাকল নাম ধরে।  
কোন সাড়া নেই। কলটা খোলা আছে, জল পড়ে যাচ্ছে একটানা। বাধ-  
ক্ৰমের দরজায় করাঘাত করতেই খুলে গেল দরজাটা। আর সঙ্গে সঙ্গে  
আপাদমস্তক একটা ইলেকট্রিক স্পার্ক দিল যেন।

স্বাহা মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে বাধক্ৰমের মেঝেতে। চোখ দুটি বন্ধ,  
মুষ্টিবদ্ধ হাত। কিন্তু এ কী! একটু আগে পায়ের বুড়ো আঙুলটা ছমড়ে  
অসহ্য যন্ত্রণা স্বীকার করেও যে কাল্পনিক চিত্রটার উপর যবনিকা টেনে দিয়েছিল  
ওর ভদ্রমন—সেই বাস্তব চিত্রটার সম্মুখে সামান্য আয়াসেও তো সে বন্ধ  
করতে পারল না চোখ দুটো। মাটি নয়, ব্রোঞ্জ নয়, মার্বেলে গড়া নয় এ মূর্তি!  
সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে যেমন বিস্ফারিত বিশ্বল নেত্রে তাকিয়ে দেখেছিল  
আদিমতম মানব বালক সূর্যের প্রথম অরুণোদয়—তেমনি অপার বিশ্বয়ে  
স্বাগুর মত দাঁড়িয়ে রইল কৃশানু,—দেখল অমুদ্যাতিতপূর্ব এক অপূর্ব বিশ্বয়কে।

তারপর হঠাৎ যেন সন্ধিৎ ফিরে পায়। জোর করে শাস্ত করে  
ক্রতস্পন্দিত হৃদপিণ্ডটাকে। এখনই প্রতিকার না করলে ঠাণ্ডার এক্সপোজার  
লাগতে পারে। গতকাল যেমন অনায়াসে দু হাতে তুলে নিয়েছিল ওকে  
আজও তেমনি পাঁজাকোলা করে তুলে নিল স্বাহাকে। আলতো করে  
শুইয়ে দিল খাটে। কিন্তু কী যেন হল কৃশানুর—তখনই ছেড়ে দিতে  
পারল না। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তখন ওর শুরু হয়েছে আগুনের হোরিখেলা।  
একটা বৈদ্যাতিক শিহরণ তখনও বইছে স্নায়ুতন্ত্রের বিজলি তারে।

পৃথিবী যেন নেই—ক্ষয় হয়ে গেছে সূর্য—স্থান-কাল-পাত্রের সব কিছু  
অমুভূতি যেন বাপসা হয়ে, বিন্দু হয়ে, ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেল নিঃশেষে।  
নত হয়ে আসে কৃশানুর মুখ—যুগযুগান্তরের আকর্ষণ তৃষ্ণা নিয়ে।

সময়ের মাপকাঠি কি? মিনিট না মিলেনিয়াম? কতগুলো সময়ের  
সেই মুনিটকাল ধরে একটি নরম বকের ক্রতস্পন্দন তেহাইয়ের বোল তুলেছিল  
কৃশানুর বকের মৃদঙ্গে? সমে ফিরে আসতে কি যুগযুগান্তর পার হয়ে যায়নি?

এক মিনিট ? দু মিনিট ? কিছুক দিয়ে কি সমুদ্র মাথা যায়, না মিনিট দিয়ে কল্যাণ ?

কিন্তু না, মুছাঁহত এই মেয়েটিকে এ ভাবে জড়িয়ে পড়ে থাকা যায় না । বাস্তবে ফিরে আসে কুশান্ন, সন্ধিৎ ফিরে পায় । মুক্ত করে নেয় নিজেকে । কল্যাণটা টেনে দেয় ওর গায়ে । কী করবে এখন ? মুখে চোখে জল দেবে ? ডাকবে বাহাদুরের বউকে ?

হঠাৎ বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে আঁতকণ্ঠে স্বাহা বলে ওঠে, ওগো, এবার রেহাই দাও আমাকে—যাও তুমি ।

প্রচণ্ড বিষ্ময়ে প্রায় লাফিয়ে ওঠে কুশান্ন, বলে, তার মানে ! তুমি...তুমি অজ্ঞান হওনি ?

বালিশটাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে প্রায় আঁতনাদ করে ওঠে স্বাহা, পিঁজ কুশান্ন, নীচে যাও তুমি । একটুও দয়া নেই তোমার ?

প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সশব্দে ভেঙে খান্ খান্ হয়ে পড়ে ওর সংস্মের প্রাসাদ । কুশান্ন রায় ও নয়, স্মৃত দাশও নয়—ও আদিমতম মানুষ । অজ্ঞান স্বাহা হয়নি, একটি খণ্ড অল্পপলের জগৎও চেতনা হারায়নি তাহলে । স্বাহা তাকে চিনতে পেরেছে—কখন, কেমন করে এসব কথা তার মনে এল না । ভালো মন্দ, গায়-অগায়, সব চেতনা মিলিয়ে যায় একটি মুহূর্তের জগৎ । পাহাড়ের উত্তল চূড়ার উপর থেকে উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যেন !

চোখ বুজে আছে স্বাহা—ভয়ে নয়, উত্তেজনায়, উচ্ছ্বাসের উদ্দামতায় । কুশান্ন নিবিড় হয়ে হারিয়ে যেতে চায়, ফুরিয়ে যেতে চায় যেন । ওর ভিত্ত শিক্ত মনের ভিতরে কোথায় ছিল একটা গোপন গহ্বর—সেখান থেকে হঠাৎ বের হয়ে এল আদিম হিংস্র একটা প্রাগৈতিহাসিক জীব । তাকে সে চেনে না । তাব অস্তিত্বটাও জানা ছিল না এতদিন, কিন্তু কই, স্বাহাও তো ভয় পেল না সেই আদিম বর্বরটাকে !

শিথিলপ্রায় স্বাহার গায়ের উপর কল্যাণটা আবার টেনে দিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে নীচে নেমে এল কুশান্ন নিজের ঘরে । ওর মনের মধ্যে ধীরে ধীরে থেমে আসছে ঝড়ের তাণ্ডব । কালবৈশাখী ঝড় থেমে গেছে—প্রবল বর্ষণের পর শুষ্ক গাভীরে থমকে আছে আকাশ । এখানে ওখানে জমে আছে ঝড়ে ঝরে পড়া গাছের পাতা আর বৃষ্টির চিকচিকে জল ; তাতে প্রতিবিম্ব পড়েছে মেঘ সবে-যাওয়া আকাশের দু একটা উঁকিমারা তারার ।



অনেকক্ষণ কেটে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে ক্রমে। আর বেড়াতে বের হয়নি ওরা—এখন সেটা সম্ভবও নয়। কিন্তু কেমন করে ওকে চিনল স্বাহা? কখনই বা চিনল প্রথম? ওকে উপরেই বা ডেকে নিয়ে গিয়েছিল কি উদ্দেশ্যে? যে কুশানুর কথা দিনান্তে একবারও মনে পড়ে না স্বাহার তার এ আচরণের উদ্দেশ্য কি? কখন, কেন, কি জন্তে? প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলো রিবেটের মাথায় ইলেকট্রিক হাতুড়ির মত বারে বারে আঘাত করতে থাকে ওর মস্তিষ্কে। কিন্তু কিছুতেই সাহস সঞ্চয় করে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারে না। মুখচোরা লাজুক যে কুশানুরকে ও হারিয়ে ফেলেছিল বছর কয়েক আগে জীবনের পথের বাঁকে, সেই যেন এসে অধিকার করেছে ওর মনকে। সেযুগে ট্রামের লেডিস সীটের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস ছিল না ওর, আজও সাহস হল না। দ্বিতলে উঠে গিয়ে প্রশ্নবোধক একঝুড়ি চিহ্ন নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে ওর দিকে তাকাতে।

বাহানুর এসে দিয়ে যায় এক কাপ চা আর একখানা চিঠি। এবার খামের উপর কারও নাম লেখা নেই। তাড়াতাড়ি খামটা খুলে পড়তে থাকে কুশানু। ‘আমাকে উদ্ধার করতে তুমি আসনি, আমি জানি। এসেছিলে আমার দাদার কাছে তোমার রোগমুক্তির সন্ধানে। তোমার বিশল্যকরনী দাদার কাছে ছিল না, ছিল আমার কাছে। ওষুধ তো পেলো, এবার বিদায় হও তুমি, ধূপছায়া রঙের শাড়ি-পরা, পায়ের-আলতা, কপালে-টিপ সেই মেয়েটির ধ্যান করগে। মানসী যখন অটুট আছে, তখন মানবীব এ মর্মস্কন্দ মৃত্যুতে কাতর হওয়া তোমার মত আর্টিস্টের তো শোভা পায় না।

অবাক হয়েছ কি? হওয়া উচিত নয় তোমার মতো ইন্টেলিজেন্স ব্রাঙ্কের বিজ্ঞ অফিসারের। অবশ্য বোকামিটা যখন করেছিলো তখনও গোয়েন্দা হওনি তুমি। হারিসন রোডের মেসেই তুমি নিভুল পরিচয় দিয়েছিলে নিজের। নিজে চোখে সমস্ত দেখে, সমস্ত বুঝেও নীরবে ফিরে এসেছিলাম আমি অপমানের পসরা মাথায় নিয়ে। আশা করি তুমিও আজ নিজে চোখে আমার পরিণাম দেখে, সমস্ত বুঝেও অমনি নীরবে নিঃশব্দে ফিরে যাবে।

কি করে চিনেছিলাম? তোমার খালিগায়ে উপবীতটা স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল। সূত্রত দাশের বদলে কোন ব্রাহ্মণের ছদ্মনাম নেওয়া উচিত ছিল তোমার। দ্বিতীয়তঃ তোমার রোগের আক্রমণ দেখলাম। তৃতীয়তঃ তোমাকে শুইয়ে দিয়ে মাথার নীচে বালিশটা ঠিক করতে গিয়ে দেখলাম

আমার খোলা চিঠিটা। সেটা ভূমি খুলে পড়েছিল। পড়েও আমাকে স্বীকার করনি। মনে আছে নিশ্চয়, সে চিঠিতে আমি একটি মাত্র সাক্ষাৎ ভিক্ষা করেছিলাম—প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তারপর তোমার আর আইভি জীবনের মাঝখানে আমি এসে দাঁড়াব না কখনও। সব জেনে শুনেও দ্বার থেকে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে।

‘কেন সব কথা শুনেও চৌধুরীকে বিয়ে কবতে বাজি হয়েছিলাম এ কথা জানতে চেয়েছিলে একদিন। যাওয়াব আগে জবাবটা জেনে যাও। যা চাই, সহজে তা পাব বলে। জানতাম, কষ্ট কবে আমাকে কিছু কবতে হবে না, চৌধুরীই করবে আমার সম্পত্তি লোভে।

‘একটু দুঃখ পেল, নয়? ও কিছু না। সেন্টিমেন্টাল অভিনেতা যখন কোন মেলোড্রামায় বোমান্টিক পার্ট করে তখন দু এক ফোঁটা চোখের জল তাকে ফেলতেই হয়।

‘তুমি একদিন রোমান্টিক ভাষায় লিখেছিলে যদি এই পৃথিবীর কোন প্রান্তে দৈবাৎ দেখা হয় তোমাতে আমাতে, তা হলে যেন তোমাকে আমি ভাবতে পাবি ও একজন মানুষ। মাপ কব কুশান্ত, আমি প্র্যাগম্যাটিক, তোমাব ও অনুবোধটা তাই আমি রাখতে পারব না। শিল্পী ভাবতে পাবি, ভাবুক ভাবতে পাবি, কবি ভাবাও অসম্ভব হবে না, কিন্তু কিছুতেই ভাবতে পারব না ও একজন বক্তে মাংসে গড়া মানুষ।’

‘আমাব শেষ অনুরোধ, সেই দুভাবনার মধ্যে তুমি আমাকে ফেল না। আমার সামনে এসে দাঁড়িও না কখনও।’

চাবুকের পব চাবুকের প্রহারে জর্জবিততনু কুশান্ত তখনই উঠে দাঁড়ায়। ওর শেষ অনুরোধটা প্রথমেই ভাঙতে হবে। দ্বার খুলে উঠে যায় উপরে, কিন্তু নেমে আসতে হয় আবার। চৌধুরী এসেছেন ইতিমধ্যে।

বাহাদুর ডাকতে এল। গেল না। খাবে না। ক্ষুধা নেই। কেমন করে একবার সাক্ষাৎ কবা যায় স্বাহার সঙ্গে জনান্তিকে? সে সন্যোগ পাওয়া গেল না। নেমে এলেন একটু পরে চৌধুরী সাহেব। সিগারেটটা নিপুণভাবে ধরিয়ে বসলেন একখানা চেয়ার টেনে, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।

যুদ্ধেব জন্ত প্রস্তুত হয়েই ছিল কুশান্ত, বললে, বলুন।

আপনি কবে কলকাতা যাচ্ছেন?

কুশানু হেসে বলে, জানি, আপনার অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু উপায় কি বলুন ?  
আমার কলকাতা যাওয়ার দেরী আছে ।

একটু দৃঢ়ভাবে চৌধুরী বলেন, আর তাশ লুকোবার চেষ্টা করে লাভ নেই  
মিস্টার রায় । আপনাকে আমি চিনি । ডিটেকটিভ কুশানু রায়ই একমাত্র  
বুদ্ধিমান লোক নন এই ছুনিয়ায় । স্ক্যাণ্ডাল তো যথেষ্ট হল, এবার আপনার  
নীরব প্রশ্নানটাই সবচেয়ে শোভন নয় কি ?

কুশানু তৈরী হয়েই নেমেছে বাকযুদ্ধে, বলে, পরিচয় যে শুধু আপনি  
পেয়েছেন আমার তাও তো ঠিক নয় । আপনার পরিচয়টাও আমি সংগ্রহ  
করেছি কিছু কিছু । আপনার প্রথম স্ত্রীর আত্মহত্যা করার কথাটা পুলিশে  
ঠিক বিশ্বাস করেনি একথা জানেন নিশ্চয় । দ্বিতীয় স্ত্রীর আত্মহত্যা করার  
সম্ভাবনার কথাও পুলিশে জানে । সে দুর্ঘটনা ঘটলে সহজে পার পাবেন  
না আপনি । স্বাহা দেবীর আত্মহত্যা করার কোন কারণ আপনি দেখাতে  
পারবেন না ।

চৌধুরী হেসে বলে, আপনার মেজাজে আশঙ্কা করার কিছু নেই । প্রমাণ  
সংগ্রহের দায়িত্বটা না হয় আমার উপরেই ছেড়ে দিলেন । কিন্তু আমি  
বলছিলাম কি, আপনি এমনিতেই নিউরটিক রুগী, বেশী উত্তেজনা আপনার  
স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালোও নয় । তাছাড়া একটা স্ক্যাণ্ডালের মধ্যে কেন  
মিছিমিছি নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন । আপনি বরং কাল সকালেই ঘরের  
ছেলে ঘরে ফিরে যান ।

কুশানু গর্জে ওঠে, দেখুন—

বাধা দিয়ে চৌধুরী বলে, আস্তে । আপনি কি বলতে চাইছেন জানি ।  
বেশ, রাজি আছি, চুপচাপ সরে পড়লে আপনাকেও বঞ্চিত করব না একেবারে ।

স্তম্ভিত কুশানুর বাক্য ক্ষুরণের আগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় চৌধুরী ।

ঘুমের কথা চিন্তাও করা যায় না । অশান্তভাবে পায়চারি করতে থাকে  
ঘরময় । চৌধুরীর প্রশ্নানের প্রহর গোনে । আজ রাত্রেই স্বাহার সঙ্গে  
খোলাখুলি সব কথা বলতে হবে ।

বাহাদুর এসে জানতে চায় কাল সকালে সেও যাবে কি না । সেও যাবে  
কি না ! কোথায় ? বাহাদুরের কাছে খবরটা পাওয়া যায় । চৌধুরী আর  
স্বাহা ভোর রাত্রে উঠে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যাবে । সেই  
আয়োজনই হচ্ছে উপরের ঘরে । বাহাদুর ওদের জন্ম সকালের নাস্তা বানাচ্ছে,

তাই সে জানতে চায় কুশান্তর ব্রেকফাস্ট' ও কি টিফিনকে রিয়ারে তুলে দেবে, না বাড়িতেই থাকে সে।

টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যাবে চৌধুরী? স্বাহাকে নিয়ে? এর অর্থ কি? আকস্মিক দুর্ঘটনা? অর্থাৎ আজ রাত্রে এখানেই থাকছে চৌধুরী। বোধ হয় স্বাহাকে একা রেখে যেতে আর সাহস পাচ্ছে না এখন। কিন্তু ওরা যাবে কি করে? গাড়ি তো রিপেয়ারে গেছে। বাহাদুরকে প্রসন্ন করে জানতে পারে—না গাড়ি সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসেছে। ওরা অবশ্য এ গাড়ি নিয়ে যাবে না। টাইগার হিলের খাড়া রাস্তায় ফোর-ভইল গাড়ি ছাড়া যাওয়া যাবে না। একটা জীপ কোথা থেকে এনেছে চৌধুরী। তাতেই ওরা যাবে। তা যাক। অনিমন্ত্রিত সে ওদের সঙ্গে কেমন করে যাবে? তাছাড়া অমন খাড়া রাস্তায় যাবেই বা কি করে?

সারারাত ঘুম হল না বেচারীর। জেগে বসে রইল ঠায়। অসময়ে মেঘ করেছে আজ। অবশ্য দার্জিলিংয়ের মেঘেব চিরকালই সময়জ্ঞান নেই। টিপিটিপি ঝুপু ও শুরু হয়েছে। আকাশে একটিও তারা নেই। ঠাণ্ডাটা যেন আরও বেড়েছে আজ। প্রহরেব পর প্রহর কেটে গেল। কুশান্ত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে বইল শুধু। স্বাহার ব্যবহারে ও প্রচণ্ড একটা আঘাত পেয়েছে। আইভিকেও চিনতে ভুল হয়েছিল প্রথমে তবু পরে তাকে চেনা গিয়েছে। ইভাই চিনিয়ে দিয়েছিল তাকে। আইভি কালাপাহাড়—সে শুধু ভাঙতেই চায়, ভাঙাব আনন্দেই সে বিভোর। সমাজ যে শৃঙ্খলার মূর্তিটা গড়েছে সেটা ওর কাছে মনে হয়েছে শৃঙ্খল। সেই পাষণ্মূর্তির নাক ভেঙে দেওয়াতেই ওর কালাপাহাড়ী উল্লাস। কিন্তু সেখানেই আইভি-কাব্যের শেষ ট্রাজেডি নয়। রাতের অন্ধকারে সেই মেয়েই নাকি আবার কাদতে বসে। সরোজ অফ সেটান বইটার কথা মনে পড়ে কুশান্তব। মনে মনে আইভি যে ঘোর পিউরিটান এটাকে লোকচক্ষুব অন্তরালে রাখবার জন্তেই তার বাহ্য আবরণ ম্যান-ইন-ব্ল্যাকের মত বিপরীতধর্মী। আইভি ওকে দিতে চেয়েছিল রোগমুক্তিব অমোঘ ঔষধ—নিঃস্বার্থ যদিও নয় সে দান। এই সূযোগে উচ্ছ্বলতায় আর এক ধাপ উপরে ওঠার বাসনা ছিল তার। হয়তো দরে বসে ছবি আঁকিয়েই তৃপ্ত থাকত না সে। কোন সূত্রে সংবাদটা প্রকাশ করিয়ে দিত ওর বাপের কাছে। কিম্বা হয়তো তাও ঠিক নয়—কে জানে হয়তো পরিপূর্ণভাবেই সে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল কুশান্তর কাছে। যে



কুশানুকে জামাতা হিসাবে অনুমোদন করবেন না ভবতারণ ঘোষাল, সে কুশানুর হাত ধরে বিদ্রোহীর মত বাপের ঘর ছেড়ে সে নেমে আসত পথের ধূলায়। কুশানু যদি ভবতারণ ঘোষালের ট্রাম্পকার্ডটা সেই মুহূর্তে প্রকাশ না করে দিত—যদি তাকে পূর্বেই সাবধান করে দিত ইভা তাহলে হয়তো আইভির জীবনটা এমন ভাবে ব্যর্থ হয়ে যেত না। হয়তো সেও স্বাভাবিক জীবনেই ফিরে আসতে পারত!

ইভাকেও বোঝা যায়। ইভা যদিও ক্ষণিকবাদিনী নয় তবু কুশানুকে অঞ্জলিভরে দিতে চেয়েছিল আরোগ্য। সলজ্জ সে দান তবু নিঃস্বার্থ! শুধু কুশানুর রোগমুক্তিই ছিল তার লক্ষ্য। কিন্তু ঠিক কি তাই? তামা-তুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে শপথ করতে পারেনি কুশানু! যতই বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখাক ইভা, যতই দাদামশায়ের নজির দেখিয়ে আতুরের প্রতি উদারতা দেখাক—কুশানু জানে ইভার অন্তরে নিশ্চয় জেগেছিল ওদের প্রেমকে স্বীকৃতি দেওয়ার একটা কামনা। নরনারীর প্রেম—নিকষিত হেম হতে পারে না। কুশানু যদি ঐক্ষণকামেচ্ছার একটি ক্রনিক রোগী হয় তবে ইভাও অন্তত হয়েছিল একদিন বিলসনকামেচ্ছার সাময়িক শিকার। শৈশবেই দাদামশাই আর মায়ের প্রভাব পড়েছিল তার উপর। সে রত উপবাস করে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, গঙ্গাবক্ষে নৌকায় ওঠার আগে মাথায় স্পর্শ করায় গঙ্গাজল। সে চিরস্তনী ভারতীয় নারী। সংস্কার তার মজ্জায় মজ্জায় জড়ানো। অথচ লরেটো-লালিত এই মেয়েটি বেড়ে উঠেছে আধুনিক উচ্চকোটি সমাজের বাতাবরণে। সে প্রভাবটাও তাই একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই মাথা পেতে মালাটা গ্রহণ করতে তার ক্ষণিক আগ্রহ। তাই রোগমুক্তির নলচের আড়ালে সে দিতে চায় প্রেমাস্পদকে পরশ-বাঁচানো এমন একটা কিছু যাতে তার আজন্ম-সংস্কারে আঘাত না দিয়েও দেবে পূর্ণতা। যা শুধু নেওয়ার মধ্যেই নয়, দেওয়ার মধ্যেও আছে আনন্দ। দুই ভিন্ন সংস্কৃতি, দুই ভিন্নমুখী চিন্তাধারার মধ্যে এমনভাবেই আপোষ করতে চেয়েছিল ইভা। কিছা কে জানে হয়তো তাও ঠিক নয়। এইমাত্র স্বাহার আর্ত অনুরোধ ‘প্লিজ, নীচে যাও তুমি’ কথা কটার মাধ্যমে কুশানু যেমন বুঝেছিল—ওটা প্রত্যাখ্যানের নয়, আমন্ত্রণেরই আকুল আহ্বান, তেমনি ইভার বারেবারে উল্লেখ করা সাবধানবাণীর মধ্যেও কি ছিল কোন গভীরতার অন্তরলোকের ইঙ্গিত? যা বলতে চেয়েছে তা কি উন্টো করে বলেছিল ইভা? ওর সেই

চিঠি “তুমি মহীয়সী!” পড়ে কি কঁদেছিল ইভা? সে কারার উৎস কোথায়?

সে যাক। কিন্তু স্বাহা? সে কি চায়? সে কি চেয়েছিল? আজ সে ক্রুশানুকে তীব্রভাবে ঘৃণা করে। ক্রুশানুই তার জীবনের কুগ্রহ। ক্রুশানুই অপমান করেছে তার প্রেমকে, তার নারীত্বকে। ভাববিলাসী, আইডিয়ালিস্ট একটা আর্টিস্ট উপেক্ষা করেছে ওর জৈবিক ক্ষমাকে। মানসীকে সে নাকি বড় করেছে মানবীর চেয়ে। প্র্যাগম্যাটিক লেডি ডাক্তার স্বাহা চৌধুরীর বৈজ্ঞানিক মন এ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। তাই সে আজ ক্রুশানুকে মানুষ বলে স্বীকার করে না। কিন্তু কতদিন আগে স্বাহা আবিষ্কার করেছে ওর পরিচয়? কেনই বা সে লুকিয়ে রেখেছিল এ কথা এতদিন? স্বাহা কি মনে মনে চেয়েছিল ক্রুশানু রায় দেখে যাক নিজের চোখে তার উপেক্ষার ফলাফল? প্রতিশোধ নেবার জন্যেই কি এই অদ্ভুত আচরণ? সে কি পীডন করতে চায় ক্রুশানুকে দৈহিক না হলেও মানসিক?

কেনই বা তাহলে ধরা দিল সে? ক্রুশানুব প্রতি যদি শুধু ঘৃণাই পোষণ করে এসে থাকে এতদিন, তাহলে তার বন্ধনে ধরা দিল কেন শেষ পর্যন্ত? হয়তো এ আচরণের যুক্তি অগুরুত্ব। যে অহেতুক সন্দেহে দীর্ঘদিন ধরে চৌধুরী ওকে পীডন করছে, সেই অপরাধটা সত্যি সত্যি অনুষ্ঠান করেই স্বাহা এভাবে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে চৌধুরীর উপর। কে জানে, হয়তো ভালবেসে সে আত্মদান করেনি মোটেই, এ শুধু স্বামীর উপর প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছারই একটা তির্যক প্রকাশ।

রাত ফুরিয়ে আসে। ঘড়িতে আড়াইটা। ওরা উঠেছে। উপরে নড়া-চড়ার শব্দ হচ্ছে। নেমে আসছে ওরা।

দ্বার খুলে বেরিয়ে আসে ক্রুশানু মাঝের হলকামরায়। যেন ওকে ওখানে দেখবে বলে দুজনেই প্রস্তুত ছিল। স্বাহার গা ঘেঁষেই নেমে এসেছে চৌধুরী। স্বাহা চোখ তুলে তাকায় না, বলে, দাদার একটা চিঠি এসেছে সকালের ডাকে, দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

একটা বন্ধ খাম সে বাড়িয়ে দেয় ক্রুশানুর দিকে।

বাজপাখীর মত ছেঁ। মেরে সেটা কেড়ে নেয় চৌধুরী, দেখি দেখি।

একটু আরক্ত হয়ে ওঠে স্বাহার গাল দুটো। নীরব ভৎসনায় সে তাকিয়ে থাকে চৌধুরীর দিকে।

পোস্ট-অফিসের ছাপমারা বন্ধ খামটা টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে ফেরত দেয় চৌধুরী। আধো অন্ধকারে মুখটা ভাল করে দেখা যায় না তবু অদ্ভুত লাগে স্বাহার দৃষ্টি। যেন কি বলতে চাইছে সেই ব্যাকুল চোখের দৃষ্টি।

চৌধুরী বলে চলো।

চলতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে স্বাহা। হঠাৎ ঘুরে বলেই ফেনে, আপনিও গেলে পারতেন। টাইগার হিলে সানরাইজ একটা দুর্লভ দৃশ্য।

কুশানু বলে, তাই তো শুনেছি; কিন্তু যেতে ডাকেননি তো আমায় আপনারা?

যাবেন আপনি? আগ্রহে কঁপতে থাকে স্বাহার কণ্ঠস্বর, হঠাৎ স্টার্ট-নেওয়া গাড়ির গতিবেগের কাঁটাটার মত।

কুশানু জবাব দেওয়ার আগেই তাকে ব্রেক কষে থামিয়ে দেয় চৌধুরী, গুঁকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেবে কে? এই টিলায় উঠতেই গুঁর মাথা ঘোরে, উনি উঠবেন টাইগার হিলে! না না মশাই, রেস্ট নিন আপনি।

স্বাহা হয়তো আরও কিছু বলতে চায়, তাকে সে স্বেচ্ছায় না দিয়েই চৌধুরী গুঁর বাতমূল ধরে আকর্ষণ করে, এস তুমি, দেবী হয়ে গেলে সব মাটি।

ওরা চলে যায়।

কুশানু ঘরে এসে বসে। আলোটা জ্বলে। চিঠিখানা খুলে পড়ে। ডাক্তার মিত্র লিখছেন কলকাতা থেকে। গত পরশুর তারিখ। ইংরাজি চিঠি। তজমা করলে দাঁড়ায়, আপনাকে কথা দিয়েছিলাম আপনার মনের নিজস্ব-লোকের গোপনতম সংবাদটি আমি খুঁজে বার করবই। তা এতদিনে করেছি। খুব ভুগিয়েছেন আপনি। দোষ অবশ্য শুধু আপনারই নয়। যুরোপীয়ান পেটিংসের ইতিহাস সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ছিল অল্প। ছবির আমি ভক্ত নই। তাই ক্লুটা আমার নজর এড়িয়ে গেছে। সেটা ধরা পড়েছে এখানে এসে। গ্রাশনাল লাইব্রেরীতে বসে। আপনার কাছ থেকে গয়া অথবা গোয়া শব্দটা পেয়েছিলাম। সম্মোহিত অবস্থায় যখন মনের অধিশাস্তা ঘুমিয়ে পড়ে তখন অনেক সময় রোগী এমন কয়েকটা শব্দ অসতর্কভাবে উচ্চারণ করে যা তার নিজস্ব মনের নিরুদ্ধ কামনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আপনি সম্মোহিত অবস্থায় ঐ শব্দটা আমাকে ‘ক্লু’ হিসাবে দিয়াছিলেন। গয়া এবং গোয়া দুটি স্থানের নাম। এইমাত্র ধারণা ছিল আমার। এনসাইক্লোপিডিয়াতে দেখলাম গয়া অথবা গইয়া

একজন নাম করা স্প্যানিস আর্টিস্ট। মাদ্রিদের গ্যালারিতে, গীর্জায়, প্রাসাদগাত্রে তাঁর অনেক চিত্র সংরক্ষিত আছে। তাই সেদিন গোয়া বন্দর থেকে পর্তুগাল স্পেন হয়ে মাদ্রিদে চলে গিয়েছিল আপনার চিন্তাধারা।

স্বাহাকে আপনি বহুদিন আগে একটি চিঠিতে আপনার বাল্যজীবনের একটা ঘটনার কথা লিখেছিলেন। আপনাদের স্কুলের একটি ছেলে গোপাল-গোবিন্দ না কি যেন নাম, একদিন একটা ছবির বই এনেছিল ক্লাসে। লুকিয়ে টিফিন পিরিয়ডে ছেলেরা ছবির বই দেখেছিল। একটা কথায় আমার খটকা লাগে। ছেলেরা টিফিন পিরিয়ডেও লুকিয়ে ছবি দেখবে কেন? নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল ছবির বইতে যা ছুটির ঘণ্টাতেও লুকিয়ে দেখতে হয়। শুধু তাই নয়, আপনি যখন ঔৎসুক্য দেখালেন তখন সেই ছেলেটি বলেছিল—ভাল ছেলেদের এসব দেখতে নেই। সুতরাং নিষিদ্ধ কোন ছবি নিশ্চয়ই ছিল বইটাতে।

দুটো রু পেলাম আমি। প্রথমত আপনার অবচেতন মনের প্রহরীর চোথকে ফাঁকি দিয়ে দৈবাৎ বেরিয়ে আসা শব্দটা হচ্ছে গোয়া অথবা গইয়া। অথচ গয়া নয়, গোয়া নয়। গইয়া একজন স্প্যানিশ চিত্রকর। দ্বিতীয়ত আপনি একটি ছবির অ্যালবামে কী একটা ছবি না দেখতে পেয়ে এতদূর মর্মাহত হয়েছিলেন যে আপনার বাল্যবন্ধুর সঙ্গে আর জীবনে কথা বলেননি। ইস্র করালাম গইয়া ছবির সঙ্কলন। পাতা উল্টাতেই রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। ম্যালেরিয়ার কুইনিন, টাইফয়েডে ক্লোরোমাইসিটিনের মতই অব্যর্থ এই ঔষধ। দু'একদিনের মধ্যেই ছবির অ্যালবামটা নিয়ে যাচ্ছি এবং আজীবন রোগমুক্তির গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনাকে।

গইয়ার দুটি ছবি সেযুগে খুব আলোড়ন তুলেছিল। হয়তো মনে পড়েছে আপনার সব কথা এতক্ষণে। একটি ছবির নাম পোর্ট্রেট অফ ডাচেস্ অব আলভা আর একটি ছবির নাম মাজা, দি স্ন্যড। ডিউক অফ আলভার আমন্ত্রণে গইয়া ডাচেসের ছবি আঁকতে যান। অর্ধশায়িতা রাণীর অপূর্ব একটি চিত্র তিনি আঁকেন। ছবিটির খুব সূখ্যাতি হল। এর কিছুদিন পরে গইয়া একটি শ্রমিক রমণীর নগ্ন চিত্র আঁকেন। তার নাম দেন, মাজা, দি স্ন্যড। আশ্চর্য, শ্রমিক রমণীটি ঠিক রাণীর ভঙ্গিতেই অর্ধশায়িতা, তার অঙ্গসৌষ্ঠব এমন কি মুখাকৃতির সঙ্গে রাণীর অদ্বুত সাদৃশ্য। এ ঘটনায় সেযুগে স্পেনের রাজনীতিতেও নাকি অনেক আলোড়ন হয়েছিল। অনেকে সন্দেহ করে—রাণী দুটো করে সিটিং দিতেন। একটা ডিউকের জ্ঞাতসারে, একটা তাঁর



অলক্ষ্যে। দ্বিতীয় ছবিটাও নাকি রাণীর—চিত্রকর একটি কাল্পনিক শ্রমিক রমণীর নামে সেটা প্রকাশ করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাণীর চিত্রটি আপনি বন্ধুর এ্যালবামে দেখেছিলেন, গল্পটিও শুনেছিলেন, কিন্তু মাজা, দি হ্যাড আপনাকে দেখতে দেওয়া হয়নি। তাই বন্ধুবিচ্ছেদ হয়েছিল আপনাদের। আপনি ডাচেস্ অফ আলভার চিত্রটিকে বস্ত্রহীন অবস্থায় বারে বারে কল্পনা করতে চেয়েছেন তখন, কিন্তু সফলকাম হননি। মাজা, দি হ্যাড আপনার কল্পনেত্রে ভেসে ওঠেনি। হয়তো আপনার বন্ধুও ছবিটি পরে আপনাকে দেখাতে চেয়েছিল—কিন্তু আপনি সঙ্কোচে রাজি হননি। তারপর ক্রমশঃ এ চিত্রটিকে অশ্লীল মনে হয়েছে, আপনার চেতন মন সেই অতৃপ্ত বাসনাকে অশোভন, অসামাজিক, অশ্লীল বলে জোর করে ঠেলে দিয়েছিল নিজ্ঞানের অন্ধকূপে। ক্রমে সবকিছুই আপনি ভুলে গেছেন; কিন্তু অবচেতন মনের নিরুদ্ধ কামনা কখনও কখনও মনের প্রহরীর চোখ এড়িয়ে আপনার চোখে আজও মোহাঞ্জন এঁকে দেয়। চোখের সামনে বাস্তব ডাচেসদের আপনি মাজা হয়ে যেতে দেখেন। খেয়াল করলে আপনার মনে পড়বে অর্ধনগ্ন অতি আধুনিক পোশাকে যেসব মেয়ে গা দেখিয়ে চটুলভাবে ঘুরে বেড়ায় তারা আপনার চিত্তবিকার ঘটাত না। আপনার বিকৃতি ঘটত তখনই যখন সারা দেহ আবৃত করে কেউ স্থির হয়ে কয়েকটা মুহূর্ত ছবির মত দাঁডাত আপনার সামনে।

আপনার বিশল্যকরণী যে বিরাট গন্ধমাদনে আছে সেই ভলুমটা ইস্কু করিয়েছি। জয়রাম বলে এবার দমদম থেকে এক লাফ মারলেই আপনার শক্তিশেল সমূলে উৎপাটিত করব।

বাস্ আর কিছু নয়। স্বাহার সম্বন্ধে একটি কথা নয়, চৌধুরীর প্রসঙ্গে একটি বাক্যও নয়। চিঠিখানা খামে ভরে রাখতে গিয়ে হাতে ঠেকল এক টুকরা কাগজ। বার করে অবাক হতে হয় কুশানুকে। লিখছে স্বাহা—দাদার খাম খুলে এই কাগজটা ভরে দিলাম। দাদার চিঠি পড়েছি। বোধ হয় ঠিকই ওষুধ খুঁজে পেয়েছেন তিনি। অবশ্য এখন আর বোধ হয় তার প্রয়োজন ছিল না।

তোমাকে একটা কথা না বলে যেতে পারছি না। টাইগার হিলে জীবনের শেষ সূর্যোদয় দেখতে যাচ্ছি।

ভয়ানক বাঁচতে ইচ্ছে করছে কুশানু! অথচ মরতে আমি রাজি

হয়েছিলাম। কাল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম চৌধুরীকে। কিন্তু আজকের সারা দিনটায় এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটল যাতে মরতে এখন আর ইচ্ছা করছে না। চৌধুরীকে অনুন্নয়-বিনয় করা বৃথা। মরতে এখন আমাকে হবেই। কেন কথা দিয়েছিলাম ওকে ?

কাল পর্যন্ত ধারণা ছিল বার্থ আমার এ নারী জীবন ; কিন্তু আজ তো সে ধারণাটা নেই—আজ মনে হচ্ছে হয়তো তুমি আমাকে বাঁচাতে পারতে। চৌধুরী যে আমাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করছে এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে আমার হাতে। সেটা প্রকাশের ভয় দেখিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ করা চলত। আবার মানুষ হয়ে উঠতে পারতাম তাহলে। যে অদ্ভুত একটা জীবনের স্বপ্ন দেখতাম একদিন ফুলেশ্বরীর বকলমে চিঠি লিখতে লিখতে, সে স্বপ্নটা বাস্তবরূপ নিত হয়তো। কিন্তু তা হবার নয়। তুমি দুর্বল। চৌধুরীর সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা নেই তোমার। ট্রিগার টানার পরে হাহতাস করার আর কোন অর্থ হয় না। অব্যর্থ লক্ষ্যে গিয়ে লাগবে সেই বুলেট।

জানি, দুর্ঘটনা একটা ঘটবেই আজ। আর সেই দুর্ঘটনায় আমিই মারা যাব, অদ্ভুতভাবে বেঁচে যাবেন আমার স্বামী, আমার সম্পত্তির ওয়ারিশান হয়ে। ধৃত সন্ধানী জাত-ক্রিমিনাল সে। দুর্ঘটনাটা নিশ্চয়ই এমনভাবে সাজাবে যাতে কোন সন্দেহ উদ্বেক না করে। কিন্তু আমাকে সে চেনে না। তার উপর চরম প্রতিশোধ নিতেই এ চিঠি লিখে গেলাম। তুমি দুর্বল নিউরটিক রোগী—পাহাড়ে উঠতে পারবে না। পারবে না আমাকে খাদের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু আমার মৃত্যুর পরে এ চিঠি পুলিশের হাতে পৌঁছে দেবার মত সাহস নিশ্চয়ই হবে তোমার।

কিন্তু সত্যিই এমন শোচনীয় মৃত্যু ছাড়া আমার কি আর কোন মুক্তির পথ নেই কুশান্ত ?

চিঠির শেষে বাংলায় আর ইংরাজিতে দুটো সই করেছে স্বাহা !

চিঠিখানা পকেটে ফেলে উঠে পড়ে কুশান্ত। রিভলভারটা ভরে নিল পকেটে। সমস্ত রক্ত উঠেছে মাথায়। এ রকম উত্তেজনা জীবনে বোধ করেনি। না, সে দুর্বল নয়, নয় সে নিউরোটিক রোগী। খাদের মুখ থেকে সে ছিনিয়ে আনবে স্বাহাকে। সমস্ত মাংসপেশী কঠিন হয়ে ওঠে ওর, স্নায়ুতন্ত্রে বৈদ্যুতিক শিহরণ !

না, এত উত্তেজিত হয়ে ওঠা ঠিক নয়। মনে পড়ল ভবতারণ ঘোষালের উপদেশ। ‘এ পথের প্রত্যেকটি যাত্রীকে হতে হবে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের মত—দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখে বিগতম্পৃহ!’ ধীর স্থির মস্তিষ্কে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে তাকে। উত্তেজিত হয়ে একটি মাত্র ভ্রান্ত পদক্ষেপের অর্থ শুধু তার মৃত্যু নয়, তার প্রিয়তমারও।

বাহাদুরকে ডাকে। গ্যারেজের তালটা ভাঙতে হবে। তার প্রয়োজন হল না। বাহাদুরের কাছে চাবি পাওয়া গেল। গ্যারেজের এবং গাড়িরও। স্বাহা রেখে গেছে নাকি! স্বাহা? সে কি ক্ষীণতম একটি আশা নিয়ে গেছে তাহলে? তাই কি সে চাবিটা রেখে গেছে? তাই কি পত্রশেষে মৃত্যু ছাড়াও মুক্তিপথের ইঙ্গিত দিয়েছে! নিঃশ্বাস ঘন হয় কুশানুর।

বৃষ্টি হয়েছে সারারাত। এখনও হচ্ছে। সূর্যোদয় দেখা যাবে না আজ। তা জেনেই সঙ্গীক রওনা হয়েছে চৌধুরী। এটাও একটা প্রমাণ। সম্ভবত এই দুঃসাহসী দম্পত্তি ছাড়া আর কেউ এই মেঘে ঢাকা দুর্ধোগরাতে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যাবে না। চৌধুরী এই নির্জনতার সুষোগ নিতে চায়। লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। একচক্ষু হরিণের মতই খেয়াল করেনি সে, যে তাকে একদিন জবাব দিতে হবে পাবলিক প্রসিকিউটরের সেই সঙ্গত প্রশ্নটির, মেঘে ঢাকা অমন দুর্ধোগ রাত্রিকেই কেন বেছে নিলেন আপনি, টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যাবার জন্তে?

ঘড়িতে দেখে তিনটে পাঁচ। থানায় যাবে নাকি একবার? জগদীশকে ডেকে নেবে? তাতে কেসটা আরও জোরালো হয় বটে, কিন্তু দুর্ঘটনা যদি তার আগেই ঘটে যায়? একটি মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না। এ গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে তো? নিশ্চয় যাবে। সখের প্রমোদভ্রমণের পক্ষে হয়তো এ গাড়ি নিয়ে টাইগার হিলে ওঠা চলে না, কিন্তু মৃত্যুর মুখ থেকে স্বাহাকে ছিনিয়ে আনবার শেষ অস্ত্র হিসাবে নিশ্চয় হাতিয়ারটা যথেষ্ট।

প্রায় দু ঘণ্টা পরে গাড়িখানা এসে পৌঁছাল টাইগার হিলের উপরে ডাকবাংলোর গায়ে। সানরাইজ-পয়েন্ট থেকে শ’ দুয়েক ফুট নীচুতে। সমুদ্রতল থেকে প্রায় দশ হাজার ফুট উপরে উঠে এসেছে কুশানুর। মাটিতে নেমে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস পড়ে এতক্ষণে। এই কর্দম-পিচ্ছিল পাহাড়ি রাস্তা পাড়ি দিয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাল তাহলে! কিন্তু কেমন করে এটা সম্ভব

‘ইল ? দাঁতে দাঁত চেপে ড্রাইভ করতে করতে এতক্ষণ ওর মনে পড়ছিল সেই অদ্ভুত রোগিনীটির কথা। আড়ামোড়া ভাঙতে গিয়ে যার হাত আটকে যায়। টানাটানি করে কেউ নাকি তার হাত নামাতে পারেনি। তারপর এক বিচক্ষণ প্রবীণ ডাক্তার এসে অদ্ভুত উপায়ে সারিয়ে দিলেন তার অস্থখ। একঘর লোকের সামনে আচমকা টেনে খুলে ফেলতে চাইলেন তার লজ্জাবরণ। মর্মান্তিক প্রয়োজনে নেমে এসেছিল মেয়েটির হাত লজ্জানিবারণের ঐকান্তিক আকুলতায়। ক্রশান্তুর অবস্থাও আজ ওই রকম। বরফ-জমা শীতের মধ্যেও গাড়ি থেকে নেমে মুছতে হল কপালের ঘাম। উত্তেজনার শ্রম-জল।

ডাকবাংলোব পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একটা জীপ। ওরা পৌঁছেছে তাহলে। ত্রিসূমানায় আর কোন গাড়ি নেই, লোকজনের চিহ্নও নেই। ঘড়ির দিকে আর একবার তাকায়, পাঁচটা বারো। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ডাকবাংলোর দিকে। বৃষ্টিটা থেমেছে অনেকক্ষণ। পূর্ব আকাশটা একটু একটু করে ফর্সা হয়ে আসছে। ডাকবাংলোব ভিতরে আলো জ্বলছে একটা। মোমবাতির আলো। নিঃশব্দে ও এসে দাঁড়ায় দরজার সামনে। অর্ধেক কাঁচ, অর্ধেক কাঠের পাল্লা। ভিতর থেকে বন্ধ। ঘরে একটা নেয়ারের খাটে অধশায়িত চৌধুরী একটা সিগার টানছে কন্ঠে আকণ্ঠ ঢেকে। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে স্বাহা। তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এ কী, এ তো স্বাহা নয়! স্বাহা এর তুলনায় দীর্ঘাঙ্গী। এ কি তবে সেই মেয়েটি? দরজায় টোকা মারে ক্রশান্তুর।

ফুৎকারে নিভিয়ে দেয় চৌধুরী মোমবাতিটা। বলে, কে?

দরজা খুলুন, দৃঢ়স্বরে বলে ক্রশান্তুর।

মেয়েটি এসে খুলে দেয় দরজা। পূর্ব আকাশটার ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠছে। আবছা আলোয় গাছপালা জেগে উঠছে একে একে। চৌধুরী সেই আধো অন্ধকাবের মধ্যেই বলে, কে আপনি?

ক্রশান্তুর প্রতিপ্রশ্ন করে, স্বাহা কোথায়?

চৌধুরী জবাব দেয় না। মোমবাতিটা জ্বলে দেয় শুধু। আলো ফুটতে দেখে মেয়েটি প্রণাম করছে তাকে। বিষয়ের তখনও কিছুটা বাকী ছিল। সেটুকু শেষ হল সে মুখ তুলে তাকানোতে।

স্বাগুর মত দাঁড়িয়ে রইল ক্রশান্তুর।

ইভা!



ওর হাত ধরে আকর্ষণ করে ইভা, বলে, আস্থন, ভিতরে এসে বসুন।  
বড্ড ঠাণ্ডা বাইরে।

দবজাটা বন্ধ করে দেয় আবার।

রুশান্ন বসে পড়ে একটা চেযাবে।

আমাব স্বামী—যাঁব পুডিং-এ ভাগ বসিয়েছিলেন একদিন। আব ইনি  
হচ্ছেন সেই ভদ্রলোক যিনি আমাকে এই দাজ্জিলিঙ পাথরের মালাটা উপহার  
দিয়েছিলেন।—বুকেব মালাছড়া মোমবাতির আলোষ তুলে দেখায় ইভা।

স্বকান্ত চৌধুরী যুক্তকব কপালে ঠেকিয়ে বলেন, আপনিই রুশান্নবাবু ?  
কী সৌভাগ্য। আপনার সম্বন্ধে অনেকদিন অনেক কথা শুনেছি আমাব স্ত্রীব  
মুখে।

দাঁতে দাঁত চেপে রুশান্ন বলে, কোন স্ত্রী ?

নিখুঁত বিস্ময়ের অভিনয় কবে চৌধুরী বলেন, মানে ? স্ত্রী আমাব একটাই,  
আপনার সামনে বসে আছেন।

আব স্বাহা দেবী ? হিংস্র লাগছে রুশান্নকে।

চোখ দুটি বন্ধ কবে চৌধুরী বলে, চিনতে পাবলাম না তো। স্বাহা দেবী ?  
কে তিনি ?

দবস্ত একটা ক্রোধে দাঁউ দাঁউ কবে জলতে থাকে রুশান্নব অন্তঃকবণ।  
এই লম্পট বদমায়েশটার স্বরূপ এখনই সে প্রকাশ কবে দেবে। তাতে যতই  
বাথা পাক না কেন ইভা। উদ্বেজনাগ উঠে দাঁডায়। বাধা দেয় ইভা। ওব  
হাত দুটি ধরে বসিয়ে দেয়, বলে, স্থিব হোন আপনি।

স্বকান্ত শুয়ে শুয়েই বলে, না না, বাধা দিও না। বলতে দাও ভদ্রলোককে।  
স্বাহা দেবীটি কে ?

ইভা ধমক দেয় চৌধুরীকে, এনাক অব দান। উনি আমাব বন্ধু। বিপদে  
বন্ধু বন্ধা না কবলে কে বন্ধা কববে গুঁকে ?

ব্লাউজেব ভিতর থেকে একখানা বন্ধ-খাম বার কবে সে রুশান্নর হাতে দিয়ে  
বলে, ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়, আপনি ততক্ষণ চিঠিখানা পড়তে থাকুন, আমি  
খাবাবটা বার কবি। আব আধ ঘণ্টাব মধ্যেই সানবাইজ হবে।

ইভা টিফিনক্যাবিয়াব খুলতে উঠে যায়। অলসভাবে সিগাব টানতে  
থাকেন চৌধুরী। রুশান্ন খামটা খুলে পড়তে থাকে চিঠিটা। স্বাহারই  
চিঠি।

‘সবার আগে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। সত্যগোপনের অপরাধে অপরাধী আমি। কথাটা অনেক বার বলতে চেয়েছি, বলতে পারিনি। দাদা বলতে দেয়নি। নতুন জামাইকে ঠকানোর একটা চিরাচরিত প্রথা আছে, সেটা এমন কিছু নতুন নয়। সে ক্ষেত্রে নববধূর পক্ষে কোন তরফে যোগ দেওয়া উচিত বলা শক্ত। কিন্তু এটা তো সেই জামাই ঠকানোর মজার খেলা নয়, এ ছিল জীবনমরণের প্রশ্ন; তোমার আমারও।

খুলেই বলি। তোমার বিশ্বাস তোমার কোন খবর আমি রাখতাম না। সেটা তোমার ভুল ধারণা। তোমার লেখা চিঠি ফেরত গেছে বটে কিন্তু তোমাব সব খবরই আমি রাখতাম। তুমি জান, মৃত্যুপণ করেছিলাম একদিন তোমাকে জয় করার জন্য। খবরের কাগজে তোমার এ্যাক্সিডেন্টের সংবাদ পড়ে দাদা কলকাতা যান তোমার অফিসে খোঁজ নিতে। আমিই পাঠিয়ে ছিলাম। তোমার অসুখ এবং চিকিৎসাপদ্ধতির কথা শুনে তিনি বলেছিলেন, ও ভাবে হবে না। ইভার সঙ্গে আমার পত্রালাপ ছিলই। ওরা পূজার ছুটিতে দার্জিলিঙে বেড়াতে এল। আমরাও এখানে বেড়াতে এলাম। ইভার সঙ্গে মণিমালাদির আলাপ ছিলই। ওঁরাও তোমাকে চেনেন। একদিন আমাদের আসরে তোমার কথা উঠল। দাদা হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন। প্রথমটা সকলে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলে তাঁর থিয়োরিটা মন দিয়ে শুনল। বিশ্বাস না হলেও তাঁর প্রস্তাবে সবাই একটা ট্রায়েল দিতে রাজি হল।

নাটকের নায়িকা যদিও আমি, কিন্তু অভিনয় আমরা কেউই মন্দ করিনি, কি বল? নেভের ভূমিকায় মিস্টার সুকান্ত চৌধুরীর অভিনয় তো অনবদ্য। সহনায়কের মিষ্টিক চরিত্রে ডাক্তার অপারেশ মিত্রও কি কম যান? রঙ্গমঞ্চে না এসেও নেপথ্য থেকে অপূর্ব অভিনয় করেছে ইভা। আর সবচেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন বোধ হয় এক সোনের এ্যাপিয়ারেন্সে দার্জিলিঙ থানার দারোগা জগদীশবাবু। নিজের টাইপরাইটারে নিজেই টাইপ করে পাটনা অফিসের চিঠিখানা দাখিল করে রহস্যকে আরও গাঢ় করে তুললেন তিনি। না হলে তুমি হয়তো ধরে ফেলতে আমাদের চালাকি। তবু আমি বলব সবার চেয়ে ভালো অভিনয় করেছে হিরোর রোলে তুমি। তবে দুঃখের বিষয়, তোমার ধারণা ছিল একটা ক্রাইমড্রামার গোয়েন্দার চরিত্র তোমার, আসলে বুঝতে পারনি নাটকটা একটা প্রহসনমাত্র!

কী যা তা বকছি! আবার মাপ চাইছি। ঠাট্টা নয় কুশানু, প্রহসন এটা নয়। আবার বলছি, এ ছিল আমাদের জীবনমরণের প্রশ্ন। দেখলাম দাদার ভবিষ্যদ্বাণী কেমন তিল তিল করে ফলল। ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলো তুমি। পাহাড়ে উঠতে শিখলে, নামতে শিখলে—প্রথমে হাত ধরে, পরে হাত ছেড়ে। মিথ্যা রহস্যের এ কুহক না থাকলে স্বেচ্ছায় তুমি কখনও এ সব করতে না। পারতে না। আজ পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে তুমি একেবারে রোগমুক্তির পরিচয় দিয়েছ। নার্সাস নিউরটিক রুগী তো দূরের কথা, সুস্থ সবল একজন সাধারণ ড্রাইভার এ ভাবে আজ টাইগার হিল জয় করতে পারত না!

আজ বুঝেছি কত বড় দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক আমার দাদা। তাঁর সামনে আমরা টুপি খুলতে বাধ্য।

একটি মাত্র দৃশ্যে অবশ্য নাট্যকারের অজান্তে মৌলিক অভিনয় কবেছিলাম আমি। না, ভুল বললাম। বিশ্বাস কর কুশানু সেটুকু আমার অভিনয় নয়।

তোমার জন্তে পাহাড়ের মাথায় অপেক্ষা করছি। আর প্রতীক্ষা তো করছি সারাজীবনই। উঠে এস আমার সমতলে। দুজনে এক সঙ্গে প্রণাম করব প্রভাতসূর্যকে।

নিন, খাবারটা খেয়ে নিন।

এক প্লেট সন্দেশ আর একগ্লাস জল। হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে ইভা, যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকত সে এককালে জোড়া হাতি আঁকা শান্তি-নিকেতনী পদাট্টা সরিয়ে। এতক্ষণে লক্ষ্য হল কুশানুর, ইভাব পরিধানে একটি চাঁপা রঙের শাড়ি, গায়ে ডিপকাট লাল ব্লাউজ।

হেসে ফেললে কুশানু। না কি কেঁদেই ফেললে সে? বোকার মত বলে, এখন নয়। ওপর থেকে ঘুরে আসি একবার।

ড্রাম ইট। লাফিয়ে ওঠে সুকান্ত। আমার দ্বিতীয় পক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎটা আগে সেরে আসুন। আয়াম সরি। তৃতীয় পক্ষ! মাঝের একপক্ষ তো আবার আত্মহত্যা করে বসে আছেন। মনেও থাকে না সব সময়। কী নাটকই লিখেছিলেন ডক্টর মিত্র!

ইভা ধমক দেয়, কেন আর অপ্রস্তুত করছ ভদ্রলোককে। না মাস্টারমশাই, আমারই ভুল হয়েছে। সন্দেশের চেয়েও যা মিষ্টি লাগবে তেমন কিছু বরং

থেয়ে আস্থন উপরে গিয়ে। তবে বেসামাল হয়ে পড়বেন না যেন। আমরাও এখনি উপরে উঠব। সূর্যোদয় হবে এইবার।

কুশানু পা বাড়ায়। লাফ দিয়ে উঠে আসেন স্কাস্তবানু, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমার কথাটা শুনে নিই। বলি ইঁা মশাই, আমাকে ক্ষমা করে গেলেন তো ?

কুশানু কথা খুঁজে পায় না। দু হাতে চেপে ধবে স্পোর্টসম্যান স্কাস্ত চৌধুরীর সবল বলিষ্ঠ হাত। একটু চাপ দিয়ে ছেড়ে দেয়। তার মধ্যেই বোঝা যায় ওর অন্তরের কথা।

ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

ডাকবাংলো থেকে আরও শ দুয়েক ফুট উঁচুতে সানরাইজ পয়েন্ট। যেখান থেকে সূর্যোদয় দেখবার জন্য ছুটে আসে সারা বিশ্বের লোক। ছোট একটা ঘর আছে উপরে, আর থানকয় কাঠের বেঞ্চি। আজ এই বৃষ্টির সন্ধ্যা সকালে স্থানটা নির্জন। শুধু ফর্সা হয়ে আসা পূর্ব আকাশের পশ্চাৎপটে দেখা যায় কুয়াশায় ঢাকা কালো ফাব-কোটে ঢাকা একটি মেয়ের শিল্পে।

পাহাড়ী ছাগলের মত লাফ দিতে দিতে উঠতে থাকে কুশানু। আজ যেন নবজন্ম হল তার। ঐ মেয়েটির সঙ্গে আজ সে যুগলে প্রণাম করবে এই নবজীবনের প্রথম উদয়ভাস্ককে।

সমাপ্ত







সুন্দরী

নারায়ণ সান্যাল

